সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা.] ২০০৯ হিজরী ১৪৩০

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৯

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪২৯ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.bjilibrary.com

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৯

প্র কা শ কা ল
জমাদিউস সানী ১৪৩০
আষাঢ় ১৪১৬
জুন ২০০৯

প্র চ্ছ দ
মুবাশ্বির মজুমদার

মু দ্র ণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

প্র কা শ না য়
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪২৯ বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : ৮৩৩৩৩২০

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

www.bjilibrary.com

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

মজিবুর রহমান মন্‌জু

আসাদ বিন হাফিজ

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

সদস্য

হাসান আলীম

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

নাসির হেলাল

শরীফ আবদুল গোফরান

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

হারুন ইবনে শাহাদাত

আলতাফ হোসাইন রানা

www.bjilibrary.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
পরিচালনা পরিষদ-২০০৯

সভাপতি	:	অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর
সহ-সভাপতি	:	মজিবুর রহমান মনজু
সেক্রেটারী	:	আসাদ বিন হাফিজ
সহকারী সেক্রেটারী	:	মোঃ আবেদুর রহমান
মিডিয়া সম্পাদক	:	মাহবুবুল হক
গবেষণা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	:	সৈয়দ রফিক
অর্থ সম্পাদক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সাহিত্য সম্পাদক	:	হাসান আলীম
নাট্য সম্পাদক	:	শাহ আলম নূর
বার্ষিকী ও স্মারক সম্পাদক	:	মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশনা সম্পাদক	:	নাসির হেলাল
তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক	:	অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক	:	হারুন ইবনে শাহাদাত
দাওয়াতী সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুর রহীম খান
সঙ্গীত সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
শিল্পকলা সম্পাদক	:	ইব্রাহীম মণ্ডল
অফিস ও পাঠাগার সম্পাদক	:	মোঃ বিল্লাল হোসেন

www.bjilibrary.com

নির্বাহী পরিষদ [টীম]-২০০৯

১. অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর
২. মজিবুর রহমান মন্‌জু
৩. আসাদ বিন হাফিজ
৪. মোঃ আবেদুর রহমান
৫. শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
৬. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
৭. হাসান আলীম
৮. অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী
৯. শরীফ আবদুল গোফরান
১০. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
১১. হারুন ইবনে শাহাদাত

জোন ও জোনাল দায়িত্বশীল-২০০৯

জোন-এক

তত্ত্বাবধায়ক	:	মাহবুবুল হক
সভাপতি	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সেক্রেটারী	:	মোঃ আবদুর রহীম খান
সদস্য	:	মোশাররফ হোসেন খান

জোন-দুই

তত্ত্বাবধায়ক	:	আসাদ বিন হাফিজ
সভাপতি	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সেক্রেটারী	:	মোঃ আমিনুল ইসলাম
সদস্য	:	নাসির হেলাল

জোন-তিন

তত্ত্বাবধায়ক	:	আসাদ বিন হাফিজ
সভাপতি	:	হাসান আলীম
সেক্রেটারী	:	ইব্রাহীম মণ্ডল

www.bjilibrary.com

জোন-চার

তত্ত্বাবধায়ক	:	সৈয়দ রফিক
সভাপতি	:	অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী
সেক্রেটারী	:	নূরুজ্জামান ফিরোজ
সদস্য	:	আবু তাহের বেলাল

জোন-পাঁচ

তত্ত্বাবধায়ক	:	মোঃ আবেদুর রহমান
সভাপতি	:	শরীফ আবদুল গোফরান
সেক্রেটারী	:	আবদুল্লাহ আল মামুন

জোন-ছয়

তত্ত্বাবধায়ক	:	শাহ আলম নূর
সভাপতি	:	মোঃ আমিনুল ইসলাম
সেক্রেটারী	:	তৌহিদুর রহমান

জোন-সাত

তত্ত্বাবধায়ক	:	মোঃ আবেদুর রহমান
সভাপতি	:	হারুন ইবনে শাহাদাত
সেক্রেটারী	:	ইবরাহীম বাহারী

www.bjilibrary.com

সূ চি ক্র ম

স ম্পা দ কীয়

মুক্তির একমাত্র পথ ॥ ১১

চ য় ন ক বি তা

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ১৪ ॥ ফররুখ আহমদ অনূদিত অগ্রন্থিত কবিতা ১৫ ॥ বে-নজীর আহমদ-এর না'ত ১৬ ॥ আফজাল চৌধুরীর কবিতা ১৭

চ য় ন প্র ব ন্ধ

মহাপুরুষের মানবতা ॥ এয়াকুব আলী চৌধুরী ২০

প্র ব ন্ধ

বিশ্বমানব প্রগতি ও মহানবী [সা] ॥ ড. কাজী দীন মুহম্মদ ২৭
মানবাধিকার ঘোষণা ও মদিনা সনদের শ্রেষ্ঠত্ব ॥ প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ ৩৭

অ নূ দি ত প্র ব ন্ধ

মানব জাতির জন্য একটি পথ ॥ মূল : সাইয়েদ কুতুব
তরজমা : এ.কে.এম. নাজির আহমদ ৪১

ক বি তা গু চ্ছ

জাহানারা আরজু ৪৭ ॥ আবদুল মুকীত চৌধুরী ৪৭
সাজ্জাদ হোসাইন খান ৪৯ ॥ মতিউর রহমান মল্লিক ৫০
আহমদ আখতার ৫০

প্র ব ন্ধ

রাসূল [সা]-এর জীবন ও সহিষ্ণুতা ॥ অধ্যাপক আবু জাফর ৫১
রাহমাতুল্লিল আলামীন ॥ ড. আসকার ইবনে শাইখ ৫৯
রাসূলুল্লাহর [সা] আনুগত্য ও অনুসরণ ॥ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ৬৫
মহানবীর [সা] মহান শিক্ষা ॥ হাফেজা আসমা খাতুন ৮৪

প ত্র সা হি ত্য

রোম সম্রাটকে লিখিত হযরত নবী করীম [সা]-এর পত্র
মাওলানা মহিউদ্দীন খান ৭৭

www.bjilibrary.com

ক বি তা গু চ্ছ
জয়নুল আবেদীন আজাদ ৮৯ ॥ আশরাফ আল দীন ৯০ ॥ মাহফুজ পারভেজ ৯১ ॥ এনায়েত রসূল ৯২ ॥ মহিউদ্দন আকবর ৯২ আবদুল হালীম খাঁ ৯৩ ॥ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী ৯৪ ॥ আমিন আল আসাদ ৯৫ ॥ রেজা রহমান ৯৫ ॥ তমসুর হোসেন ৯৬ ॥ মাসুদা সুলতানা রুমী ৯৭
ছো ট গ ল্প
সুমাইয়া ॥ মাহবুবুল হক ৯৯
প্র ব ন্ধ
মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ও বর্তমান সময়ের প্রয়োজন ॥ প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের ১০৬ ॥ মহানবী [সা]-এর আদর্শ রাষ্ট্র ॥ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ১১৫ ॥ একটি সুন্দর সমাজ গঠনে মহানবী [সা]-এর আদর্শ ॥ অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম ১২৩
শি ক্ষা
মহানবী [সা]-এর শিক্ষাক্রম ও বর্তমান শিক্ষাক্রমের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ॥ ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ১২৭
ছো ট গ ল্প
ক্ষুধা নিবারণ ॥ হাসান আলীম ১৩৫
প্র ব ন্ধ
আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু ॥ শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ১৩৯
প্রাচ্যবিশেষজ্ঞগণের ডাহা মিথ্যাচার, প্রেক্ষাপট : সীরাতে রাসূল [সা] ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম ১৪৫
ক বি তা গু চ্ছ
সুজাউদ্দিন কায়সার ১৪৯ ॥ শরীফ আবদুল গোফরান ১৫০ আলতাফ হোসাইন রানা ১৫১ ॥ রেজানুর রহমান রেজা ১৫২
প্র ব ন্ধ
নবী এলেন মরু-মক্কায় ॥ আসাদ বিন হাফিজ ১৫৩ ॥ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নবী মুহাম্মাদ [সা] ॥ নাসির হেলাল ১৬৫
ছো ট গ ল্প
প্রশংসিত ॥ নাজিব ওয়াদুদ ১৮২
ভ্র ম ণ
মক্কায় আন্তঃধর্ম সংলাপ : ইসলামী রেনেসাঁর মাইলফলক
সাইফুল্লাহ মানছুর ১৮৭

www.bjilibrary.com

ক বি তা গু চ্ছ
আবু তাহের বেলাল ১৯৩ ॥ আল হাফিজ ১৯৩ ॥ সামুয়েল মল্লিক ১৯৪ ॥ মৃধা আলাউদ্দিন ১৯৫ ॥ আফসার নিজাম ১৯৬ ॥ মনসুর আজিজ ১৯৭ ॥ আহমদ বাসির ১৯৭ ॥ রেদওয়ানুল হক ১৯৮ সাইফুল্লাহ্ খালিদ ১৯৯ ॥ জালাল খান ইউসুফী ২০০
মো: দিদারুল আলম ২০১
ছো ট গ ল্প
আড়াল ॥ নাসীমুল বারী ২০২
প্র ব ন্ধ
নারী অধিকার ও আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ [সা] ॥ ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ ২০৬
ক বি তা গু চ্ছ
ওমর বিশ্বাস ২১০ ॥ শফিকুর রহমান রঞ্জু ২১১ ॥ মানসুর মুজাম্মিল ২১১ ॥ সোহরাব আসাদ ২১২ ॥ মো: কবিরুজ্জামান ২১৩ সোহেল মল্লিক ২১৪ ॥ শহীদ সিরাজী ২১৪
প্র ব ন্ধ
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক মুহাম্মাদ [সা] ॥ মুহাম্মদ রেজাউল করিম ২১৫ ॥ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে রাসূলের [সা] আদর্শ জাফর আহমাদ ২২৭
আ ল হা দী স
তাকওয়াপূর্ণ সফল জীবন গঠনে রাসূল [সা]-এর কয়েকটি হাদীস মো: আব্দুর রহীম খান ২৩৭
ক বি তা গু চ্ছ
হারুন ইবনে শাহাদাত ২৫১ ॥ আমিনুল ইসলাম ২৫২ ॥ ইয়াকুব বিশ্বাস ২৫২ ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল ২৫৩ ॥ নূর আল ইসলাম ২৫৪ রেহানা রুমি সুবর্ণা ২৫৪ ॥ মাহতাব উদ্দীন আহমেদ ২৫৫ আনোয়ারুল কাইয়ূম কাজল ২৫৫
প্র ব ন্ধ
বিশ্ব শান্তির পথ ॥ ইকবাল কবীর মোহন ২৫৭ ॥ রাসূল [সা]-এর জীবন ॥ মো: আবেদুর রহমান ২৪৯ ॥ নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলাম ॥ অধ্যাপিকা শারাবান তহুরা ২৬৭ ॥ বিশ্বনবীর [সা] দশটি উপদেশ ॥ হেলাল আনওয়ার ২৭৪ ॥ মানুষকে আল্লাহ ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করেননি ॥ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ২৮০ ॥ হেরার মশাল ॥ মো: আবদুর রহমান ২৮৫

www.bjilibrary.com

ক বি তা গু চ্ছ
জুলফিকার সাইদুল ২৮৭ ॥ নূর-ই আউয়াল ২৮৮ ॥ গোলাম নবী পান্না ২৮৯ ॥ রফিকুল ইসলাম ফারুকী ২৮৯ ॥ নজরুল ইসলাম শান্ত ২৯০ ॥ এনাম শেখ ২৯১ ॥ ইকবাল মুজাহিদ ২৯১ সৈয়দ আশরাফ হোসেন মিলন ২৯২
স ং স্কৃ তি
মহানবী [সা] ও বিশ্বসংস্কৃতি ॥ শেখ আবুল কাশেম মিঠুন ২৯৩
ছো ট গ ল্প
কবির স্বপ্ন পূরণ ॥ জুবায়ের হুসাইন ৩০৫
সা হি ত্য
'ওঠে এ কী ঘন-রোল– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' ॥ শফি চাকলাদার ৩০৯ ॥ আরবি গীতি-কবিতার বিকাশধারা : একটি পর্যালোচনা ॥ ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ ৩১৪
শি ক্ষা
শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবীর [সা] ভূমিকা
মোঃ আতিকুর রহমান ৩২২
ন ও মু স লি মে র ক থা
স্বপ্নের বেড়াজালে ॥ মূল : এস.এম. লাই
তরজমা : এস. এম. জহির উদ্দীন ৩২৮
মু জি যা
প্রসঙ্গ : মুজিযা ॥ ফখরুদ্দীন আহমাদ ৩৩১
মা ন বা ধি কা র
রাসূল [সা] ও মানবাধিকার : মুহাম্মাদ ইউছুফ ৩৩৭
প্র তি বে দ ন
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ৩৪৩
সংবাদপত্রের পাতা থেকে – ৩৫৮

www.bjilibrary.com

মুক্তির একমাত্র পথ

কর্ম ও জীবনপ্রণালী কিংবা সামাজিক ও বৈশ্বিক ভৌগোলিক কারণে মানুষের মধ্যে যত প্রভেদই থাকুক না কেন– একমাত্র ইসলামের বিধান, শাসন, জীবন-পদ্ধতি, সামগ্রিক আদর্শ ও সংস্কৃতি জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া আখিরাতে চূড়ান্ত সফলতার অন্য কোনো পথই মানুষের জন্য খোলা রাখা হয়নি। বিজয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না।

মহান রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব– রাসূল মুহাম্মাদকে [সা] 'হিদায়াতস্বরূপ', 'সুসংবাদ দানকারী', 'সতর্ককারী', 'রহমতস্বরূপ' ও 'পথ-প্রদর্শক' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এমন আরও বহুতর বিশেষণে রাসূল [সা] বিশেষিত। আল কুরআনে বলা হচ্ছে–

"তিনি তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সমস্ত দীনের ওপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" [আল ফাতাহ : আয়াত-২৮]

আল্লাহপাক চান বান্দা হিসাবে মানুষ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে এবং তাঁর মনোনীত রাসূলকেই [সা] অনুসরণ করবে। এটাই মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ঘোষণা।

www.bjilibrary.com

পৃথিবীতে বহু মানুষের বসবাস। প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্র এবং জীবন যাপনের পৃথক কর্মপন্থা। মানসিকতা, চিন্তা ও ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রেও রয়েছে অজস্র ভিন্নতা। প্রতিটি সমাজ, দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রয়েছে পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিজস্ব একটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। সেটা থাকতেই পারে। পৃথিবীর ভারসাম্যপূর্ণ চলমানতার জন্য সেটার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু সকল কিছুর ওপর প্রকৃত সত্য এই যে, কর্ম ও জীবনপ্রণালী কিংবা সামাজিক ও বৈশ্বিক ভৌগোলিক কারণে মানুষের মধ্যে যত প্রভেদই থাকুক না কেন– একমাত্র ইসলামের বিধান, শাসন, জীবন-পদ্ধতি, সামগ্রিক আদর্শ ও সংস্কৃতি জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া আখিরাতে চূড়ান্ত সফলতার অন্য কোনো পথই মানুষের জন্য খোলা রাখা হয়নি। বিজয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি, পার্থিব যে বৈষয়িক চিন্তা কিংবা তার জন্য যে পেরেশানী, যশ-খ্যাতি বা জাগতিক স্বার্থের পেছনে ছুটে চলা– এটাকেও রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত তুচ্ছতর ও লঘু দৃষ্টিতে বিবেচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন–

“যারা শুধুমাত্র এই দুনিয়ার জীবন এবং এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে, তাদের কৃতকর্মের সমুদয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দিয়ে দেই এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। কিন্তু এধরনের লোকদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। [সেখানে তারা জানতে পারবে] যা কিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে [তা সবই] বরবাদ হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।” [সূরা হূদ : আয়াত-১৫-১৬]

বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, যারা শুধুমাত্র বৈষয়িক ভোগ-বিলাস, লাভ, লোভ, ক্ষমতা, যশ-খ্যাতি কিংবা উন্নতি সমৃদ্ধি অর্জন করাকেই কেবল তাদের জীবনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে– আল্লাহর এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ তাদের জন্য আদৌ শুভ ও কল্যাণবহ নয়।

আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য। এতই নগণ্য যে এক ফোঁটা বুদবুদের সাথেও এর তুলনা চলে না। সুতরাং এই সাময়িক, ততোধিক ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য মহামূল্যবান একটি জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে সমূহ বিপন্ন ও ভয়ঙ্কর ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করা কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাজ হতে পারে না। দুনিয়া ও আখিরাতের লাভ-ক্ষতির সুবিশাল প্রভেদটা সামনে নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে কোনো বুদ্ধিমানের পক্ষেও এমন পতন ও পচনশীলতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

কিন্তু আফসোসের বিষয়, এসব বিচার-বিশ্লেষণ তো দূরে থাক, চিন্তার সামান্য কণা-পরিমাণও এসকল ক্ষেত্রে ব্যয় করতে অনেকেই রাজি নয়। এর চেয়ে পার্থিব লাভ-লোকসান, হিংসা-বিদ্বেষ, আপন স্বার্থ অর্জনের যাবতীয় কূটকৌশল, ক্ষমতার লিপ্‌সা, ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ, এমনকি শেয়ার ও টেন্ডার-এর মতো জটিল বিষয় নিয়ে দর কষাকষি করে একটি জীবন পার করে দিতে তারা অধিক পরিমাণে আগ্রহী। অথচ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে 'জঘন্য জীবের' সাথে তুলনা করেছেন। যারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে দীনের পথে, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের জন্য সৎ ও শুভ কর্মের দিকে ধাবিত করে না তাদের জন্য আর কোন্ সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকে!

আগেই উল্লেখ করেছি, ভৌগোলিক কিংবা দেশ ও সমাজের মধ্যে আমাদের যতই দূরত্ব কিংবা সীমারেখা কিংবা বৈচিত্র্য বা পার্থক্য থাকুক না কেন, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাদের একটা ক্ষেত্রে ঐক্যকে সুসংহত, সুদৃঢ় ও সংযত করার প্রয়াস থাকতেই হবে, আর সেটা হচ্ছে– সর্বান্তকরণে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত পথ এবং রাসূলের [সা] যথাযথ অনুসরণ করা। এটাই আমাদের জন্য মুক্তির একমাত্র পথ।■

www.bjilibrary.com

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌দহম

আবির্ভাব

নাই তা-জ
তাই লা-জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ!
করে তসলিম হর কুর্নিশে শোর আ-ওয়াজ
শোন্‌ কোন মুঝদা সে উচ্চারে ‘হেরা’ আজ
ধরা-মাঝ।
উরজ য়্যামেন নজদ হেজাজ, তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহারান স্মরি–কাহার বিরাট নাম
পড়ে “সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।”
চলে আঞ্জাম,
দোলে তাঞ্জাম,
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম!
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর্‌, হাতে ‘আব জম-জম-জাম’!
শোন্‌ দামাম কামান তামাম সামান
নির্ঘোষি’ কার নাম
পড়ে “সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।”

২.

মস-তান!
ব্যস থাম!
দেখ মশগুল আজি শিস্তান বোস্তান
তেগ গর্দানে ধরি দারোয়ান রোস্তাম!
বাজে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান
গুলফাম!
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগে বাগ
পশ্চিমে নীলা লোহিতের খুন জোশীতে রে লাগে আগ
মরু সাহারা গোবীতে সবজার জাগে দাগ।
নূরে কুর্শির
পুরে তুর-শির
দূরে ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হুরী ফুর্তির
ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানী দুরানী তুর্কীর!
আজ বেদুইন তার ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুঁড়ে ফেলে বল্লম,
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।”

www.bjilibrary.com

ফররুখ আহমদ অনূদিত
অগ্রন্থিত কবিতা

কবি ফররুখ আহমদ। বাংলা সাহিত্যের এক কালজয়ী মহাকবি। তিনি যে কত বিচিত্র কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, তারই স্বাক্ষর বহন করছে কবির বর্তমান অনূদিত এই না'তটি। আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই-এর 'রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। তিনি এই গ্রন্থের 'পূর্ব কথা'য় সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেন যে- 'পুস্তকটির বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে এর বাংলা নামকরণ করেছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন মরহুম কবি ফররুখ আহমদ। এর প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত কবিতাটির অনুবাদ করে দিয়েও তিনি আমার ঋণপাশে আবদ্ধ করে গেছেন।' ফররুখ আহমদের অনূদিত এই অসামান্য না'তটি এতদিন বলা যায় লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। সুধী পাঠকের জন্য না'তটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো। আশা করি আগামীতে ফররুখ রচনাবলীতে এটা গ্রন্থবদ্ধ হবে। সেটাই একান্ত কাম্য।

–মোশাররফ হোসেন খান

বজ্রের ধ্বনি ছিলো সে, অথবা ছিলো সে 'সওতে হাদী'
দিল যে কাঁপায়ে আরবের মাটি রাসূল সত্যবাদী।
জাগালো সে এক নতুন লগ্ন সকলের অন্তরে,
জাগায়ে গেল সে জনতাকে চির সুপ্তির প্রান্তরে।
সাড়া পড়ে গেল চারদিকে এই সত্যের পয়গামে,
হলো মুখরিত গিরি-প্রান্তর চির সত্যের নামে।

www.bjilibrary.com

বে-নজীর আহমদ-এর
না'ত

হাজারো ছালাম লও নবী মুহম্মদ
দুনিয়া জাহান জপে এ নাম-শহদ।

প্রভাতে জাগিয়া পাখী
এ নামে উঠিছে ডাকি
এ নামে আশেক সাকী
প্রেম গদগদ।

ভোমরা গাহিছে তব
দরূদ নব নব
কত যে তাহার ক'ব
তারিফ বে হদ।
গাহিছে বাতাস নিতি
তোমারি মধুর গীতি–
তোমারি আশেকে তিতি'
বহে নদীনদ।

নবীজি নবীজি বলি
দিবস উঠিছে জ্বলি,
রজনী শিশিরে ঢলি
চুমে তব পদ।

www.bjilibrary.com

আফজাল চৌধুরীর কবিতা
মদিনাতুন্নবী [সা]

রাহমাতুল্লিল আলামীনের শহর-মদিনাতুন্নবী [সা]
নাতিউঁচু পাহাড় ও শৈলমালায় শোভিত রৌদ্রকরোজ্জ্বল
এক প্রশান্ত নগরী, পুরুষ্ট পাতার প্রিয়দর্শী খেজুর বৃক্ষ সর্বত্র
আর বেশি কিছু নেই, সারি সারি খেজুরের ঘন সন্নিহিত উদ্যান
ধূলি ধূসর ও সবুজাভ, খোলা ময়দানে কিছু চাষবাস
আর সকল প্রচীন ও আধুনিক হর্মরাজির উচ্চতা ছাড়িয়ে
হেরেম শরীফের চারকোণের চারটি মিনার
দর্শনীয় সকল অবস্থান হতেই

এইখানেই মসজিদে নববী
ওখানেই সমাহিত সর্বশেষ পয়গম্বর [সা]
এইমাত্র শেষ করে এসেছি আংশিক যিয়ারত
ওহোদ পর্বতের পাদদেশ হতে
ক্ষমাহীন রণক্ষেত্রের মহান শহীদানের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে
বার বার মুছতে হয়েছে উপচানো অশ্রু
আল্লাহর সিংহের পবিত্র দেহের ছিন্নভিন্ন অংশ
ছবির মতো ভাসছে চোখে এখনও
অন্তরে-বাইরে-চক্ষুগোলকে জ্বালা
ইয়াসরেবের খেজুর বাগিচাগুলোর দিকে চেয়ে
চোখ জুড়ানোর চেষ্টায় সফলকাম হইনি এখনো
তাই এলাম জান্নাতুল বাকীর ফটকে
হায় আল্লাহ!
এতো দেখি আমার দেশের জেলখানার চেয়েও
কঠিন লৌহকপাটবেষ্টিত
ভেতরে রুক্ষ মৃত্তিকায় একটি সবুজ তৃণখণ্ড নেই
ভক্তদের চোখের পানি ছাড়া নেই কোন জলসিঞ্চন

অনেকক্ষণ হৃদয়ে গেঁথে রইল জান্নাতুল বাকীর জমিনের
রুক্ষতা ও পরিচর্যাহীনতা
বিষণ্ণতা উপচে পড়ছে সর্বসত্তায়

www.bjilibrary.com

আমি আযমের মানুষ
আমি তো বহিরাগত, তীর্থপথিক মাত্র
এই শহর দ্রুত পাল্টে হচ্ছে আধুনিক সৌদী নগর
চোখ ঝলসানো রূপ ও স্থাপত্য যেন বুকের ওপর
ঝুলছে অহংকারের ফলক
কিন্তু আমার আগ্রহ এই কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত ক্ষীণ
ভক্ত আশেকানের চোখের পানি ও উচ্চরোলে
যিনি নন্দিত আমি যে তাঁর মসজিদ, রওযা
তাঁর পবিত্র অকৃত্রিম শহরের উদ্দেশ্যে এসেছি
নবীজী! নবীজী! ক্ষমা করুন,
আমার ওপর হতে আপনার সদয় করুণার দৃষ্টি
তুলে নেবেন না, আমি ও আমার বাপ-মা
আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত, সন্তান-সন্ততিও
আর হৃদয়ের গোপন কন্দর হতে দূর হোক নেফাকের কণা
কেননা আমি আমার দেশবাসী অভাগা বাঙালীদের
তালাশ করছি বেশী, নিজেকে লাগছে বড় বিষণ্ন, একা
দীর্ঘ সৌদী জুব্বা পরে পায়ের পাতা মাড়িয়ে
কেমন ঘুরে ফিরছে তামাম বিদেশী মানুষ
ওসমানীয় খেলাফত ও সৌদী বাদশাহী
নিজ নিজ স্থাপত্যে
রওযা, মসজিদ ও নবীর শহরকে শোভন করে তুলেছেন
আর আমার পূর্ব দেশীয়রা ঝাড়ু হাতে নিত্যদিন
পরিষ্কার করছে সে সব, ধন্য আমি ধন্য যে
অহংকারে উদ্ধত নয় আমার দেশ-কাল-পাত্রের পরিচয়
বরং মিউনিসিপালিটির বরকন্দাজ পার্টি
ওদের তাড়িয়ে দেয়, সওদা ছিনিয়ে নেয়
মসজিদুল হারামের পাশেও
নি:সন্দেহে উৎপীড়নকারীর চেয়ে উৎপীড়িতের ভূমিকায়
অবস্থান ভালো, মর্মাহত, হৃদয়
নবীজী! আমি জানি, অচল মুদ্রার মত হলেও
আমাকে আপনি ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় কুড়িয়ে নেবেন
কী আমার সৌভাগ্য যে আমি আপনার
মসজিদের মেহরাবের পাশে দাঁড়িয়ে

www.bjilibrary.com

আমি রোদন করছি, হাহাকার করছি
জানি আপনি জাগ্রত, জীবন্ত এবং
মানুষের মিছিলের পুরোভাগে
অসীমের কারাভান নিয়ে অগ্রসরমান, তবু
নবীজী, কোথায় আপনার খেলাফত
আর কল্যাণময় বংশধারা
যা ছিল এই উম্মার প্রতি ন্যস্ত পবিত্র আমানত
এখানেও ফাতমী, সিদ্দিকী ও ওসমানী ধারার কেউ নেই নাকি
কোথায় কুরাইশকুল, হেজাজী মানুষ?
গৌরবর্ণ দীর্ঘ উজ্জ্বল দেহের প্রতি চোখ ধায়
পরক্ষণেই তাতে হায় ভিন্ন কিছু দেখি
সুশ্রী, সফেদ, মিহি, ওয়েলকাট সৌদী জুব্বার সারি
পাতা ছাড়িয়ে ধূলি মাড়িয়ে চলেছে এখন আপন কায়দায়

আর খেলাফত?
জান্নাতুল বাকীর রুক্ষ মৃত্তিকার নিচে
এতকাল তো কবরের নিচেই শায়িত ছিলো সে
এখন দেখি এর চারপাশে লোহার গরাদ টানানো হয়েছে।

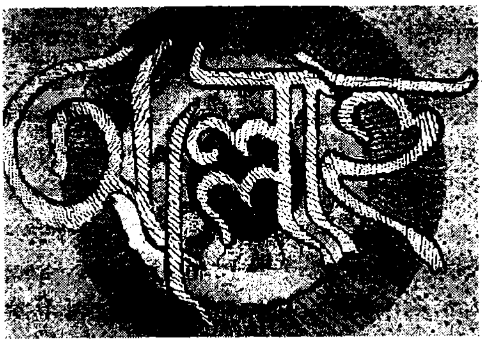

www.bjilibrary.com

মহাপুরুষের মানবতা

এয়াকুব আলী চৌধুরী

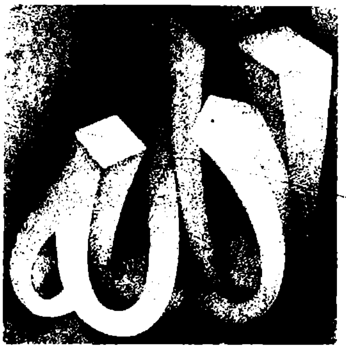

হযরত মুহাম্মাদ [সা] মানবতার সুমহান গৌরব তিনি ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার নহেন, তিনি মানুষ; ইহাতেই তাঁহার সার্থকতা ও ইহাতেই তাঁহার অহঙ্কার। তিনি মানুষের মহিমা ও গৌরবের যে ডঙ্কা বাজাইয়াছেন, মানুষের পক্ষে তাহা অতি বড় গৌরবের বিষয়।

মানুষ যেমন একদিকে মহান ও অসীম আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে তেমনি স্বীয় বিরাট ও মহতী সত্তাও হারাইয়া ফেলিয়া, মানুষের প্রাপ্যকে দেবতার স্কন্ধে চাপাইয়া আপনাকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছিল। ঝড় যেমন অন্ধকারের নিবিড় ছায়াপাতকারী ঘোর কৃষ্ণ মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া আকাশ ও পৃথিবী উভয়কেই আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে, তিনিও তেমনই মানব মনের বহু যুগ সঞ্চিত ভ্রমান্ধকার দূরীভূত করিয়া আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের সত্তাকেই ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যেমন বলিয়াছেন, 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।' পতিত মানুষের নিকটে তেমনি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন : হে মানব, আমি আল্লাহর দূত ও দাস, আমি দেবতা নই; অবতার নই, -"আনা বাশারুম মিছলুকুম" -আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ।

www.bjilibrary.com

হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর এই বাণী মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জয় ঘোষণা মানুষের কাছে মহাপুরুষের চরম ও মহত্তম দান। ইহা মানুষের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে ও মানবতার ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে। তাঁহার পূর্বে মানুষ আপনাকে হীন করিয়া দেখিয়াছে, আত্মশক্তি সম্বন্ধে সে কেবলই নিদারুণ অবজ্ঞার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। মানুষ এতকাল যাহারই মধ্যে শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, যিনিই তাহাকে ক্ষমতায় স্তব্ধ, মহত্ত্বে মুগ্ধ বা সান্নিধ্যে স্নিগ্ধ করিয়াছেন, মানুষ তাহাকেই দেবতা বানাইয়া ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার ভাবিয়া একেবারে পর করিয়া দিয়াছে। সে কিছুতেই মহাপুরুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে, আপন বলিয়া দাবি করিতে পারে নাই; মহাপুরুষের মধ্যে মানুষেরই উন্নতি দর্শনে উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ ও সাহস পায় নাই।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] মানুষের এই নিদারুণ ভ্রম একেবারে বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আপনাকে আল্লাহর দাস ও মানুষরূপে ঘোষণা করিয়া, মানুষের সমগ্র জীবন-ব্যাপারে আপনাকে মিশ্রিত করিয়া মানুষের মনের মধ্যে এই মহাসত্য দৃঢ়রূপে আঁকিয়া দিয়াছেন যে, মানবত্রাতা মহাপুরুষ মানুষ হইতে উচ্চ নহেন, মানব সত্তার সীমার বাহিরে নহেন, তিনিও মানুষ— মানুষেরই তিনি মহত্তম পরিণাম।

শত শত মানুষ যাঁহার বাণীর বেদনায় অধীর হইয়া ধর্মকে বরণ করিয়াছে, শত শত আর্ত যাঁহার সেবায় স্নিগ্ধ হইয়াছে, যিনি মানুষের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মণি-কাঞ্চনের মধ্যে থাকিয়াও অল্পাহারে ও অনাহারে জীবন যাপন করিয়াছেন, অথচ যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে রাজমুকুট ধূলায় লুটাইয়াছে, যাঁহার স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া মরুভূমির অসুর দেখিতে দেখিতে মানুষ হইয়া মহত্ত্বের মহিমা লইয়া দিগদিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই মহাপুরুষকে নিঃশেষে ঘরের মধ্যে লাভ করিয়া, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাঁহার মুখে 'আমি মানুষ' শুনিয়া মানুষের মন উন্নত হইয়াছে; মানুষের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইয়াছে। মানুষ বহু দিন পরে আপনাকে চিনিতে পারিয়া উজ্জ্বল রাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

খ্রিস্ট, বৌদ্ধ ও চৈতন্য অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিয়া মানুষকে উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা মানুষের উপাস্য সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া, মহাপুরুষকে ঈশ্বরের আসনে বসাইতে দিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শোচনীয়রূপে পঙ্গু করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদও মানুষকে প্রেম ও ক্ষমার উপদেশ দিয়াছেন, আত্মজীবনে তাহার জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আরও করিয়াছেন; তিনি মহাপুরুষের কল্পিত দেবসিংহাসনে পদাঘাত করিয়া মানবতার উদার সমতলে দাঁড়াইয়া উর্ধ্বে অঙুলি তুলিয়া বলিয়াছেন : ঐ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া, হে মানুষ! তোমার আর কোন উপাস্য নাই; ঐ আল্লাহ ছাড়া তোমার চেয়ে আর কেহ বড় নহে। এই মহাবাণী মানুষের মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার আত্মার আগুন এমন করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে, তাহার আধ্যাত্মিক জীবনকে এমন উর্ধ্বগতি প্রদান করিয়াছে যে, তাহার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হইতে পারে না।

বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য মানুষকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহার এই মতের যৌক্তিকতা আলোচনা না করিয়াও বলা যাইতে পারে, তিনি প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্বারা মানুষের জয়

www.bjilibrary.com

ঘোষণা করেন নাই, সমস্তই যে এক অখণ্ড জগদাত্মার বহির্বিকাশ মাত্র তাহাই বুঝাইয়াছেন। তিনি মানুষের স্বতন্ত্র সত্তাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছেন। তিনি জীবময় নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিবাদ করিতে গিয়া একেবারে চরমান্তরে পৌঁছিয়াছেন; ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব এমন করিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন যে, জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার সোহম একমেবাদ্বিতীয়ম মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা নহে। তিনি মানুষকে ঈশ্বরের সহিত অবিচ্ছেদে যুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়া প্রকৃতপক্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি-চেষ্টাকে হত্যা করিয়াছেন। কারণ যে নিজেই পরম ও চরম— যাহার উপরে আর কেহ নাই, তাঁহার আবার উন্নতির সার্থকতা কোথায়? তাহার উর্ধ্বগতির অর্থ কি? তাহার চেষ্টার অবসর নাই, সাধনার আনন্দ নাই, বিকাশের উল্লাস নাই। তাহাকে অনন্তের আত্মীয় করিয়া নিতান্তই শান্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

না, মানুষের মন ইহা মানিয়া লইতে সম্মত হইতে পারে না। সীমাহীন উর্ধ্বগতির যে আনন্দ, মানুষ কিছুতেই তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। মাথার উপরে তাহার অতুলনীয় অতি-বড় মহান একজনকে চাই-ই চাই। সেই উচ্চতম মহানকে লাভ করিবার যে অন্তহীন সাধনা তাহাতেই মনুষ্যত্বের মহত্তম বিকাশ। সেই যে মহতোমহীয়ান চিরদিন মানুষের মনকে আকর্ষণ করিতেছে, সাধনার পর সাধনাকে বিফল করিয়া ক্রমাগত ডাকিয়া চলিয়াছে, ধরি ধরি করিয়া যাহাকে ধরা যাইতেছে না, অথচ যাহাকে ধরিতেই হইবে, নহিলে কিছুতেই প্রাণের তৃষ্ণা মিটিবে না, সেই সত্য ও সুন্দরকে লাভ করিবার যে অবিরাম আয়োজন ও অশ্রান্ত পদক্ষেপ, চিত্তকমল তাহাতেই নিত্য নব দলে বিকশিত হয়, আত্মা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রাগে হাসিয়া উঠে।

এই দার্শনিকতার জটিল জাল ত্যাগ করিয়াও বলা যাইতে পারে, সেই সোহম-বাদী জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীকে মানুষ দূর হইতে নমস্কার করিতে পারে, আপন বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে না। বিশ্ব মানবের নিখিল জীবনধারার সঙ্গে তাঁহার জীবনের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। তিনি সংসার-ত্যাগী গুহাবাসী সন্ন্যাসীর আদর্শ হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার মতো ও জীবন গৃহবাসী সুবিপুল মানব-সমাজের জীবন-মূলে রস সঞ্চার করিতে সমর্থ নহে। তিনি মানব-সাধারণের উদ্ধারকর্তা নহেন। তাঁহার প্রদত্ত রাজগিরি লইয়া মানুষের জীবন চলিতে পারে না।...

একদিকে যিনি ভূলোক দ্যুলোক অতিক্রম করিয়া স্রষ্টার সন্নিহিত হইয়াছেন, যিনি অধ্যাত্মের অমৃত-উৎস উৎসারিত করিয়া মানুষকে মরজীবনে অমরত্ব লাভের সহায়তা করিয়াছেন, যিনি বলিয়াছেন: "আমার বাণীই ধর্ম বিধি; আমার কার্যই ধর্মমত ও আমার অবস্থাই সত্য" তিনিই পক্ষান্তরে সাত দিন অনাহারে থাকিয়া জীবিকার্জনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, শত্রুর অসিতলে মস্তক রাখিয়া আল্লাহর নাম বলিয়াছেন, পুত্রের মৃত্যু-শোক হৃদয়ে ধরিয়াছেন, বৃদ্ধার বোঝা বহিয়াছেন ও ভৃত্যের সেবা করিয়াছেন, বন্ধুর বিবাহোৎসবে আনন্দ করিয়াছেন ও শোকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কে আর মানুষের শক্তি দেখাইয়াছে? মানুষকে উন্নতির প্রেরণা দিয়াছে? তাঁহার কার্যে মানুষের বুকে ভরসা আসিয়াছে, উন্নতির আবেগে মানবচিত্ত দুর্নিবার বেগে

www.bjilibrary.com

কম্পিত হইয়াছে। যুগ যুগের তুচ্ছ ও উপেক্ষিত মানুষ আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া মহত্ত্ব ও মহিমার সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টিকোণ করিবার অবসর পাইয়াছে।

যিনি মরণকে রহস্য বলিয়াছেন, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, জীবনের রহস্য এত গভীর, জটিল ও বিপজ্জনক যে, মৃত্যুরহস্য তাঁহার তুলনায় কিছুই নহে। এই জীবন-সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিলে মানুষের নিস্তার নাই। এই শত দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, এই অনন্ত পাপ-প্রলোভন, স্বার্থ তাড়না, মায়ামোহ, ইহার মধ্যে থাকিয়া কি উপায়ে ধর্মের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যাইতে পারে, মাতা পিতা পুত্র পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করিয়া বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবন অক্ষুণ্ন রাখিয়া কি উপায়ে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের সহিত জীবনের নিগূঢ় সম্মিলন স্থাপন করা যায়, ইহাই মানুষের সর্ব প্রধান সমস্যার বিষয়। মানুষকে এই সমস্যার মীমাংসা করিতেই হইবে। এই সমস্যার দুরূহতা চিন্তা করিয়া ভারতের অন্যতম মহাপুরুষ বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ক্ষুধার্ত লোকের নিকটে ধর্মের কথা বলিয়া লাভ নাই, অগ্রে তাহার পেটের জ্বালা শান্ত কর, তারপর ধর্মের কথা বলিও।

বস্তুত, জীবন-ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত ও মথিত হইয়া মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। পাপের রুদ্র লীলাময় সংসারে পাপের স্পর্শ পরিহার করিতে অক্ষম হইয়া লোকালয় হইতে বহু দূরে বা মানব সমাজের সীমান্তরালে সন্ন্যাসের আশ্রয় লওয়া সুকঠিন নহে। কিন্তু তাহা বিশ্ব-মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষকে ঘরসংসার বাঁধিয়া বসবাস করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ইহাই তাহার নিয়তি ও ইহাতেই তাহার পৌরষ। মরিয়া যাওয়া অপেক্ষা বাঁচিয়া থাকা কঠিন। সাংসারিক জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত দুঃখ ও পাপের সহিত দুর্নিবার সংগ্রামে রক্তরঞ্জিত। সংগ্রাম পরিহার করা অপেক্ষা সংগ্রাম জয় করাই মহত্তর শক্তির পরিচায়ক। তাহা যতই কঠিন হউক না কেন, তাহাই স্বাভাবিক ও সুমহান।

সুতরাং জীবন-সমস্যার সমাধান করিয়া ধর্মের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম ও সুমহান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনে যিনি মানুষকে সহায়তা করিয়াছেন, আত্মজীবনে জীবন-সমস্যার সমাধান করিয়া ধর্মের মহিমা দেখাইয়াছেন, তিনি মানুষের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, শঙ্কররাচার্য ও শ্রীচৈতন্যের জীবন জ্ঞানপ্রেমে যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, এ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকার। তাঁহারা এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যথেষ্ট মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের শিক্ষা এ বিষয়ে একেবারে নির্বাক। গৃহবাসী মানব সাধারণ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে পারে, ভালোবাসিতে পারে, তাঁহাদের প্রেমের বচন পদ্মরাগমণির ন্যায় মস্তকে ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগকে আদর্শরূপে গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে পারে না। তাঁহারা পথের ধারে গলিত কুষ্ঠ রোগী পড়িয়া থাকিলে কি করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন; কিন্তু কি করিয়া অভাব ও প্রলোভনের মধ্যে সদুপায়ে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করা যায়, পত্নীর প্রেমার্ত চিত্ত স্নিগ্ধ করিয়া পিতার প্রীতি লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের জীবন আমাদিগকে কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না। অন্যায়

www.bjilibrary.com

হইলেও সহজ উপায়ে বিপুল বিত্ত হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে কেমন করিয়া লোভ দমন করা যায়, চিরবৈরীকে পদতলে প্রাপ্ত হইয়াও কিরূপে প্রতিহিংসার পৈশাচিক অগ্নি নির্বাপিত করিয়া প্রেমের অমৃত ঢালা যায়, সুরসুন্দরীগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া মঙ্গলময়ের ধ্যান করা যায়, একমাত্র পুত্রের বিয়োগে পত্নীর দুর্নিবার শোকোচ্ছ্বাসের সম্মুখে প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করা যায়, ছিন্নবাস-পরিহিতা পত্নীকন্যার ক্ষুধা-কাতর মলিন মুখের দিকে তাকাইয়া দু:সহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে বিধির ইচ্ছা স্মরণ করিয়া পুলকিত হওয়া যায়, মানবজীবনের এই সমস্ত স্বাভাবিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তাঁহাদের জীবন হইতে কোনও আদর্শ শিক্ষা লাভের উপায় নাই। জীবনের পদে পদে দু:খ ও পাপ জয় করিয়া সুখ ও সোহাগের মোহ কাটাইয়া কিরূপে চিত্তকে শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ করিয়া ভূমানন্দে নিমজ্জিত হওয়া যায়, মহাপুরুষের জীবনে তাঁহার সংগ্রাম ও সিদ্ধ চিহ্ন দেখিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য, শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সাংসারিক পাপ-তাপের মধ্যে মানুষের মন স্বতত:ই লালায়িত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানুষ ইহার কোন উত্তর প্রাপ্ত হয় না।

মানুষের নিকটে স্বাভাবিক ধর্ম জীবনের আদর্শ স্থাপনকারীরূপে সকলের উপরে দুইজন মহাপুরুষের কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। একজন শ্রীকৃষ্ণ অপর হযরত মুহাম্মদ [সা]। ইঁহারা উভয়েই গৃহী ছিলেন, সমাজে বাস করিয়াছেন, জাতীয় জীবনে ক্রিয়া করিয়াছেন ও তদাবস্থায় মানুষকে স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম সাধনের উপদেশ দিয়াছেন; বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের কথাই এক হইয়া দাঁড়ায়— ভোগের মধ্যে থাকিয়া ত্যাগের সাধনা কর, সংসারে থাকিয়া কর্তব্য সম্পাদন কর। কিন্তু উভয়ের শিক্ষা এক হইলেও উভয়ের জীবনের প্রেরণার মধ্যে বিষম বৈষম্য বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও চরিত্র-কথা রূপক ও কিম্বদন্তীতে সমাচ্ছন্ন; তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবনের অলৌকিক দেব-মহিমা ভেদ করিয়া প্রকৃত মানুষের পরিচয় পাওয়া ও তাঁহার সহিত জীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করা কঠিন ব্যাপার। তাঁহার রাস লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন শিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হিন্দু তাঁহার মানবীয় অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। বিশ্বের প্রাণভূত যে পরমাত্মা বা পরম পুরুষ সমুদয় জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিয়াছেন, যিনি সমুদয় জীবের হৃদয়ানন্দ পরম ধন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই রূপক মূর্তি। সুতরাং এরূপ জীবনের প্রেরণা সাধারণ মানব জীবনের উপরে কার্য করিতে পারে না।

তথাপি যদি গীতার কৃষ্ণকে সত্য ও জীবন্ত মানুষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও তিনি মানুষের আদর্শ বা উদ্ধারকর্তা নহেন। সত্য হইলে তিনি বিস্ময় ও নৈরাশ্যের পাত্র মাত্র— অনুসরণের বস্তু নহেন, মানুষের সহায় ও বান্ধব নহেন; কারণ তিনি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, মানুষও তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। “পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম সংস্থাপনার সম্ভাবামি যুগে যুগে।” তিনি মানুষ নহেন, ঈশ্বরের অবতার; তাঁহার কার্যসমূহ দেবতার লীলামাত্র, মানুষের মহত্ত্ব-মহিমা ও গৌরব গরিমা নহে।

www.bjilibrary.com

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর জীবন ও চরিত্র কল্পনা-কুহেলিকায় অন্ধকার নহে; তাহা ঐতিহাসিক সত্যের রুদ্রালোকে স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল। তিনি হাড়ে হাড়ে মানুষ। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি প্রত্যেক দিন কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতেন, কতক্ষণ বিশ্রাম করিতেন, কোন দিন কাহার সহিত কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই পুংখানুপুংখরূপে নির্দেশ করা যায়। বৈদেশিক রাজার নিকট তাঁহার প্রেরিত পত্র ও পরিচ্ছদের নিদর্শন এখনও মুসলমানদিগের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। তাহার কোনটিই ভক্তের কল্পনা নহে,-ঐতিহাসিক গবেষণার রুদ্রালোকে পরিচিত সত্য। শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও মুসলমানের ধমনীতে তাঁহার শোণিত-প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। শত শত মুসলমানের জীবনে তাঁহার আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দুর্জয় দুর্বিপাকে এখনও তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর গম্ভীর বাণী মুসলমানদিগের প্রাণের মধ্যে গভীরভাবে বাজিয়া উঠে; দু:খ-দৈন্যে মুহ্যমান গৃহী এখনও সেই গৃহবাসী চিরদরিদ্র মহাপুরুষের সহিত জীবন-ভার বহন করিয়া পরের মঙ্গলসাধন করা যায়, প্রভুর সহিত জীবনের যোগ স্থাপন করা যায়, তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তিনি মানুষকে প্রদর্শন করিয়াছেন।■

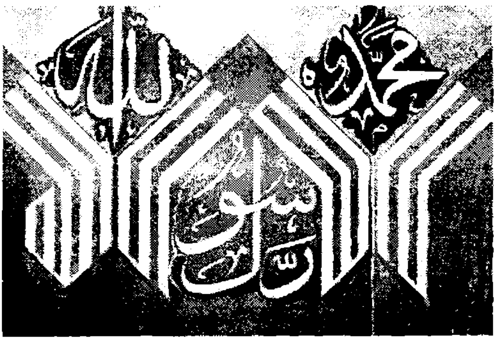

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

৮

বছরে আমাদের অর্জন

দাবী প্রদান সক্ষমতায় ক্রেডিট রেটিং A.

একমাত্র ISO সনদপ্রাপ্ত বীমা কোম্পানী।

পলিসি গ্রাহকদের বোনাস প্রদান।

লাইফ ফান্ড প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা।

মোট বিনিয়োগ ১১২ কোটি টাকা প্রায়।

ছয় লক্ষ পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

৫০০ এর অধিক মৃত্যুদাবী পরিশোধ।

SMS-এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান।

সমহারে প্রিমিয়াম গ্রহণের অভিনব ব্যবস্থা।

আন্তর্জাতিক মান ISO 9001 : 2000 সনদপ্রাপ্ত

প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় : রাজভবন (৭ম তলা), ২৯ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা- ১০০০।

ফোন : ৭১৬০০৭৪, ৯৫৫৪৫৩৮, ফ্যাক্স : ৯৫৬৪৩১০, ই-মেইল : plicl@bdonline.com

www.bjilibrary.com

বিশ্বমানব প্রগতি ও মহানবী [সা]

ড. কাজী দীন মুহম্মদ

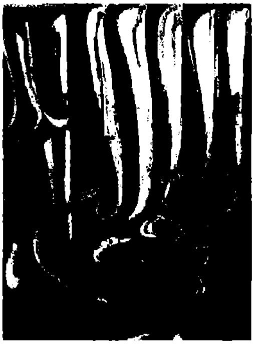

এক.

আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীম— দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি অনুগ্রহ্ করে এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বকে শাসন করার জন্য ও সৃষ্টিধারা প্রবহমান রাখার জন্য ও সৃষ্টি তিনি তাঁর নিজের ইমেজে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছেন। বানিয়েছেন আদম। আদমকে তথা আদম সন্তানকে তিনি এতখানি ভালোবেসে সৃষ্টি ও লালন করেছেন যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর সমান আর কেউ নেই। আল্লাহর পরেই তাঁর স্থান। তিনি আদম ও আদম সন্তানের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য ফেরেশতাদের দিয়ে সিজদা করিয়েছেন। ফেরেশতাদের স্থান তাঁর নিচে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন : লাকাদ খালাকনাল ইনসানা, ফী আহসানি তাকবীম– আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুন্দরতম গঠনে। আর তিনি ভালোবেসে তাঁকে করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত– সৃষ্টির সেরা, শ্রেষ্ঠ। তিনি বিশ্বসৃষ্টির মাঝে একমাত্র তাঁকেই তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, বলেছেন : 'ওয়া ইজ কালা রাব্বুকা লিলমালা ইকাতি ইন্নি জায়েলু ফীল আরদে খলীফা'– আর স্মরণ কর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি

www.bjilibrary.com

পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। ফেরেশতারা বলেছিল : 'কালু আতাজআলু ফীহা মায় ইউফসিদু ফীহা ওয়াইয়াসফিকুদ্দিমাআ ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়ানুকাদ্দিসু লাকা'— আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্মৃতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তখন আল্লাহু সুবহানাহু তাআলা বলেছিলেন : ইন্নি আলামু মা লা তায়লামুন— আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

আল্লাহু সুবহানাহু তাআলা আদমকে জান্নাতে রেখে তার সঙ্গে সকল কিছুর পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁকে সেথায় যথেষ্ট বিচরণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু একটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। যেহেতু আদমকে আব, আতশ, খাক, বাদ-এ চার উপাদান দিয়ে তৈরি করেছেন, তাই তাঁর প্রকৃতিতে অন্যান্য গুণের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য— এসব প্রকৃতিও রয়েছে। আর প্রকৃতির মাধ্যমে তাঁর দুশমন শয়তান নিষিদ্ধ কাজটি করার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করে। শয়তান তাঁর প্রতি শত্রুতা করার কারণ ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন আদমকে সৃষ্টি করে জান্নাতের সবাইকে তাঁর প্রতি সিজদা করতে বলেছিলেন, তখন শয়তান ছাড়া আর সবাই সিজদা করেছিল। শয়তান ছিল জিন সম্প্রদায়ের এবং সে ছিল বড় আবেদ। তাই তার মনে অহংকার এসেছিল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : কীসে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি নত হলে না, আমি যখন তোমাকে আদেশ করলাম।

সে বলল : আমি শ্রেষ্ঠ তাঁর চাইতে। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর তাঁকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা।

আর এক জায়গায় বলেছেন : 'কালা ইয়া ইবলীসু মা লাকা আল্লা তাকুনা মা'আস সাজেদীন'— তিনি বললেন : হে ইবলিস, তোমার কী হলো যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?

সে জবাবে বলেছিল : 'কালা লাম আকুন লি আসজুদা লি বাশারিন খালাকতাহু মিন সালসালিন মিন হামায়িন মাসনুন'— সে বলল : আমি সিজদা করব না সে ব্যক্তিকে, যাকে সৃষ্টি করেছেন আপনি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে।

এখান থেকেই দুশমনির শুরু। সাধারণ মাটির সৃষ্টি যে আদমকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। তাই তার জাত-শত্রু আদম ও তার সন্তানকে সে পথচ্যুত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। আর এ কাজের জন্য সে আল্লাহ্‌র অনুমতি নিয়ে নিল। আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ, তুমি পথভ্রষ্ট করতে পারবে, তবে যে বান্দা আমার সাথে বিশ্বাস করবে এবং প্রকৃত মুমিন ও মুত্তাকী হবে তাকে তুমি কিছুতেই সৎ পথ থেকে টলাতে পারবে না।

শয়তান তো মিথ্যা প্রলোভনে প্ররোচিত করে আদম [আ] ও হাওয়া [আ]-কে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : 'ওয়া কুল নাহবিতু বা'দুকুম লিবা'দিন আদুবুন'— আমি বললাম, নেমে যাও তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে। এ সঙ্গে আল্লাহ ত'আলা আরো বললেন : 'ওয়ালাকুম ফিল আরদি মুসতাকারর" ওয়া মাতাউন

www.bjilibrary.com

ইলা হীন'– আর তোমাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় বসবাস ও জীবিকা কিছু কালের জন্য।

আমাদের এ দুনিয়ায় যেমন জেলখানায় বাস করতে হয়– সেখানে নির্দিষ্ট কালের জন্য তার বসবাস ও জীবিকা থাকে। তেমনি দুনিয়াতে আদমকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর আদেশ অমান্য করার অপরাধে। আর বলে দিলেন, সে সেখায় নির্দিষ্ট কিছু দিন থাকবে এবং আহার ও বাসস্থান পাবে।

কেবল কি সামান্য বাসস্থান ও ভোগ্যসামগ্রী দিয়েই আমাদের পাঠিয়ে দিলেন? না আরো কিছু দিয়ে দিলেন? দুনিয়ায় আমরা কি দেখি? আমরা যখন বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করি, তখন তাদের সামনে দেয়া হয় একটি পাঠক্রম ও পাঠ্য তালিকা। আর সে পাঠক্রম ও পাঠ্য তালিকা অনুসরণ করে শিক্ষক তাকে পড়িয়ে, লিখিয়ে অনুশীলনীর মাধ্যমে গড়ে পিটে মানুষ করেন। তখন ছাত্রটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে উত্তীর্ণ হবার আশা করা যায়। আর যদি কোন সিলেবাস-কারিকুলাম বা কোন শিক্ষক ছাড়াই তাদের ছেড়ে দিই তাহলে কী ফল হবে? তাহলে তো যে ফল আশা করছি, তা কখনো হবার নয়।

ঠিক তেমনি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে আহার, বাসস্থান ও যাবতীয় খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিলেন। বলে দিলেন, Earn the bread by sweat of thine brow. তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থাৎ পরিশ্রম করে খাও এবং বাস কর। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কি কেবল ভোগ -দ দিয়েই নিরস্ত হলেন? তাহলে ন্যায়-অন্যায়, হক-নাহক, ভাল-মন্দ, সত্য-অসত্য এসবের জন্য পরীক্ষা করা হবে কেন?

তিনি সত্য-মিথ্যা পৃথক করার জন্যে যুগে যুগে রাসূল পাঠালেন। তাঁরা এসে তাঁদের কওমকে স্রষ্টা ও পালনকর্তা সম্বন্ধে তাদের অবহিত এবং নেক কাজের সুফল ও বদ কাজের কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন। নবী-রাসূলগণ শিক্ষা দিলেন কি করে দুনিয়ায় জিন্দেগী পরিচালনা করতে হবে, কি করে সবাইকে ভালোবেসে এ দুনিয়াকে শস্যক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করে পক্ক শস্য ঘরে তুলে নেয়ার সুযোগ হবে।

এ সকল শিক্ষক বললেন : হে মানুষ, শোন, তোমাদের এ জীবনই শেষ নয়। এখানে সামান্য মাত্র কয়েকদিন থাকতে হবে। অনন্ত জীবন সামনে পড়ে রয়েছে। তোমাদের এখানে পাঠান হয়েছে পরকালের সম্বল অর্জন করে, নিজেকে পূত পবিত্র করে আয়ু শেষে স্রষ্টার, রবের কাছে চলে যেতে হবে। সেখানে মিলবে অনন্ত কালের আয়ু। ওই যে প্রথম সৃষ্টি করে যেখানে জান্নাতে রাখা হয়েছিল, আলমে আরওয়াহে, সেখানে সে পুরাতন বাড়িতে ফিরে যাওয়ার এবং সেখানে অনন্ত কাল ধরে থাকার অধিকার অর্জন করতে হবে। একেই বলা হয়েছে পরীক্ষা।

আল্লাহ তা'আলা রাহমানুর রাহীম-দয়াময়, পরম করুণার নিদান। তিনি আমাদের কাছে সিলেবাস না দিয়ে, শিক্ষক না পাঠিয়ে কী করে আশা করবেন যে, আমরা পরীক্ষা দেব এবং তাতে উত্তীর্ণ হবো? তিনি বলছেন : আমি এমন কোন কওম পাঠাইনি যাদের কাছে কোন সতর্ককারী পাঠাইনি। তিনি আরো বলেছেন : 'ওয়ামা কানা রাব্বুকা মুহলিকাল কুরা হাত্তা ইয়াবআছা ফী উম্মেহা রাসূলান আলায়হিম আয়াতিনা'– আর নন তোমার

www.bjilibrary.com

প্রতিপালক ধ্বংসকারী জনপদসমূহের যে পর্যন্ত না তিনি পাঠান তার কেন্দ্রে কোন রাসূল আবৃত্তি করতে তাদের কাছে আমাদের আয়াত।

অর্থাৎ তিনি কোন সতর্ককারী, তাঁর আয়াত আবৃত্তিকারী, তাঁর বাণী বাহক কোন নবী বা রাসূল না পাঠিয়ে তিনি কোন কওমকে ধ্বংস করেন না। তিনি আরো বলেছেন : 'ওয়ামা মুহলিকীল কুরা ইল্লা ওয়া আহলুহা যালেলুহা'– আর আমি ধ্বংস করি না জনপদসমূহ, কিন্তু তখনই যখন তার অধিবাসীরা হয়ে পড়ে যালিম-সীমালজ্ঘনকারী অর্থাৎ কোন জনপদবাসীর অন্যায়-যুলম যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, কেবল তখনি আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেন।

দুই.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি কোন পথ প্রদর্শক শিক্ষক অর্থাৎ নবী-রাসূল না পাঠিয়ে বান্দার পরীক্ষা নিতেন তবে বান্দার অভিযোগ করার অজুহাত থাকত। বান্দা বলতে পারত, ইয়া আল্লাহ, আপনি তো মহাপরীক্ষক, আপনি তো হিসাব গ্রহণ করার মালিক, আপনি তো আমাদের পাঠ্যসূচি না দিয়েই পরীক্ষা নিচ্ছেন। কিন্তু বান্দার পক্ষে যাতে এ ধরনের অভিযোগ না উঠতে পারে সে উদ্দেশেই তিনি পূর্বাহ্নেই পাঠ ও শিক্ষক পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছেন : 'আলায়কাল বালাগ ও 'আলায়নাল হিসাব'– হে নবী, আপনার কর্তব্য কেবল আমার তরফ থেকে লোকদের কাছে সতর্কবাণী পৌছিয়ে দেয়া; হিসাব নেয়ার দায়িত্ব তো আমার ওপর।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমি রাসূল পাঠিয়েছি সকল কওমের কাছে এবং কোন কোন কওমের কাছে কিতাবও পাঠিয়েছি। এভাবে হযরত আদম [আ] থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল, আল কুরআন– এসব কিতাব পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির কাছে তওহীদের জন্য তাগাদা দিয়েছেন।

বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছে সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুশীলনীতে। মানুষ ধীরে ধীরে শিক্ষা ও মননশীলতায় এগিয়ে চলেছে। অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে উন্নতির এক বিশেষ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। জাগতিক ও পারলৌকিক ধ্যান-ধারণা এক চরমে পৌছেছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, জীবন ও জগৎ এক রহস্যময় ক্রান্তিলগ্ন মাত্র। এখানে পরিশ্রম করে পুঁজি অর্জন করতে হবে। আদদুনিয়া মাযরাআতুল আখিরা দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং–

"যে চাষা আলস্য ভরে
বীজ না বপন করে
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?"

মানুষ যেহেতু মানুষ, তাই সে অপরাপর জীব থেকে আলাদা। অপরাপর জীবের জীবন কেবল আহার, নিদ্রা ও প্রজনন এই তিনে পর্যবসিত। মানুষ তার জৈব প্রবৃত্তির উর্ধ্বেও ভাবে। কেবল ডাল-ভাতে বা আহার-নিদ্রায় সে খুশী থাকতে পারে না। সে ভাবে, চিন্তা করে; তাই তার জৈবিক চাহিদার পরই ঐশ্বরিক ভাবনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। তাই

www.bjilibrary.com

তাকে সকল কিছুর উর্ধ্বে জীবন কি ও কেন, ভাবতে হয়। আর সে ভাবনা থেকেই সে তার দেহ মন মস্তিষ্ক অর্থাৎ জৈব প্রয়োজনের পরেই তার মানসিক ও আত্মিক ভাবনার উদয় ও অনুশীলনীর প্রয়োজন হয়।

বিশ্বের মহামানব, নবী-রাসূল সকলেই মানুষের দৈহিক ও জাগতিক বিচরণ ও সমৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে আত্মিক সাধনায় উৎসাহিত করেন। জীব জগতে মানুষেই কেবল আত্মা সম্বন্ধে ভাবে। আর সেজন্যই তার ইহ জাগতিক ধ্যান-ধারণা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মা ও মানসিক বৃত্তির সহায়তায়। যাকে আত্মা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বরং আত্মাই নিয়ন্ত্রিত হয়, তার পথচ্যুতি ঘটে। সেটি মানবীয় পথ নয়।

এই যে ভাবনার জগৎ, এতেই মানব জীবন শান্তি খুঁজে বেড়ায়। তাই তার দেহ ও আত্মার সাজুয্য সাধনের জন্য, দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য চাই শিক্ষা। আর সে শিক্ষাই দিয়ে থাকেন নবী ও রাসূলগণ। তাঁরা আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত, মানব হিতে নিয়োজিত ও বিশ্ব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ।

আর এ নবী-রাসূলদের মধ্যে শেষ ও শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মুহাম্মাদ [সা]। আর তাঁর কাছে প্রেরিত ওহী বা আল্লাহর বাণী আল কুরআন সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ জীবন বিধান। নবী মুহাম্মাদ [সা] নিজের জীবনে আল কুরাআনের প্রতিটি বাণী অনুশীলন করে মানব জীবনের প্রতিটি কাজ ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ভরশীলতা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনই আমাদের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁর চরিত্রে রয়েছে সর্বগুণের সমন্বয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেন : 'লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা'– অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

তিন.

পৃথিবীতে একদিন ছিল যখন মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাস করতে হত। আর বেঁচে থাকার জন্য Servival of the fittest- যোগ্যতমেরই টিকে থাকার অধিকারের আদর্শই প্রচলিত ছিল। বাহুবলই ছিল বাঁচার একমাত্র উপায়। যুদ্ধ করে বনের পশুর বিরুদ্ধে জয় লাভ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষকে জয় করে তাকে বশ করতে হতো।

ক্রমে ধারণা বদলালো। অর্থবলই মানুষের শ্রেষ্ঠ বল বলে স্বীকৃত হলো। কারণ অর্থ সম্পদের মাধ্যমে বাহুবল মানে পশুশক্তি আয়ত্ত করা হলো। যার রাজ্য যত বড়, যার সম্পদ যত বেশি, তার অর্থবলও তত বেশি। সুতরাং বাহুবল অর্থাৎ সৈন্য-সামন্তও অধিক। তাই অর্থবল বাহুবলের স্থান দখল করল।

ধীরে ধীরে মানুষের ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হলো। মানুষ দেখল যে, বলে যা করা যায় না বুদ্ধিতে তা সহজেই করা যায়। তখন বুদ্ধি বা জ্ঞানই বাহুবল ও অর্থবলের স্থান দখল করল। মানুষ জ্ঞানই শক্তি আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করল। বনের মধ্যে যুদ্ধ করে বাস করতে করতে যেমন নানাভাবে স্বীকৃত হলো যে, সিংহই সব চাইতে শক্তিশালী, তাই তাকে পশুর রাজা মনে করা হলো, তেমনি আগের দিনের মানুষ

www.bjilibrary.com

বাহুবলে ইচ্ছার চরিতার্থতার সুযোগ খুঁজেছে, বাহু ও অর্থের বলের সামনে বিরুদ্ধশক্তি টিকে থাকতে পারেনি। ফেরাউন থেকে আমাদের কালে এসে নেপোলিয়ান পর্যন্ত এই তো দেখি। কিন্তু জ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হওয়ার পর জ্ঞানবান সকল মনীষীই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করল। প্ল্যাটো, সক্রেটিস, এরিস্টটল– এঁদের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান ধারণায় তখন মানব বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হল।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ নানা অলৌকিক গুণে বিভূষিত হয়ে তাঁদের কওমকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছেন। কেউ যাদু প্রতিহত করার ক্ষমতার, কেউ বা দুরারোগ্য রোগ উপশমের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের আমলের লোকদের বিশ্বাস জন্মানোর জন্য এগুলোর প্রয়োজন ছিল।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] একটি বিশেষ গুণ সাথে নিয়ে এলেন। প্রাচীন কালের মানব মর্যাদা রক্ষা করা দৈহিক ও আর্থিক শক্তি এবং গুণের অপরিসীম গুণাবলী ছাড়াও যে মানুষ আত্মবলে বলীয়ান হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে গোপন রহস্যটি তিনি বিশ্বের সমকালীন ও ভবিষ্যৎ মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, বাহুবল, ধনবল, এমন কি জ্ঞানবলই সব কিছু নয়। সবার ওপরে যে বলটি মনুষ্য সমাজে ক্রিয়াশীল সেটি হল চরিত্রবল। চরিত্রবলের কোন বিকল্প নেই। চরিত্র শক্তির কোন তুলনা নেই।

সকল ধর্মের সার বিদ্যা মহাধন, এই ধন 'কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে' যেমন একদা সত্য ছিল, তেমন সকল বলের সার চরিত্র মহাবল, এই বল 'কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে' প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন তিনি। তিনি আপন চরিত্র দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে, বিশ্বের কোন শক্তিই প্রকৃত শক্তি নয়, যদি না চরিত্র শক্তির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘটে।

তিনি তাঁর নিজের মধ্যে বাহুবল, ধনবল সর্বোপরি জ্ঞানবলের আশ্চর্য সংযোজন ঘটিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, বাহুবল মানে পেশীশক্তি, ধনবল মানে অর্থশক্তি, জ্ঞানবল মানে বুদ্ধিশক্তি। এসবই কল্যাণমুখী কার্যকারিতায় সংযুক্ত হয় একমাত্র চরিত্র-বলের মাধ্যমে।

শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তো তিনি নবী বলে পরিচিত হননি। তখনো তিনি সমাজের একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল সেই অসাধারণ বিশেষ ক্ষমতা ও বিশেষ জ্ঞান যার বলে তিনি নীতিবিগর্হিত কোন কাজ করেননি। করার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এসবের কাছে নতি স্বীকার করেননি, বরং অসাধারণভাবে সংযত জীবন যাপন করেছেন। আশৈশব লালিত এ নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ চরিত্র শক্তিই তাঁকে একদা নবুওয়ত প্রাপ্তির যোগ্য করে তুলেছিল। তিনি যদি নবী নাও হতেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁকে বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য মনোনীত নাও করতেন, তবু তাঁর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য তাঁকে মহামানবের পর্যায়ে উন্নীত করত, তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। কেননা তিনি তো জানতেন না যে, তাকে নবী বা রাসূল বলে মনোনীত করা হয়েছিল।

পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল কালের সকল মানুষের জন্য যে তিনি মুক্তির

www.bjilibrary.com

বাণী নিয়ে আসবেন এ খবর তিনি নিজে না জানলেও অলক্ষ্যে সে বিশেষ উদ্দেশেই ঐশী প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ চলছিল। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি যখন কাফির ও মুশরিকদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন এবং নিজের মিশন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়তেন তখন আল্লাহ রাব্বুল ইযযত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন : 'ওয়ামা কুনতা তারজু আইউলকা ইরায়কাল কিতাবা ইল্লা রাহমতাম মিররাব্বিকা, ফালা তাকুনান্না যাহীরান লিল কাফিরীন'– আপনি তো আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো আপনার প্রতিপালকের রহমতস্বরূপ নাযিল হয়েছে। সুতরাং আপনি কাফিরদের সহায়ক-পৃষ্ঠপোষক হবেন না। কাজেই তাঁর চরিত্রের অমোঘ শক্তিই তাঁর সব কিছুর উর্ধ্বে কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি তা তাঁর প্রতিটি কাজে ও কথায় সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন।

চার.

আজকের এ অশান্ত দুনিয়ায় যতখানি বিপর্যয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাঁর সময়ে তদানীন্তন বিশ্বের অবস্থা তাঁর চাইতে তেমন কিছু কম ছিল না। বৈজ্ঞানিক উন্নতির তুঙ্গে আরোহণ করে, সভ্যতার চরম বিকাশের সময় অর্থাৎ আমাদের এ কালে কি দেখি?

অপ্রিয় হলেও একথা সূর্যালোকের মতো সত্য যে, আমরা আজ নানা রোগে ভুগছি। আমাদের সমাজে আজ নৈতিকতার ও মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব। চারদিকে হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব অক্টোপাসের মতো আমাদের ঘিরে ধরেছে মূল্যবোধের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য সর্বত্র, সবার মধ্যে এক অসাধারণ আর্তি।

মানুষের মহৎ আকাঙ্ক্ষাগুলি জীবন থেকে নির্বাসিত। ন্যায়বিচারের আশা, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের কামনা আজ প্রতারণার শিকার। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন হতাশা ও নৈরাশ্যে জর্জরিত। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত। মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, দ্বন্দ্ব আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবনকে কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

সৎ অসৎ চিন্তাবিবর্জিত আত্মসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও মনুষ্যত্বহীনতা আমাদের জীবনকে করে তুলেছে জীর্ণ। জীবাণু দূষিত গ্রাংগ্রীন সমাজ দেহের সর্বাঙ্গে বিষ ঢেলে দিচ্ছ। চরিত্রহীনতা, শঠতা, কপটতা, চতুরতা, ছলনা, প্রতারণা, ভাওতা আর বল প্রয়োগেই আমাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোজা কথায়, বিশ্বের সকল মানুষ আজ মধ্যযুগীয় বর্বরতার আদিম প্রবৃত্তির অন্ধকার গুহায় অবস্থিত। প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া-মায়া, পরার্থপরতা, কল্যাণ ও সুন্দর আজ নির্বাসিত। বাহুবল ও মাসলম্যানদের রাজত্বে জোর যার মুলুক তার এ মাৎসন্যায় নীতির আয়ত্তে মনুষ্যত্ববোধ বন্দী।

এ-ই কি মনুষ্য জীবন? মানুষ না সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ– আশরাফুল মাখলুকাত? তাহলে তার এ দুর্দশা কেন? কেন অশান্ত এ দুনিয়া? এ অবক্ষয়ের মূল কোথায়? প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞানানুশীলন, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধের উৎকর্ষ পরিত্যক্ত কেন, কেন মানবিক, আত্মিক

www.bjilibrary.com

ও মানসিক প্রবণতা দুর্দশাগ্রস্ত? আত্মা-পরমাত্মার কথা কেন আজ নিরাপদ দূরত্বে? জৈবিক ও দৈহিক প্রবৃত্তি এবং পার্থিব ও ইহজাগতিক নেশায় আজ সবাই উন্মাদ কেন? এর কি কোন প্রতিকার নেই?

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব তার জ্ঞানানুশীলনে কি এর উৎসের সন্ধান করে, মূল কারণ চিহ্নিত করে এ সর্বনাশা অবক্ষয়ের শিকড় সুদ্ধ উৎপাটনের উপায় নির্ধারণ করতে পারে না? এ কর্তব্য কি তারই নয়? বিশ্বের যাবতীয় উন্নতি, বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান, সভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতি যদি তার সাধনায় সমৃদ্ধ হতে পারে, তবে এ কাজটিও কি তারই করণীয় নয়? এমন কোন আদর্শ পুরুষ কি নেই, নেই কি কোন মহামানব, যিনি এ জগদ্দল পাথর উন্মোচিত করে উদ্ধার করতে পারে রোরুদ্যমান মানবতাকে। দিতে পারে সত্য পথের সন্ধান? পারে না কি কোন অমোঘ শক্তি জিঞ্জিরাবদ্ধ মানবতার মুক্তি এনে দিতে?

সীমাহীন অন্ধকারে আলো দিয়ে, দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করে প্রকৃত মানবতার শৌর্য জাগ্রত করে, আমাদের চেতনায় ঘা মেরে মৃতকে পরমাত্মার জাদু পরশে পারেন নাকি জাগ্রত করতে কোন মহাপ্রাণ আদর্শ মহামানব? নিপীড়িত মানবতার কাতর গোঙানীতে কি ভগবান কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে না? কবে, কোথায় সে অমিততেজ বীর যিনি সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে নতুন পৃথিবীর জন্ম দেবে?

শাস্ত্র বলে যখনই বিশ্ব এমনি ধারার অচলাবস্থায় পতিত হয়েছে, যখনই নির্যাতিত মানবতার কান্না বিশ্ব পরিমণ্ডল আকাশ বাতাস ভরে তুলেছে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে রাহবার পাঠিয়েছেন। তারা স্রষ্টার তরফ থেকে মুক্তির বাণীসহ প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর মনোনীত সেই আদর্শ পুরুষই রাসূল বা নবী। তাঁরা তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি আদর্শ সন্তানদের আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাদর্শমণ্ডিত যে বাদ বা ইজম সেটিই অমোঘ শান্তির বাণীসহ— ইসলাম।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার বুকে মিথ্যা ও সত্যের পাপ ও পুণ্যের ঘৃণা ও প্রেমের দুর্যোগ নেমে এসেছে অসুর শক্তির পাশব প্রয়োগে। যুগ যন্ত্রণায় মানবতা বারবার কাতরিয়ে উঠেছে, ককিয়ে উঠেছে। হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে জীবনের সহজ-সরল সাবলীলতা। আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হয়ে গেছে ভোঁতা, অকর্মণ্য। মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অমানবিকতার দাম্ভিক পাশবিকতা। মানব হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো অপ্রসৃত হয়েছে তাদের দাপটে দুনিয়া থেকে। কায়েম হয়েছে পশু প্রবৃত্তি। মানবতার করুণ আর্ত গোঙানী তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।

মানবতা যখন এভাবে এক পাশে অবজ্ঞায় অবহেলিত পরিত্যক্ত তখন, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে এসেছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব যিনি বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা দূর করে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তোমার আমার তার প্রত্যেকের জন্য শান্তি। তাঁর কালের ও অনাগত ভবিষ্যতের কওমের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেলেন সুদৃঢ় সুষ্ঠু

www.bjilibrary.com

জীবন ব্যবস্থার। তিনি নিজের জীবনে দেশ রাষ্ট্র জাতি সমাজ ধর্ম অর্থ সকল ক্ষেত্রে নীতির আদর্শ প্রয়োগ করে বড় ছোট, ধনী গরীব, উঁচু নিচু, সাদা কাল নর নারী সকলের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অমোঘ শিক্ষা। তাঁর অতুলনীয় চরিত্রে ঘটেছে যার সম্যক বিকাশ, তারই অনুশীলনী করে সমাজকে কলুষমুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন : 'লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুল হাসানা'– আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। এ আদর্শের প্যাটার্নেই বাঁচাতে চেয়েছেন তিনি সমস্যাজর্জরিত মানব সমাজকে। সমসাময়িক ও অনাগত ভবিষ্যতকে মারণাস্ত্রে নয়, ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর নির্দেশিত সে অমোঘ অস্ত্রটি আত্মপ্রত্যয়ের সাথে প্রয়োগের মাধ্যমেই কি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না বিশ্বময় প্রকৃত শান্তি?

নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর সমাজ সংস্কারমূলক কর্মপ্রচেষ্টা শৈশব থেকেই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তিনি কেবল সে যুগের নয়, ভবিষ্যতেরও সব চাইতে প্রগতিশীল সমাজ সেবক ও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তৎকালীন ঘূণে ধরা সমাজকে তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির বহু আগে থেকেই ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। যতদিন মানুষ বাঁচবে, যতদিন সমাজ থাকবে ততদিন মহানবী মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রগতিশীল সমাজ চেতনা ও সংস্কার আদর্শ বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শকরূপে বিরাজমান থাকবে।■

www.bjilibrary.com

ডায়রিয়া ?
পানি স্বল্পতা ??
সঠিকমাত্রার খাওয়ার স্যালাইন খুঁজছেন ???
তাহলে অবশ্যই - ইউনিস্যালাইন®

UniSaline®

(Glucose based reduced osmolarity oral saline)

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা এবং
যেকোন ধরনের পানি স্বল্পতা পূরণের
জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং
ইউনিসেফ (UNICEF) কর্তৃক
যৌথভাবে নির্দেশিত নতুন ফর্মূলায়
সঠিক মাত্রার খাওয়ার স্যালাইন

জীবন চলুক আপন ছন্দে......

IBN SINA
দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি লিঃ
সফিপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

ISO 9001:2000 CERTIFIED

www.bjilibrary.com

মানবাধিকার ঘোষণা ও মদিনা সনদের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ

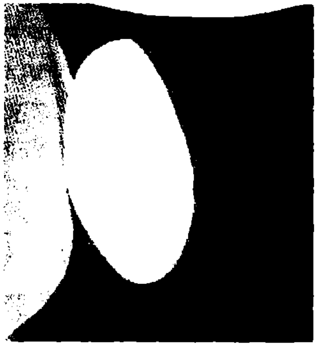

অধিকার ব্যক্তিজীবনকে পরিপূর্ণ করে। ব্যক্তিকে মহীয়ান করে তোলে। তাকে মর্যাদাবান করে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির জন্য আরো প্রয়োজন সামাজিক ক্ষেত্রে সহনশীলতা এবং সমাজের ক্ষুদ্রতম একককে ছাড়িয়ে বৃহত্তর পরিসরে সৌভ্রাতৃত্বের আশীর্বাদ। প্রয়োজন ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে বিশ্বময় ন্যায়নীতিভিত্তিক পরিশীলিত এক মানবিক আবহ। সর্বজনীন মানবাধিকারের প্রবক্তারা এ বিষয়ে কোনো সময়ে তেমন মনোযোগ দেননি। মদিনা সনদে কিন্তু এ বিষয়টিকেও মুখ্য জ্ঞান করা হয় এবং বিশ্বময় এক উম্মাহ অথবা মানব জাতি সৃষ্টির অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে। মদিনা সনদে যে উম্মাহর কথা বলা হয়েছে তা শুধু মুসলমান সমন্বয়ে সংগঠিত নয়, তা সর্বধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। সনদের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'বনু আউফের ইহুদিরা মুমিনদের সঙ্গে একই উম্মাহ। ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম, তাদের মাওয়ালী বা আশ্রিত এবং তারা নিজেরাও। অবশ্য যে অন্যায় বা অপরাধ করবে সে নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের ক্ষতিই করবে।'

[এই নিবন্ধে মদিনা সনদের বঙ্গানুবাদ গৃহীত হয়েছে আবদুল ওয়াহিদ

www.bjilibrary.com

রচিত 'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মদিনা সনদের গুরুত্ব' প্রবন্ধ থেকে।]

মদিনা সনদের এই অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করলে অনুধাবনে কোনো অসুবিধা হয় না যে, উম্মাহ বা জাতি গঠন সম্পর্কে নবী করিম [সা]-এর ধারণা কত স্বচ্ছ ছিল! অ্যার্নেস্ট রেনানের কথায় বহু সংখ্যক ব্যক্তি যখন তেজোদীপ্ত মন ও হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে এক নৈতিক বিবেকের সৃষ্টি করে তখনই তা হয় একটি জাতি'। ঐ নিবন্ধেই তিনি লিখেছেন, 'জাতির সম্মিলিত থাকার আকাঙ্ক্ষাই হলো একমাত্র বাস্তব মানদণ্ড, যা সব সময়ই মনে রাখতে হবে।' মদিনা রাষ্ট্রের উম্মাহ শুধু মুসলমানদের নয়, নয় কুরাইশদের অথবা মুহাজির বা আনসারদের। এই উম্মাহ সবার। ধর্ম ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে সবার। মুসলমান ও ইহুদিদের। যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে, কিন্তু জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক সংরক্ষণে সবাই কৃতসংকল্প। জাতীয়তার প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী হাজারো তাত্ত্বিক আজ পর্যন্ত যেসব জটিল ক্ষেত্রে কোনো সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হননি, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ক্রমে ক্রমে পথ হারাচ্ছেন, তেমন জটিল ক্ষেত্রে মদিনা সনদের এই অঙ্গীকার যে কত উঁচু মানের তা ভাবলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়! কোন জাতি পৃথিবীতে নেই, যা গড়ে উঠেছে একই ধর্মের অনুসারীদের সহযোগে। এর শুভ সূচনা আমরা দেখি ৬২২ সালের মদিনা সনদে। মদিনা সনদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানে। আধুনিক জাতীয়তার যেমন রয়েছে আকর্ষণীয় এক সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে এর বিভাজনের এক প্রবণতা। কিছু সংখ্যক জনসমষ্টি একত্র হয়ে যেমন জাতি গঠন করে, তেমনি জাতি হিসেবে তারা বিশ্বের মানব সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র অনুভব করে বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ে। মদিনা সনদে কিন্তু যে উম্মাহ বা জাতির শুভ সূচনা করা হয়েছে তা ধর্মের পার্থক্য অতিক্রম করে, সম্প্রদায়ের উঁচু দেয়াল ডিঙিয়ে, ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে, রীতিনীতি, সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সব বাধা-বন্ধনকে জয় করে বিশ্বময় উম্মাহর পথ প্রশস্ত করেছে। মদিনা সনদের এটি হলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নবী করীম এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ইসলামের মৌলভিত্তি একত্ববাদকে সামনে রেখেই। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের কোনো কোনো সমাজে ধর্মকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, ইসলাম তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইসলামে জীবন ঐক্যবদ্ধ। স্বর্গীয় একত্ব থেকে উৎসারিত হয়ে পার্থিব জীবনের সব ক্ষেত্রে এর পরিব্যাপ্তি। পরিব্যাপ্ত ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মে, পরিব্যাপ্ত ব্যক্তি সহযোগে গড়ে-ওঠা সমাজ জীবনের সর্বস্তরে। তাই কোনো সংকীর্ণ সূত্রে জাতিকে আবদ্ধ না করে ইসলামী জীবন দর্শনের মূল সুর যে ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজ, উম্মাহ সংগঠনেও তা কার্যকর হয়েছে মদিনা সনদে।

মদিনা সনদের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে [১১ থেকে ১৭, ১৯, ২০, ২২ ও ২৩] শুধু মুমিনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব অনুচ্ছেদে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে উদার হওয়ার জন্য, পরস্পরের প্রতি সহনশীল হতে, আল্লাহ ও রাসূলের [সা] প্রতি অনুগত হতে, প্রদত্ত অঙ্গীকার পালনের জন্য, জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য

www.bjilibrary.com

করতে, মুসলমানদের অনুসরণকারী ইহুদিদের সহায়তা করার লক্ষ্যে, অন্যের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতা পরিত্যাগ করতে, অন্যের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। অন্যদিকে এই সনদের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ [২৫ থেকে ৩৬ ও ৫১ অনুচ্ছেদে] মদিনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী এবং সংশ্লিষ্ট ইহুদিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব অনুচ্ছেদে তাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ করতে, পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করতে, উম্মাহর সদস্য হিসেবে দায়িত্বশীল হয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩৯-৪৫, ৪৭-৫০ ও ৫২ অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য সবার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। সনদের ৩৭ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিশ্চিত করতে তাঁকে এর অভিভাবকত্ব দান করা হয়েছে।

মদিনা সনদের শ্রেষ্ঠত্ব

সর্বজনীন মানবাধিকারের আলোকে মদিনা সনদকে বিশ্লেষণ করলে এই সনদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় বিভিন্ন দিক থেকে।

এক. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার হলো সম-সার্বভৌমত্ব ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের রাষ্ট্রমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক সংস্থার জাতি রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশিত নাগরিকদের অধিকারমালা। সুউচ্চ আন্তর্জাতিক আসন থেকে নিম্নাভিমুখে নির্দেশ সূত্রের মতো জাতি রাষ্ট্রগুলোর সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে এসব অধিকার। মদিনা সনদে স্বীকৃত ও অননুমোদিত হলেও নিম্ন থেকে উর্ধ্বমুখী তথা আকাশমুখী হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

দুই. সর্বজনীন মানবাধিকারে শুধু ব্যক্তিকে মুখ্য জ্ঞান করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার আলোকে অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিজীবন সমাজেই পরিপূর্ণ হয়, সমাজে লালিত হয়েই যা সার্থকতা অর্জন করে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তার কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়নি। মদিনা সনদে কিন্তু অধিকার ও কর্তব্যকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই উভয় দিক থেকেই দেখা হয়েছে।

তিন. যে সমাজ ব্যবস্থায় অধিকার অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, যে গণতান্ত্রিক পরিবেশে অধিকার বাস্তবায়িত হতে পারে এবং যে দায়িত্বশীলতার অঙ্গীকারে তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে গ্রহণযোগ্য এক সামাজিক প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সেসব বিষয়ের কোনো আলোচনা নেই। মদিনা সনদ কিন্তু সমাজব্যাপী সামগ্রিক পরিবেশ রচনা করেই অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। মদিনা সনদে কোনো রাজা-বাদশাহ অথবা সম্রাটের পদ তৈরি হয়নি। সমাজে বংশকেন্দ্রিক অথবা মর্যাদাভিত্তিক বা সম্পদের নিরিখে কোনো নতুন কৌলিন্যবোধের সৃষ্টি হলো না। মদিনা সনদের ফলে সৃষ্টি হয় মদিনায় এক গণতান্ত্রিক আবহ। সৃষ্টি হয় কল্যাণমুখী এক পরিবেশ।

নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ব্রিটেনের ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টার সঙ্গে কেউ কেউ মদিনা সনদের তুলনা করে থাকেন। ম্যাগনা কার্টাও ছিল রাজতন্ত্রের পীড়নমূলক শাসনামলে অধিকারের এক মহাসনদ। ৬৩ অনুচ্ছেদ সংবলিত ম্যাগনা

www.bjilibrary.com

কার্টায় রাজার সঙ্গে চুক্তি করে রাজকীয় ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারিত হয়। অধিকারের ইতিহাসে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এই পথ ধরেই আসে ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস [Petition of Rights], ১৬৮৮ সালের 'বিল অব রাইটস' [Bill of Rights], ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস [Habeas Corpus] আইন এবং উনিশ ও বিশ শতকের সংস্কারমূলক আইনগুলো। সবশেষে আসে মহিলাদের ভোটাধিকার দানকারী ১৯২৮ সালের সংস্কার আইন। এসবের মূলে রয়েছে ম্যাগনা কার্টার বিরাট ভূমিকা।

তারপরও বলবো মদিনা সনদের তুলনায় ম্যাগনা কার্টা ছিল হাল্কা এক দলিল। ম্যাগনা কার্টার দলিল স্বাক্ষরিত হয় রাজা ও কিছু সংখ্যক সামন্ত প্রভুর মধ্যে, সামন্তবাদী এক সমাজ ব্যবস্থায়। তখন সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এক সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং ওই ভূখণ্ডের ওপর বসবাসরত সব মানুষ ও জীবজন্তু। সেই ভূমির মালিক ছিলেন ওই ভূখণ্ডের সব ব্যক্তির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের জীবন-মৃত্যুর নিয়ামকস্বরূপ। সামন্ত প্রভুর কথাই ছিল আইন। তার মর্জির ওপর নির্ভর করত জনসাধারণের সুখ-সুবিধা, দেনা-পাওনা ইত্যাদি। ম্যাগনা কার্টা স্বাক্ষরিত হয় রাজার সঙ্গে ওই সব ভূমি মালিকের, যারা নিজ নিজ এলাকায় ছিলেন ছোটখাটো রাজা। তাই ম্যাগনা কার্টায় রাজা যেসব সুযোগ-সুবিধা সামন্তদের জন্য অনুমোদন করেন তা প্রধানত সামন্তদের। জনসাধারণের কোনো অধিকারের স্বীকৃতি ম্যাগনা কার্টায় নেই। মদিনা সনদ কিন্তু স্বাক্ষরিত হয় কোনো রাজা বা বাদশাহ ও কিছু সংখ্যক সামন্তদের মধ্যে নয়। তা স্বাক্ষরিত হয় জননেতাদের দ্বারা। তাই মদিনা সনদে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হয়। এই চুক্তিতে নবী করীম [সা] স্বাক্ষর করেন কোনো বাদশাহ হিসেবে নয়, বরং সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন জননেতারূপে, সততার উজ্জ্বল রূপ জনকল্যাণকামী এক পরিপূর্ণ মানুষরূপে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকত তাহলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব গণতন্ত্রের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে যেত সপ্তম ও অষ্টম শতকেই। পাশ্চাত্যে আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণইচ্ছা, গণঅধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গর্ব করে এবং তার ভিত্তিতে উন্নত এক সভ্যতার সৃষ্টি করেছে, মুসলিম বিশ্বে মদিনা সনদের বাস্তবায়ন ঘটলে মানব জাতি উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিশেষজ্ঞ ও পর্যালোচকদের চোখে বিশ্বের প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের গৌরবজনক বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে ধরা দেয়নি। আমাদের পণ্ডিতদের মনোযোগ এসব বিষয়ে তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। আমরা তাই নিজেদের সোনার খনিকে উপেক্ষা করে অন্যদের কয়লা খনির মূল্য নির্ধারণেই বেশি ব্যস্ত থেকেছি এবং হীনমন্যতার শিকার হয়েছি। এই হীনমন্যতা জয় করতেই হবে।■

www.bjilibrary.com

মানব জাতির জন্য একটি পথ

মূল : সাইয়েদ কুতুব

তরজমা : এ.কে.এম. নাজির আহমদ

আজ ইসলাম ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি হয় বিস্মৃতি, নয় তো ভুল উপলব্ধির শিকার। এই বিস্মৃতি অথবা ভুল উপলব্ধি থেকে এর মৌলিক প্রকৃতি, ঐতিহাসিক সত্যতা, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সৃষ্টি হয় অনেক বিভ্রান্তি।

অবতীর্ণ জীবন বিধান হওয়ার কারণে কেউ কেউ আশা করেন, ইসলাম মানব জীবনে অসাধারণ ও অলৌকিক কোন পন্থায় বাস্তবায়িত হবে। তাঁদের এই আশা মানব-প্রকৃতি, মানুষের শক্তি-সামর্থ্য ও বস্তুগত বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন। অবশ্য তারা দেখতে পাচ্ছেন, এই নিয়মে ইসলাম বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে না। বস্তুগত বাস্তবতা ও মানব-প্রকৃতি এর মুকাবিলা করছে। কোন কোন সময় এই দু'টো জিনিস দীন দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়। আবার কোন কোন সময় এগুলো ঈমানের বিপরীত দিকে চলে মানুষের প্রবৃত্তি ও দুর্বলতাকে চাঙা করে তোলে। ঈমানের ডাকে সাড়া দিতে মানুষকে বাধা দেয়। ঈমানের পথে এগুতে মানুষকে করে নিরুৎসাহিত।

এই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ অনভিপ্রেত হতাশায় নিপতিত হয় এবং দীনভিত্তিক জীবনযাত্রার সম্ভাব্যতার প্রতি আস্থা হারিয়ে

www.bjilibrary.com

ফেলে, এমন কি দীন সম্পর্কেও তাদের মনে একটা সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা গেল, একটা মৌলিক ভুল থেকেই ভুলের একটা প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আর সেই ভুলটি হলো ইসলামকে এবং তার প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সঠিকভাবে না বোঝা অথবা এই সোজা ও মৌলিক সত্যটিকে উপেক্ষা করা।

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধান। মানব জীবনে এর বাস্তবায়ন মানুষের চেষ্টা-সাধনা, তার শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাণ এবং বিশেষ পরিবেশে বস্তুগত বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় উপাদান পেলে মানুষ তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের জন্য কাজ শুরু করে এবং তার শক্তি-সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত কাজ করতে থাকে।

ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য হলো : সে এক মুহূর্তের জন্যও কোন কালে কোন স্থানে মানব-প্রকৃতির, এর শক্তি-সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাকে ভুলে যায় না। সে ভুলে যায় না মানব-অস্তিত্বের বস্তুগত বাস্তবতাকে। ইসলাম মানুষকে দিয়ে এক উচ্চ ও মহান লক্ষ্য অর্জিত করাতে চায়, যা মানব রচিত কোন ব্যবস্থা অনুসরণ করে অর্জন করা সম্ভব নয়। আর তা অর্জিত হয়ও। অর্জিত হয় অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে।

বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ইসলামকে ভুল বোঝা, এর মেজাজ না বোঝা, অলৌকিক ঘটনার প্রত্যাশা, অসাধারণ প্রক্রিয়ায় মানব-প্রকৃতি পরিবর্তনের বাসনা, শক্তি-সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার প্রতি উদাসীনতা এবং বস্তুগত বাস্তবতার প্রতি সচেতনতার অভাব থেকে। ইসলাম কি আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ হয়নি? আল্লাহ কি সর্বশক্তিমান নন? তাহলে কেন ইসলাম মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের গতিতে ঘূর্ণায়মান? কেন এর কার্যকারিতা মানবিক দুর্বলতা দ্বারা প্রভাবিত হবে? কেন ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীরা সর্বদা বিজয়ী থাকবে না? কেন তার পবিত্রতা প্রবৃত্তি ও বস্তুগত বাস্তবতা দ্বারা পরাভূত হবে? কেন অন্যায়কারীরা ইসলামের অনুসারীদের ওপর বিজয়ী হবে? এসব প্রশ্ন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ইসলামের প্রকৃত রূপ ও প্রয়োগ-পদ্ধতি ভালোভাবে না বোঝার কারণেই সৃষ্টি হয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানব-প্রকৃতিকে ইসলাম দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তিত করে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তিনি মানুষকে তার বর্তমান প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করাই ভালো মনে করেছেন। তিনি স্বর্গীয় হিদায়াতকে মানুষের সাধনার ফল হিসেবে রেখেছেন। "যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে, তাদেরকে আমি পথ দেখাই।" তিনি মানব-প্রকৃতিকে সদা-ক্রিয়াশীলরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে কখনো নিষ্ক্রিয় হয় না। "মানব প্রকৃতির ও সেই সত্তার শপথ যিনি একে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরে পাপ ও তাকওয়ার জ্ঞান তার প্রতি ইলহাম করেছেন। নি:সন্দেহে কল্যাণ পেলো সে যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল এবং ব্যর্থ হলো সে, যে একে পথভ্রষ্ট করল।"

আল্লাহ চান মানব জাতির জন্য প্রদত্ত জীবন বিধান মানুষের চেষ্টা-সাধনার বলে মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের পরিসীমায় বাস্তবায়িত হোক। "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তা পরিবর্তিত করে।" "যদি আল্লাহ একদল লোক দিয়ে আরেক দলকে না দমাতেন, পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো।" আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের সেই স্তর পর্যন্ত পৌছান যে স্তরে

www.bjilibrary.com

পৌঁছার উপযুক্ত চেষ্টা-সাধনা সে করে এবং যে পরিমাণ শক্তি-সামর্থ্য সে প্রয়োগ করে। নিজের জীবন ও সমাজ জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে বাধা-বিপত্তির মুকাবিলায় যে পরিমাণ ধৈর্য সে অবলম্বন করে তার সাফল্য অর্জনের পরিমাণ সেরূপই হয়। "মানুষ কি মনে করে যে, তারা বলবে– আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল যাতে ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী আল্লাহ তা জানতে পারেন।"

সৃষ্টি জগতে এমন কেউ নেই যে জিজ্ঞেস করতে পারে : কেন আল্লাহ এমন করতে চাইলেন? তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কারো এই অধিকার নেই যে, সৃষ্টির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা কিভাবে সব সৃষ্টির প্রকৃতিতে বর্তমান– সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। 'কেন'? এই প্রশ্নটি উন্নত মানের কোন মুমিন বা বড় রকমের কোন নাস্তিক জিজ্ঞেসও করে না। মুমিন তো আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত। তাঁর প্রতি সে বিনীত। মানুষের চিন্তাশক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সে অবহিত। এই সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তি গোটা বিশ্বজাহানে ক্রিয়াশীল হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এগুলো মুমিন ভালোভাবেই জানে। অপরদিকে, নাস্তিক তো আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। বিশ্বাসী হলে তো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই শ্রেষ্ঠত্বের তাৎপর্য তার কাছে দিবালোকের মতো মনে হতো। "তিনি যা করেন সেই ব্যাপারে কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি যা করেন সেই সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।" 'কেন'? এই প্রশ্নটা তারাই করে যারা নিষ্ঠাবান মুমিনও নয়, আবার কট্টর নাস্তিকও নয়। কাজেই এই নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামালেও চলে। বিষয়টিকে খুব সিরিয়াসভাবে গ্রহণ না করলেও চলে। যারা আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী নয় তাদের মনে জাগে নানা প্রশ্ন। এমন লোকদের প্রশ্নের মুকাবিলা করতে হলে আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর ধারণা পরিষ্কারভাবে তাদের সামনে বিবৃত করতে হবে। ফলে স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে তারা সত্যিকারের মুমিন হবে। তা না হলে নাস্তিকতা অবলম্বন করে ভিন্ন পক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। এই প্রশ্নের সমাধান এভাবেই হতে পারে। মত-পার্থক্যের ইতি হতে পারে। এই মতবিরোধ যদি বিবাদে পরিণত হয় তাহলে স্মরণ করতে হবে যে, কোন মুসলমানের জন্য বিবাদে লিপ্ত থাকার অনুমতি নেই।

কোন সৃষ্টির এই প্রশ্ন করার অবকাশ নেই, কেন আল্লাহ মানুষকে তার বর্তমান প্রকৃতিসহ সৃষ্টি করলেন, কেন এই প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতাকে স্থায়িত্ব দিলেন এবং অবতীর্ণ জীবন বিধান অবোধগম্য অলৌকিক কোন পন্থার পরিবর্তে মানুষের চেষ্টা-সাধনার মধ্যে বাস্তবায়ন কেন পছন্দ করলেন। এই বিষয়টি প্রত্যেকেরই বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেকের উচিত ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারা হৃদয়ঙ্গম করা এবং এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। সাথে সাথে ঐতিহাসিক প্রবাহকে প্রভাবিত করার উপায় উদ্ভাবন করা। আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান শক্তি নিয়ে তাকে বাঁচতে হবে। সেগুলোর প্রতি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গিও পোষণ করতে হবে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] কর্তৃক আনীত জীবন বিধান এই পৃথিবীতে মানব সমাজে

www.bjilibrary.com

অবতীর্ণ বিধান হওয়ার কারণে সরাসরি কায়েম হয়ে যায় না। মানুষের কাছে তার ঘোষণা প্রচারণার ফলেও তা কায়েম হয় না। আল্লাহর বিধান নভোমণ্ডলে ও গ্রহ-জগতে যেভাবে কার্যকর এখানে সেভাবে কার্যকর হয় না। এখানে তা রূপায়িত হয় একদল মানুষ দ্বারা, যারা এটাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, স্বীয় জীবনে রূপায়িত করে এবং সমাজ জীবনে একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এরা তাদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সংগ্রাম করে আল্লাহর বিধানবিরোধীদের বিরুদ্ধে।

এরা ইসলামী বিধান কার্যকর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে মানব প্রকৃতি ও বস্তুগত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব এমন এক পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম। একজন মানুষকে যেমনটি পায়, তেমনটি নিয়েই তারা কাজ শুরু করে। ক্রমশ তার জীবনে পরিবর্তন সূচিত করে। এরা কখনও বা নিজেদের ও অপরের ওপর জয়ী হয়। কখনো বা নিজ সত্তা ও অপরের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়। তাদের প্রচেষ্টা ও যুগোপযোগী উপকরণের পরিমাণের আলোকে তাদের জয় বা পরাজয় হয়ে থাকে। এই জয়-পরাজয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শের অনুসরণ এবং আচার-আচরণে তার প্রতিফলন।

এ হলো ইসলাম ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রকৃতি। ইসলামকে বাস্তব রূপ দানের এটা হলো নীল নকশা। এই সত্যটাই আল্লাহ আমাদেরকে শেখাতে চান এভাবে : "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তার পরিবর্তন করে।" "আল্লাহ যদি একদল দ্বারা আরেক দলকে পরাভূত না করতেন, তাহলে পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো।" "যারা আমার পথে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে পথ দেখাই।"

উহুদের বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে এই সত্যটাই বোঝানো হলো মুসলিমদেরকে। উহুদ যুদ্ধকালে মুসলিম বাহিনী ইসলামের যথার্থ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মুসলিমগণ ভেবেছিলেন, মুসলিম হওয়ার কারণে তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তাঁদের উদ্দেশে বললেন, "যখন তোমরা একটা বিপদের সম্মুখীন হলে যেমন হয়েছিলে আরেকবার এর আগে, তোমরা বললে : এটা কেমন ব্যাপার? বল : এটা তোমাদের কাছ থেকেই এসেছে।" আল্লাহ আরো বললেন: "আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণ করলেন যাতে তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে ওদেরকে পরীক্ষা করতে পার। তোমরা ব্যর্থ হলে এবং এই ব্যাপারে মতবিরোধ করলে। তোমরা যা ভালোবাস তা তিনি তোমাদেরকে দেখানোর পরও তোমরা বিদ্রোহ করলে। তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা করে, আবার তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পরকাল আকাঙ্ক্ষা করে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে দূরে ঠেলে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন।"

মুসলিমগণ এই সত্য উপলব্ধি করলেন উহুদের ময়দানে। ভর্ৎসনার মাধ্যমে নয়– রক্তদান ও দু:খ-যন্ত্রণা ভোগের মাধ্যমে। এটা ছিল চড়া দাম : বিজয়ের পর পরাজয়। গণিমতের মালের পরিবর্তে সর্বস্ব হারানো। এমন আঘাত যা সবাইকে আহত করল।

www.bjilibrary.com

হামজার [রা] মতো অনেক মহান ব্যক্তি হলেন শহীদ। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] শরীরে আঘাত প্রাপ্তি। তিনি মাথায় আঘাত পেলেন। একটা প্রচণ্ড আঘাত তাঁর দাঁত ভেঙে গেল। আবু আমর নামক কুরাইশদের এক সহযোগী একটা গোপন গর্ত খুদিত করে রেখেছিল। সেই গর্তে পড়ে গেলেন আল্লাহর নবী। তাঁকে হত্যার উদ্দেশে কুরাইশ বাহিনী মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালাল। বিশ্বনবীকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে অনেক সাহাবী হলেন শহীদ। আবু দুজানা [রা[বিশ্বনবীকে বাঁচানোর জন্য দুশমনদের তীরের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর পিঠে বিদ্ধ হতে থাকলো। তিনি নড়লেন না। অপরাপর সঙ্গীরা ছুটে না আসা পর্যন্ত তিনি প্রিয় নবীকে আড়াল করে রইলেন। এই ঘটনা এটাই প্রমাণ দিল যে, ইসলামের বাস্তবায়ন মানবিক চেষ্টা-সাধনা ও শক্তি-সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের মধ্যে একটা আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। এই সংগ্রাম অনিচ্ছা ও অনীহার বিরুদ্ধে। লোকদেরকে ইসলামের পথে আনার প্রয়োজনে। এটা জবানের সংগ্রাম। যুলুম-নির্যাতন ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথের প্রতিবন্ধকতা উৎপাটনের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে গেলে দু:খ-দুর্দশার শিকার হতে হয়। আর এই দু:খ-দুর্দশায় প্রয়োজন ধৈর্য ধারণের। সংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেও ধৈর্যের প্রয়োজন। সেই সময়ে ধৈর্য অবলম্বন করা তো রীতিমতো কঠিন ব্যাপার!

এই সংগ্রাম-সাধনা সবার জন্য। কোন ব্যক্তি যখন এই ময়দানে নামে তখন সে শুধু অন্য লোকের সাথেই সংগ্রামে নিয়োজিত হয় না। সে তার নিজ সত্তার বিরুদ্ধেও সংগ্রামে রত হয়। এই সংগ্রাম তার চিন্তাকে শাণিত করে। কর্মের দিগন্ত প্রসারিত করে। চুপ করে বসে থাকা মানুষ চিন্তার প্রাখর্য ও কর্মের উচ্ছ্বাস পেতে পারে না। আন্দোলন ও সংগ্রাম চালাতে গিয়ে এক ব্যক্তি জীবনকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে শেখে। উপলব্ধি করতে পারে গোটা জগতের রহস্য তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। সংগ্রামরত মানুষের আত্মিক সত্তার উন্নতি, অনুভূতি ও কল্পনাশক্তির প্রাখর্য এবং স্বভাব-প্রকৃতির উৎকর্ষ অর্জিত হয়।

"আল্লাহ যদি একদল লোক দিয়ে আরেক দলকে না দমাতেন, তাহলে পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে দূষিত হয়ে যেতো।" সমাজ দূষিত হওয়ার আগে দূষিত হয় মানুষের মন। দূষিত হয়ে সজীবতা হারিয়ে ফেলে। মনের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর ব্যক্তির সার্বিক সত্তাই স্থবির হয়ে পড়ে অথবা কেবল প্রবৃত্তি-পূজার ক্ষেত্রেই সে সজীব থাকে। মন উন্নতির পরিবর্তে অবনতির দিকে ধাবিত হয়। যেমনিভাবে অধ:পাতের দিকে ধাবিত হয় বিলাসিতাকবলিত কোন জাতি। আল্লাহ মানব প্রকৃতির কল্যাণ সাধনকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আর এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে সার্বিক শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করে।

এই সংগ্রামের সাথে আসে বাধা। সেই বাধা আনে দুঃখ-যন্ত্রণা। আর সেই দু:খ-যন্ত্রণা ব্যক্তির জীবনকে পরিশুদ্ধ করার অমোঘ হাতিয়ার। বাধা-বিপত্তি অলস, দুর্বলচেতা,

www.bjilibrary.com

প্রতারক ও মুনাফিকদেরকে ভয় লাগিয়ে দেয়। তারা দূরে সরে পড়ে। তাদের কবলমুক্ত হয় সমাজ। সমাজ-পরিবেশ পরিশুদ্ধির এটা একটা বাস্তব পদ্ধতি।

আল্লাহ মুসলিম জাতিকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। বিপদের হাতুড়িপেটা, কঠিন অবস্থার মুকাবিলা এবং দু:খ-বেদনার তিক্ততা দিয়ে এই পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষা-পদ্ধতির ফলে মিল্লাত পরিশুদ্ধ হয়। মহাসত্যই আল্লাহ মানুষকে শেখাতে চেয়েছেন। "এটা কেমন ব্যাপার?" এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন: "যখন তোমরা একটি বিপদের সম্মুখীন হলে— যেমন হয়েছিলে আরেকবার এর আগে, তোমরা বললে : এটা কেমন ব্যাপার? বল : এটা তোমাদের কাছ থেকেই এসেছে।" আল্লাহ আরো বললেন, "আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণ করলেন যাতে তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে ওদেরকে পরীক্ষা করতে পার। তোমরা ব্যর্থ হলে এবং এ ব্যাপারে মতবিরোধ করলে। তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা করে। আবার তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পরকাল আকাঙ্ক্ষা করে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে দূরে ঠেলে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন।"

এসব কথা উহুদের মুজাহিদদের অন্তরে গেঁথে গেল। লড়াইয়ের ময়দানে চিন্তা ও কাজে পূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করা হয়নি। পরিণামে নেমে এলো বিপর্যয়। এই বিপর্যয় শেষ পর্যন্ত তাঁদের জন্য কল্যাণ এনেছিল। তাঁরা তো আল্লাহর ক্ষমা পেলেন! সাথে সাথে পেলেন এক সুশিক্ষা। শিখলেন নিজেদেরকে– নিজের বাহিনীকে– পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি।

ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নে মানবিক চেষ্টা-সাধনা এবং বস্তুগত বাস্তবতার প্রতি গুরুত্বারোপকে যেন ভুল না বোঝা হয়। এর অর্থ নিশ্চয়ই এটা নয় যে, এই ব্যাপারে মানুষ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার অধিকারী অথবা সে আল্লাহর পরিকল্পনা ও সহায়তার অধীন নয়। বিষয়টিকে এভাবে গ্রহণ করাটা ইসলামী চিন্তাধারার পরিপন্থী। অবশ্য আল্লাহ সাহায্য করেন তাকে যে সত্য পথ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে। "যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে আমি তাদেরকে পথ দেখাই।" "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তার পরিবর্তন সাধন করে।" এ দু'টো আয়াত থেকে মানবিক চেষ্টা-সাধনা এবং আল্লাহর সাহায্যের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আল্লাহর সাহায্যেই মানুষ পুণ্য পাবে, সত্য পথ পাবে এবং কল্যাণ পাবে। কিন্তু সেই সাহায্য পাওয়ার জন্য তাকে তার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ কিছু পাবে না। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য তার জন্যই আসে যে সাহায্য লাভের উপযুক্ততা প্রমাণ করে এবং কেবল আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্যই সংগ্রামে রত থাকে। আল্লাহর ইচ্ছা, পরিকল্পনা ও নির্দেশ বিশ্ব জুড়ে কার্যকর। এই ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার বা হস্তক্ষেপ করার কেউ নেই। এই মহাসত্যকে অন্তরে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করতে না পারলে ঈমানের পূর্ণত্ব অর্জন সম্ভবপর নয়।■

www.bjilibrary.com

জপে সে নাম প্রতি ধূলিকণা অবিরত ॥ জা হা না রা আ র জু

বিক্ষুব্ধ এই বিশ্বটা যখন টগবগ করে ফোটে,
বিভ্রান্ত মানুষরা যখন ভুলে যায় নিজ নাম–
জীবনের দহন রোদ্দুরে ছুটে যায় অবিরাম,
তাপিত তৃষ্ণায় মেঘছায়া যাচে, দিশেহারা ছোটে

পাল ছেঁড়া নাবিকের মতো! কখনো সে রাত্রিদিন
ঘোলাটে দু'চোখে খোঁজে কোথায় রয়েছে বাতিঘর,
ঝড় বন্যায় ভেসে যায় যত স্বপ্নের বালুচর
কোথায় সে পথিক পা রাখবে, কোথায় সে পদচিন্।

তবুও কে যেন বলছে শাশ্বতই সেই বাণী—
হারাবে না কিছুই, রয়েছি হৃদয়ের কাছাকাছি,
দুঃসহ ব্যথার সব ক্লান্তি ঘোচাতে আমি আছি,
আনত বিশ্বাসে খুলে দাও ও দৃষ্টির পর্দাখানি!
যেদিকে তাকাও সেদিকেই আমি রয়েছি ছেয়ে—
দৃষ্টির ওই পর্দাটুকু ঘুচায়ে দেখ শুধু চেয়ে।

উত্তরণ ॥ আ ব দু ল মু কী ত চৌ ধু রী

সংহতি

সংহতি ও ঐক্যে ছিলো যাদের জয়যাত্রা
আত্মঘাতী হানাহানির বিপর্যয়ের মাত্রা
সর্বনিম্নে অধোমুখী, —এটাও বিশ্বাস্য?
কদমবুসী নিয়তি হায় কুব্জবৃত্তি দাস্য।

শৃঙ্খলিত স্বজাতিকে ভালবাসার দৃষ্টি–
উষ্মা রেখে গোষ্ঠিগত দ্বন্দ্বে অনাসৃষ্টি;
এই সুযোগে আগ্রাসীরা দেশে দেশে হামলায়
কোটি জনগণহত্যা অবলীলায় পার পায়!

www.bjilibrary.com

হর হামেশা যেমন খুশি দীনের নামে ভাষ্য
ভেদাভেদের প্ররোচণায় ভাগ্য পরিহাস্য।
বাতিল এখন নৃত্যমুখর, সুবর্ণ পৌষ মাস তার
অবরুদ্ধ দেশে দেশে কারবালার অন্ধকার।

অবাক কাণ্ড! যাদের দাবী কুরআন এবং সুন্নাহর
আদর্শে অটল তারা, পথ দেখাচ্ছে হিংসার
প্ররোচণায় বিভক্তিতে জাতি ভেঙে খানখান;
ক্ষুদ্র আত্মা অন্ধ দৃষ্টি হতে পারে মুসলমান!

প্রতিরোধ-সংগ্রাম

প্রতিরোধ ও সংগ্রামেই যাদের গড়া ভাগ্য
সাজে তাদের জন্য কি এই নির্লিপ্তি বৈরাগ্য?
ব্রত এখন অনাচারের বিপরীতে মৌন
সমাজ এবং রাষ্ট্রে তাই ভূমিকাটি গৌণ।

গণজীবন সংলগ্নতায় যারা ছিলো শীর্ষে
জীবন এবং জগত থেকে বিচ্ছিন্ন জাতি সেই
পলায়নী অপার্থিবের পথে করে যাত্রা।

আকাশচুম্বী বিত্ত-বেসাত কারুনী মালমাত্তা,
এ সম্পদে সর্বহারার রত্তিও নেই পাত্তা।
বৈষম্যের প্রাচীর ভাঙার যোদ্ধারা যায় নিদ্রা,
খুঁজবে কোথায় সেই জাতিকে আজ এ সমাজবিদরা?

উত্তরণ

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পরাজিত আজ তাই
মানবতার শীর্ষে আসীন সে কর্তৃত্ব আর নাই।
বিপর্যয়ের উৎস খোঁজার কালের দাবী যায় ক্ষণ
মানবতা বিপন্ন আজ, বিপন্ন উত্তরণ।

www.bjilibrary.com

একটি ছেলে ॥ সাজজাদ হোসাইন খান

একটি ছেলের মনের ভিতর অনেক অনেক কথা
ঝড়ের মতো উঠতো ফুঁসে ভাঙতো নীরবতা
যোজনব্যাপী উধাও পাহাড় ফুল-পাখী আর নদী
কার ছোঁয়াতে এমন করে হাসছে নিরবধি!

উদাস করা তারার চোখ গন্ধ ছড়ায় হিম
পুব গগনে লটকে থাকে হাসের হলুদ ডিম।
হিমেল হাওয়ার দোলন চেপে মেঘের সাদা ঝাঁক
ভেজায় মরু ভেজায় সাগর ভেজায় পথের বাঁক?

আকাশটার অই শরীর ঘেঁষে আতরমাখা চাঁদ
সোনার বরণ তীরের ফলায় ভাঙছে কালোর বাঁধ?
সেই ছেলেটা কোন ছেলেটা বলতে পার কেউ?
যাহার নামের হালকা পরশ জাগায় মনে ঢেউ?

আমার তোমার সাথী প্রিয়, মানুষ সবার সেরা
সেই মানুষের নামটি আজো আলোয় আলোয় ঘেরা।
এই আলোতে ফর্সা হলো বর্ষা এলো নেমে
ভাসলো কালো ভাসলো আঁধার উঠলো পাপী ঘেমে।

www.bjilibrary.com

সন্নিহিত না'তের পংক্তিবিশেষ ॥ মতিউর রহমান মল্লিক

হাসসান বিন সাবিতের অলৌকিক স্বর্ণালংকার
আমি দেখেছি এবং
আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার অশ্বারোহণও।
তারপর কোনো সন্নিহিত গতি উদ্ধার করার
সমস্ত কলাকৌশলই অনাবিষ্কৃত থাকতে থাকতে
একটি উদিত সূর্য অনুবাদ করতে গিয়ে
দেখি–
সমবেত সূর্যমণ্ডলী তাঁকে অতিক্রম করতে পারলো না।

কে সেই সূর্যমণ্ডলীরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভাপতি?
তাঁকে আর তাঁর নিদর্শনাবলীও
সমর্থন করলেন বলে
পৌত্তলিকতার সমস্ত জৌলুসই কবি লবীদ
গলিত বর্জ্যের মতো কবরস্থ করতে লাগলেন।

হায়! আমি যদি তাঁর একটি নগণ্য এবং
উৎকীর্ণ সূর্যমুখীও হতে পারতাম!

প্রতিনিয়ত রবিউল আউয়াল ॥ আহমদ আখতার

চাঁদগুলো ঘুরে যেত ইস্কাটন গার্ডেন মসজিদের অদৃশ্য মিনারে

বীথি চাচীর কেবলামুখী পরিচ্ছন্ন বারান্দায়
কিংবা
সাত নম্বরের আকাশচুম্বি ছাদে
সেই সব সদ্যোজাত চাঁদের মুচকি হাসি
বিপন্ন মানসলোকে পৌঁছে দেয় কস্তুরীর ঘ্রাণ

বিশেষত রবিউল আউয়াল আনে ভিন্ন অনুভূতি

আম্মা খাদিজার মত সম্ভ্রমের অপার্থিব নাম লেখা স্বর্ণাক্ষরে
আর শুনি মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরে চিরায়ত কল্যাণের আহ্বান

প্রতিনিয়ত রবিউল আউয়াল ভেঙে যায় আঁধারের অদ্ভুত ভড়ং।

www.bjilibrary.com

রাসূল [সা-এর জীবন ও সহিষ্ণুতা

অধ্যাপক আবু জাফর

সমগ্র মানব বংশের জন্য প্রেরিত যে হেদায়াত বা পথনির্দেশ আল কুরআন, রাসূল [সা] ছিলেন তারই স্বচ্ছতম বিশ্বস্ততম মানবিক প্রতিরূপ অর্থাৎ কেউ যদি আল কুরআন অধ্যয়ন না করেন, শুধু রাসূল [সা]-এর জীবন ও উপস্থাপিত জীবনাদর্শের প্রতি মনস্ক দৃষ্টিপাত করেন, তিনি হুবহু আল কুরআনকেই অবলোকন করবেন অথবা এটাও সমভাবে সত্য যে, রাসূল [সা]-এর সুন্নাহ্ ও সীরাত বা বাস্তব জীবনচরিত কেউ যদি কোন কারণে অবলোকন করার সুযোগ না পান, তিনি যদি কেবল যথোচিত বিশ্বাস, অনুরাগ ও তাকওয়াসহ কুরআনুল কারীম মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেন, তিনি রাসূল [সা]-এর পুরো বাস্তব জীবনচিত্রকে নির্ভুলভাবে দেখতে পাবেন অর্থাৎ সহজ কথায়, আল কুরআনে এমন একটি বাক্য নেই, যা রাসূল [সা] তাঁর জীবনে স্তরে স্তরে পেশ না করেছেন এবং একইভাবে তাঁর বহু সমস্যাকীর্ণ যাপিত জীবনে এমন কোন কথা ও কর্ম নেই, এমন কি ইশারা, ইঙ্গিত কি নীরবতাও নেই, যা আল কুরআনে অনুপস্থিত। অতএব, তাঁকে দেখলেই কুরআন যেমন পড়া হয়ে যায়, ঠিক একই রকম কুরআন পাঠ করলে তাঁকে দেখাও হয়ে যায়। এজন্যই রাসূল [সা]-এর জীবন সম্পর্কে কোনো একজন সাহাবীর কৌতূহলী প্রশ্নের

www.bjilibrary.com

জবাবে আমাদের জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা তাৎক্ষণিকভাবে বলেছিলেন, “তোমরা কি কুরআন অধ্যয়ন করোনি?”

এই কথাগুলো আলোচনার প্রারম্ভেই উপস্থাপন করতে হলো এজন্য যে, আমাদের প্রতিপাদ্য যে বিষয়, রাসূল [সা]-এর তেইশ বছরের নবুয়তি জিন্দিগীতে সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতা, তার কোনো কিছুই তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব কি কর্মকুশলতার অভিব্যক্তি নয়, সবই আল কুরআনের নির্ভুল ও অকাট্য পথনির্দেশ দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের শীর্ষনাম হলো, ‘রাসূল [সা]-এর জীবন ও সহিষ্ণুতা’। প্রথমেই উল্লেখ্য, সহিষ্ণুতা একটি বিরাট গুণ : যথাস্থলে যথোচিত সহিষ্ণুতা অবলম্বন একটি বিরাট ইবাদতও বটে! আর ইবলিসের মুকাবিলায় একমাত্র আল্লাহপাকের অখণ্ড অবিভাজ্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় এই বস্তুটির গুরুত্ব ও আবশ্যকতা যে কী অপরিসীম ও অপরিহার্য, রাসূল [সা]-এর পুরো নবুয়তি-জীবন তারই প্রশ্নাতীত দৃষ্টান্ত।

আল্লাহপাক জিহাদ অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ ফরয করেছেন এবং একই সঙ্গে আল্লাহর মনোনীত যে দীন, সেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠার দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথে অবিচল ধৈর্যে দৃঢ়পদ থাকাও আল্লাহর কাছে একটি পছন্দনীয় ইবাদত। অনেকে জানেন, আল কুরআনের ছয় শতাধিক আয়াতে এই জিহাদ ও ধৈর্যের কথা সর্বাধিক গুরুত্বসহ বিবৃত হয়েছে। অতএব, রাসূল [সা] যে জিহাদ ও সহিষ্ণুতার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক অজেয় অপরাজেয় উদাহরণরূপে নিজেকে উপস্থাপন করবেন ও করেছেন, এটাই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এতদসঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা জরুরি যে, এই সহিষ্ণুতা ও সংগ্রাম যেহেতু সর্বতোভাবে শুধু ইসলামের বিজয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত, যেহেতু আল্লাহর আদেশ ও অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করেই শুধু অভিমান ছিল না এবং তাঁর জিহাদী ভূমিকার মধ্যেও ছিল না এতটুকু শ্লাঘা ও হঠকারিতার কোনো স্থান। সর্বকালের প্রেক্ষাপটে তাঁর জিহাদ ও ধৈর্যের এটাই একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, কোনো কিছুর মধ্যেই তাঁর নিজস্বতা বলে কিছু ছিল না; তিনি ছিলেন আল্লাহ ও আল্লাহর দীনের জন্য সর্বস্ব-উৎসর্গী কৃত এক আত্মমুক্ত মহামানব।

পৃথিবীতে বহু দিগ্বিজয়ী বীরের আবির্ভাব ঘটেছে। অশোক, সিজার ও আলেকজান্ডার থেকে এ কালের নেপোলিয়ন হিটলার পর্যন্ত অনেকের অনেক কথাই আমরা জানি; কিন্তু সর্বকালের ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্তও কি আছে, যেখানে প্রতিপক্ষের পরাজয়ে বিজয়ী বীর এতটুকু উল্লসিত হননি? এমন কোনো সহিষ্ণু মানুষের সন্ধান কি পাওয়া যায়, যিনি বছরের পর বছর মুষ্টিমেয় সঙ্গীসাথীসহ অকথ্য অভাবিত নিগ্রহ, নির্যাতন ও বৈরিতার মধ্যেও আপন আদর্শকে আঁকড়ে ধরে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন? নেই। এমন কোনো ধৈর্যশীল পুরুষ কি পৃথিবী কখনো দেখেছে, যিনি দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে প্রাণঘাতী দুশমনদের ক্রোধ ও ক্রূরতাকে নির্বিকারভাবে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন, কোনো প্রতিবাদ করেননি, কিন্তু আদর্শ থেকে এক ইঞ্চি পশ্চাদপসরণও করেননি? পৃথিবী কি প্রত্যক্ষ করেছে এমন কোনো আদর্শনিষ্ঠ মহান পুরুষের মুখচ্ছবি, যিনি নিজেকে ও কতিপয় সঙ্গীসাথীকে শুধু এই কথা বলে সব নৃশংসতাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবার

www.bjilibrary.com

নির্ভীক ও নির্বিকার উক্তি পেশ করেছেন যে, বিগত দিনে বহু নবী ও তাঁর উম্মতকে শুধু তাওহিদী দাওয়াতের অপরাধে লোহার চিরুণি দিয়ে শরীর থেকে মাংস ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে? না, ইতিহাস অকপটে সাক্ষ্য দেবে, পৃথিবী তার আবহমানকালের গতিপথে এ রকম কোনো মানুষের সাক্ষাৎ কখনো পায়নি, এমন কি কখনো কল্পনাও করেনি। সবটুকু বুঝিয়ে লেখা অসম্ভব, সবার পক্ষেই অসম্ভব, শুধু বলা যায়, এই হলো রাসূল [সা]-এর অটল অবিচল সর্বংসহা তিতিক্ষার মোটামুটি পরিচয়।

রাসূল [সা] বলেছেন, তিনিও অন্যদের মতোই মানুষ, তাঁর কাছে অহী অবতরণ করে, এইটুকু শুধু পার্থক্য অর্থাৎ তিনিও একজন যথাযথ মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন, অথচ ইতিহাস সবিস্ময়ে অবলোকন করে, নির্বাক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে এমন একজন রক্তমাংসের চলিষ্ণু মানুষ, যাঁর সহিষ্ণুতার বাঁধে কখনো এতটুকু ফাটল ধরে না, শত বিপদেও যাঁর ধৈর্যের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ইসলামের প্রথম শহীদ জননী সুমাইয়া [রা] যখন অকথ্য নির্যাতন ভোগের পর গুপ্তাঙ্গে আবু জেহেলের বল্লমাঘাতে শাহাদাত লাভ করেন, রাসূল [সা] ধৈর্য হারাননি। হযরত ইয়াসির [রা]-কে দুই উটের সঙ্গে বেঁধে দুই দিকে চালিয়ে তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়, হযরত খাব্বাব [রা] কে জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে রাখা হয়, উত্তপ্ত বালুকার ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয় হযরত বেলাল [রা]-কে, এসবই রাসূল [সা]-এর চোখের সামনে, তিনি ধৈর্য হারাননি, এমন কি শিয়াবে আবু তালিবের সংকীর্ণ গিরি-উপত্যকায় তাঁকে-সহ পুরো বনি হাশিমকে একাদিক্রমে তিন বছর অবরুদ্ধ রেখে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়, কখনো রাসূল [সা] ধৈর্য হারাননি। সকল কঠিন ও অবর্ণনীয় দুর্যোগ-দুর্ভোগের মধ্যে একটা বড় সান্ত্বনা ছিল হযরত খাদীজা [রা] ও পিতৃব্য আবু তালিব, তাঁরাও যখন উভয়েই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ইন্তেকাল করলেন, পৃথিবী দেখলো, রাসূল [সা] তখনো পর্বতের মতোই অটল ও নির্বিকার। সিদ্ধান্ত হয়েছে কাফেররা সম্মিলিতভাবে আজ রাতেই তাঁকে হত্যা করবে। এ সংবাদ তিনি অবগত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ভয় কি অস্থিরতা কি চাঞ্চল্য কিছুই দেখা দেয়নি বরং সকল উদ্বেগ ও চিত্তবিক্ষেপ থেকে মুক্ত পর্বতের মতো নিষ্কম্প এই মানুষটি হিজরতের প্রাক্কালে প্রাণঘাতী দুশমন পরিবেষ্টিত গৃহ থেকে এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করতে করতে "নিষ্ক্রান্ত হলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে যেখানেই নিয়ে যান, যেখান থেকেই নিয়ে যান, আমার পবিত্রতা অক্ষত রাখুন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে দান করুন রাষ্ট্রক্ষমতা" [সূরা বনি ইসরাইল]। রাসূল [সা] যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক [রা]-কে নিয়ে গারে সওরে তখনো তিনি সকল দুর্ভাবনামুক্ত এক অবিশ্বাস্য রকম আশ্চর্য মানুষ! গুহামুখে শত্রুদের পদধ্বনি শ্রুত হচ্ছে, আবু বকর [রা] উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় বিচলিত, কিন্তু রাসূল [সা] শতকরা শতভাগ নি:শঙ্ক ও নিরুদ্বেগ। সত্যিই কী সব এক একটি দুর্বহ সংকট, অথচ কী অনন্য অসাধারণ অচঞ্চল সহিষ্ণুতা! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নমুনা নেই, যার সঙ্গে ধৈর্য ও সহনশীলতার এই সবাক ছবির এতটুকু কোনো তুলনা চলে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু মানব শক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য এই অতলান্ত সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখানো সম্ভব হয় কী করে? হয় এজন্য যে, প্রথমত নবী-রাসূলদের এটা একটা গুণ, যা তাঁদের মধ্যে স্বভাবগতভাবেই সর্বদা বর্তমান। এই বস্তুটির অভাব বা অনুপস্থিতি অথবা বলতে হয়, এই বস্তুটির প্রতি বিস্মৃতি কি অমনোযোগ যে কোন অবস্থাতেই নবী-রাসূলদের জন্য একেবারে পুরোপুরি নিষিদ্ধ যে কারণে কুরআনুল কারীম থেকে এটা প্রমাণিত, হযরত ইউনুস [আ]-এর সামান্য ধৈর্যচ্যুতিও আল্লাহপাক অত্যন্ত কঠিনভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূল [সা] তাঁর দুরূহ দুর্গম কর্তব্যপথে কিছুমাত্র যাতে বিচলিত না হন এজন্য আল্লাহপাক সতর্ক করিয়ে দিয়েছিলেন, 'ওয়া ইসমাইলা ওয়া ইদরিসা ওয়া জাআলকিফলি কুল্লুম মিনাছ্ছাবিরীন' এবং ইসমাইল, ইদরিস ও জুলকিফলির কথা স্মরণ করুন, তারা সকলেই ছিল ধৈর্যশীল [সূরা আল আম্বিয়া]।

দ্বিতীয়ত কুরআনুল কারীমে বর্ণিত সেই কাহিনী, যেখানে হযরত ইবরাহীম [আ] স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী দেবার কথা বলছেন; আর বালক ইসমাইল [আ]-এর নিঃশঙ্ক প্রতিক্রিয়া, তিনি বললেন, যে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, হে পিতা, আপনি তা সত্বর পালন করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্তরূপে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ [সূরা সাফফাত]। বলাই বাহুল্য, এ সকল কথা রাসূল [সা]-এর কাছেই অবতীর্ণ; অতএব, পৃথিবী যতই বিস্মিত হোক, তিনি কি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার কণামাত্রও অন্যথা করতে পারেন! নবী-রাসূলদের জন্য সে পথ খোলাই নেই; তিনি শ্রেষ্ঠতম নবী, তাঁর জন্য তো একেবারেই নেই! আর ইসলামের যে পয়গাম নিরঙ্কুশ তাওহীদ, যা রাসূল [সা] বহন করে এনেছেন সমগ্র মানব বংশের জন্য, তার মূল কথাই হলো, 'কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়া ইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' -বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সকল ইবাদত, আমার জীবন ও মরণ সবই বিশ্বপ্রতিপালক একমাত্র আল্লাহপাকের জন্য [সূরা আনআম] অর্থাৎ নিজস্বতা বলে কিছু নেই, আল্লাহপাকের জন্য জীবনের সব কিছু নিঃশেষে নিঃশর্তভাবে কুরবানী করে দেবার নামই ইসলাম ও ইসলামের একত্ববাদ। আর এই তাওহীদের অখণ্ড আমানত পৃথিবীতে পৌঁছে দেয়া ও প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব আল্লাহপাক যাঁর স্কন্ধে অর্পণ করেছেন, তিনি কি অসহিষ্ণু হতে পারেন? আলো জ্বালানোই যাঁর কাজ, অন্ধ অধৈর্য মানুষের শিক্ষা দানে তিনি কি হতে পারেন বিরক্ত ও বিব্রত ও অভিমানী? পারেন না, কখনো কোনো অবস্থাতে মুহূর্তের জন্যও পারেন না। পৃথিবীর জন্য কল্পনাতীত ধারণা কি স্বপ্নের পক্ষেও অগমণ্য, কিন্তু ইতিহাস বার বার এই নির্ভুল সবাক চিত্রটি পেশ করে যে, রাসূল [সা]-এর কঠিন ও মসৃণ সহিষ্ণুতার প্রাচীরগাত্রে কোথাও একটি সূক্ষ্মতম ফাটলরেখাও কখনো দেখা যায়নি।

কিছু কুকণ্ঠ তার্কিক অবশ্য বলতে চায়, মক্কী জীবনে অসহায়ভাবে সব কিছু মেনে নেয়া ছাড়া রাসূল [সা]-এর করার কিছু ছিলো না। অতএব, এই সহিষ্ণুতা আসলে সহিষ্ণুতা নয়, পরিস্থিতির কাছে একজন অসহায় অনন্যোপায় মানুষের আত্মসমর্পণ এবং তারা এই কথাও বলে, মাদানী জীবনে শক্তি সঞ্চিত হওয়া মাত্র তাঁর সহিষ্ণুতা আর বিশেষ অবশিষ্ট

www.bjilibrary.com

থাকলো না, যুদ্ধে যুদ্ধেই কাটিয়ে দিলেন জিন্দিগীর অবশিষ্ট দশটি বছর। বলা আবশ্যক, বস্তুতই এ রকম যারা মনে করে, তারা শুধু অজ্ঞ নয়, পুরোপুরি আকাট মূর্খও বটে! কিছুই না জেনে ইসলামের বিরুদ্ধে গর্হিত মন্তব্য করা তাদের স্বভাব, তাদের একটি নীচ ও গুরুতর বিলাসিতা। তবু এই লঘুবুদ্ধি তার্কিকদের জ্ঞাতার্থে এইটুকু উল্লেখ করা যায় যে, মক্কী জীবনে রাসূল [সা]-কে যতটা অসহায় বলে মনে হয়, তিনি ততটা অসহায় ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সার্বক্ষণিকভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সূরা আনফাল-এ রাসূল [সা]-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'ওয়া মাকানাল্লাহু লিইউয়াজ্জিবাহুম ওয়া আনতাফিহিম' –আপনি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাদেরকে অর্থাৎ আপনার দুশমনদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না [সূরা আনফাল]। আল্লাহর কাছে তাঁর কী অপরিসীম ও কত সুউচ্চ মর্যাদার কথাই না এখানে ঘোষিত হলো! এই রাসূল [সা] কি আল্লাহর কাছে একটু ফরিয়াদ বা অভিমানও জানাতে পারতেন না? যাঁর পবিত্র অঙ্গুলি হেলনে আল্লাহপাক চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে কাফের মুশরিকদেরকে স্তম্ভিত করে দেন, সেই রাসূল [সা] অসহিষ্ণু হলে একটু কি বদদোয়াও করতে পারতেন না? অবশ্য এক দু'বার তিনি শুধু এইটুকু উচ্চারণ করেছেন, 'আল্লাহুম্মা আলাইকা বি কুরাইশ' অর্থাৎ হে আল্লাহপাক, কুরাইশদের দায়িত্ব আপনার ওপর। এই একটি কথায়ই কুরাইশরা দারুণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। তাদের খুবই ভয় হতো যে, তারাও আবরাহার মতো আল্লাহ-প্রেরিত কোনো আকস্মিক গযবের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে না যায়! কাফের মুশরিকদের তরফ থেকে ক্রমাগত আপস-প্রস্তাব আসছিল, এতই যদি অসহায় হবেন, নিরুপায় হবেন, রাসূল [সা] কি একটু আপসও করতে পারতেন না? বুরবাকদের বোঝানো অসম্ভব, তবু আশা করা যায়, তাদের বোধোদয় না ঘটুক, এ সকল তথ্যদৃষ্টে অন্তত তাদের কুফরি-কালামে অভ্যস্ত কুৎসিত রসনা কিছুটা সংযত হবে।

হিজরতের পর মাদানী জিন্দিগীতে রাসূল [সা] কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন একথা সত্য, ইন্তেকাল পর্যন্ত পুরো সময়টা অবিশ্রাম যুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে, এই কথাও সত্য; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি হঠাৎ অসহিষ্ণু ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছেন আগ্রাসী শক্তির মোকাবিলার জন্য, ইসলাম ও মুসলমানদের সূরার জন্য, কিন্তু কোনো বিচারেই অসহিষ্ণুতাবশত নয়। তাছাড়া এটাও মনে রাখা জরুরি যে, রাসূল [সা]-এর সহিষ্ণুতা কোনো অবস্থাতেই ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার অভাব নয়। তিনি পথ চলেন আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী। তাঁর সকল কার্যক্রম মহাগ্রন্থ আল কুরআন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এজন্যই যেখানে দৃঢ়তা প্রয়োজন, প্রতিপদে মোকাবিলায় তিনি সেখানে সহস্র সম্মিলিত শার্দুলের চেয়েও অকুতোভয়। কিন্তু যেখানে উগ্রতার কোনো প্রয়োজন নেই, আনীত দীন ও ইনসাফের প্রশ্ন যেখানে জড়িত নয়, সেখানে তাঁর মধ্যে প্রীতি ও সহিষ্ণুতা, মায়া ও ঔদার্যের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটেনি। মাদানী জীবনের ইতিহাস থেকেই এটা অনুধাবন করা যায় যে, তিনি কতই না ধৈর্যশীল, কতই না স্নেহপ্রবণ!

তিনিই সকল যুদ্ধ জয়ের অবিসংবাদিত মহানায়ক, কিন্তু তিনি ভুলক্রমেও কখনো

www.bjilibrary.com

উল্লসিত হননি, বরং ভেতরে ভেতরে তিনি এই ভেবে কাতর ও মর্মাহত হয়েছেন যে, অনেক মানুষ তাঁকে চিনতে পারলো না, জান্নাতের সুসংবাদকে উপেক্ষা করে অন্ধত্ব ও মূঢ়তাবশত জাহান্নামকেই তারা আপন করে নিলো। অন্ধ ইসলামবিদ্বেষীরা আশ্চর্য হয় না, কিন্তু এটা সমূহ আশ্চর্যেরই কথা যে, প্রাণঘাতী দুশমনের জন্যও একটি মানুষের মধ্যে কী অকল্পনীয় মমতা ও সহানুভূতি! এবং যে যাই বলুক, শুধু ধৈর্যের জন্য ধৈর্য নয়, এক সর্বপ্লাবী মমতাই তাঁকে কণামাত্র অসহিষ্ণু হতে দেয়নি।

রাসূল [সা]-এর সর্বমানবিক প্রেম ও সহিষ্ণুতা যে কত গভীর ও অভাবনীয় ছিল, একটি দু'টি উদাহরণ থেকেই আমরা তা সম্যক অনুধাবন করতে পারি। পিতৃব্য হযরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহশি যখন এসে তাঁর কাছে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের আবেদন জানায়, পিতৃব্যের জন্য হৃদয়ভরা হাহাকার সত্ত্বেও তিনি ওয়াহশিকে ক্ষমা করে দেন। যে এক পাষণ্ড ইহুদি নারী যয়নব তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছিল, তাকেও রাসূল [সা] নিজের তরফ থেকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু বিষক্রিয়ায় একজন সাহাবী ইন্তেকাল করেন, যয়নব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। লাবীদ নামক অন্য এক পাষণ্ড কর্তৃক যাদুগ্রস্ত হয়ে রাসূল [সা]-কে কিছুদিন গুরুতর অসুস্থতার মধ্যে কাটাতে হয়, পরে স্বপ্নযোগে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার জানতে পারেন। সেই পাষণ্ড লাবীদের বিরুদ্ধেও তিনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, এমন কি তার নামটাও প্রকাশ করতে চাননি। যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবহার কিসের উদাহরণ? এ যদি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত না হয়, তাহলে সহিষ্ণুতা আর কাকে বলে? মক্কা বিজয়ের কথা স্মরণ করতে পারি। কী অত্যুচ্চ মহত্ত্ব, ঔদার্য ও ধৈর্যশীলতার অধিকারী ছিলেন যে, অতীতের সবার সব দুশমনি ভুলে গিয়ে সকলকে হতবাক করে তিনি ঘোষণা করলেন, 'লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা' –আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই [সূরা ইউসুফ]। মহত্ত্বের এমন অভিব্যক্তি কল্পনা করা যায়! অসম্ভব, এমন কি ইকরিমা, কাব বিন জুহায়ের প্রমুখ যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের হুকুম ঘোষণা করেছিলেন, তারাও প্রায় সকলেই সসম্মানে মার্জনা লাভ করে। মক্কী জীবনের একটি ঘটনা। কাবাগৃহের রক্ষক ওসমান ইবনে তালহার কাছে রাসূল [সা] একদা চাবি চেয়েছিলেন। ওসমান চাবিতো দিলোই না, বরং তাঁকে না-হকভাবে তিরস্কার ও অপমানিত করলো। ওসমানের এই দুর্ব্যবহারে রাসূল [সা] সেদিন খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ এই মক্কা বিজয়ের দিনে সেই ওসমানই যখন ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, রাসূল [সা] কী করলেন? তাঁর মানসপটে ফুটে উঠলো সেই পুরাতন অপমানের স্মৃতি, ওসমানের দুর্বাক্য ও দুর্ব্যবহার, কিন্তু তিনি একটি কথাও বললেন না। রাসূল [সা] চাবি ওসমানের হাতে ফিরিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, পুরুষপরম্পরায় কাবাগৃহের এই চাবি রোজ কিয়ামত পর্যন্ত ওসমান ইবনে তালহার বংশধরদের হাতেই থাকবে। কেউ যদি ছিনিয়ে নেয়, সে জালিম। কাবাগৃহের চাবি এখনো পর্যন্ত ওসমানের বংশেই আছে। ইনশাআল্লাহ রোজ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ কে আর স্বেচ্ছায় বা শখে এমন দু:সাহস দেখায়, যাতে রাসূল [সা] ঘোষিত জালিমের অভিধায় পরিচিত হতে হয়।

www.bjilibrary.com

বলাই বাহুল্য, এ রকম বিভাদীপ্ত অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে রাসূল [সা]-এর মহিমান্বিত জীবনে, অথচ এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে তিনি অসহিষ্ণু, এমন কি মসজিদে নববীতে কেউ যখন মূত্রত্যাগের মতো গর্হিত নোংরা কাজটি করে বসে, সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও তিনি ওই বুরবাক লোকটিকে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের অবকাশ দান করেন এবং পরে তাকে নম্রভাবে বুঝিয়ে দেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিকারহীন সপ্রীতি সহিষ্ণুতার এক অনবদ্য নমুনা! মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই রাসূল [সা]-কে নানাভাবে কষ্টে ও সমস্যায় ফেলেছে। তার আপন সন্তান আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহসহ সবাই যখন যথোচিত দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছেন, রাসূল [সা] এই চিহ্নিত মুনাফিকের বিষয়টি আল্লাহপাকের ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে কিছুই বলেননি, বরং তার পুত্র সাহাবী আবদুল্লাহর অনুরোধে অনেক বিশিষ্ট সাহাবীর বাধা উপেক্ষা করে তাঁর নিজের জামা দিয়ে তার কাফনের ব্যবস্থা করেন, জানাযাও পাঠ করেন এবং এই কথাও বলেন, সত্তরবার দোয়া করলেও যদি আল্লাহপাক ক্ষমা করতেন, তাহলে তিনি সত্তরবার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের জন্য দোয়া করতেন। ইতিহাসই বলুক, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার এমন একটি উদাহরণও কি পৃথিবীতে আছে? বাস্তবে তো নেই-ই, মানুষের মনগড়া গল্প উপন্যাসেও নেই।

আসলে ব্যক্তিগত মান-অভিমান, ক্রোধ, ঈর্ষা-অসূয়া থেকে বহু উর্ধ্বে ছিল মহানবী [সা] এর অবস্থান। একমাত্র আল্লাহর দীনের প্রশ্নে, ইনসাফের প্রশ্নে তিনি ছিলেন নিরাপস। এ ছাড়া সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রেই তিনি শত-শতাংশ ধৈর্যশীল ও স্নেহপ্রবণ। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, 'ছিবগাতাল্লাহ ওয়ামান আহছানু মিনাল্লাহি ছিবগাতাউ', তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও, তাঁর রঙের চেয়ে আর কার রঙ উত্তম হতে পারে? [সূরা বাকারা]। আল্লাহপাকের একটি বিশিষ্ট রঙ হলো ক্ষমা, অনুগ্রহ ও সহিষ্ণুতা। এজন্যই রাসূল [সা] বলেন, আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা তাঁর ক্রোধকে বহু গুণ অতিক্রম করে গেছে। আর আল্লাহর এই অন্যতম উৎকৃষ্ট রঙে রাসূল [সা]-এর চেয়ে কে আর অধিক নিজেকে রাঙিয়ে নিতে পারেন এবং এই হেতুই শত্রুমিত্রনির্বিশেষে তিনি সবার জন্যই প্রেম, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অত্যুত্তম আদর্শ, সবার জন্যই রাহমাতুল্লিল আলামীন!■

www.bjilibrary.com

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও
দক্ষ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে কম খরচে

ই.আর.সি.পি. (ERCP)

করার সুযোগ

ই.আর.সি.পি. কেন করাবেন?

- অগ্ন্যাশয় এবং পিত্তনালীর যে কোন রোগ নির্ণয়ে
- পিত্তনালীর পাথর অপসারণ এবং পিত্তনালীর কৃমি অপসারণে
- পিত্তনালীর ক্যান্সার হলে পিত্তের সচল গতিপথের জন্য টিউব বসাতে

IBN SINA

ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড ইমেজিং সেন্টার

বাড়ি-৪৮, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন-৯১২৮৮৩৫-৭, ৯১২৬৬২৫-৬, ০১৭১৭৩৫১৬৩১

www.bjilibrary.com

রাহমাতুল্লিল আলামীন

ড. আসকার ইবনে শাইখ

[বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও বাংলা নাট্যজগতের পথিকৃৎ ড. আসকার ইবনে শাইখ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ। 'সীরাত স্মারকের' জন্য তাঁকে লেখার অনুরোধ জানালে তিনি এই অসামান্য লেখাটি 'সীরাত স্মারকে' প্রকাশের জন্য দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি স্মারকটি দেখে যেতে পারলেন না। কারণ 'সীরাত স্মারক' প্রকাশের পূর্বেই তিনি গত ১৮ই মে, ২০০৯ সোমবার ইন্তিকাল করেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। —সম্পাদক]

www.bjilibrary.com

ইসলাম সম্বন্ধে প্রচলিত ভাষ্য মতে হযরত আদম [আ] থেকে হযরত ঈসা [আ] পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাজার, মতান্তরে ২ লাখ ২৪ হাজার নবী-রাসূল এই দুনিয়ায় তশরীফ এনেছেন। তশরীফ এনেছেন যাঁর যাঁর জাতির কাছে কিংবা নির্দিষ্ট কোন জনপদবাসীর কাছে তৌহিদের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য, মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। কিন্তু হযরত ঈসা [আ]-এর প্রায় ৫৭০ বছর পর ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এ দুনিয়ায় তশরীফ আনলেন সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য, গোটা মানব জাতির জন্য, সকলকে জীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথ দেখাবার জন্য। আমাদের সাইয়্যেদ আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর অনন্যতা এখানেই।

এখানে একটি বিষয়ে আলোচনায় শুরুতেই পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আর তা হলো : হযরত আদম [আ] থেকে হযরত ঈসা [আ] পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, সবারই প্রতি ঈমান আনার বা বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ রয়েছে ইসলামের সর্বশেষ এবং সকল নবী-রাসূলের নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর ইসলাম অনুসারীদের ওপর। ঈমান আনয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে অতীতের সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের কিতাবের [ঐশী] ওপর ঈমান আনতে বলা হয়েছে যাতে করে তৌহিদভিত্তিক দীন হিসেবে আমাদের নবীজী [সা]-প্রবর্তিত ইসলামী রূপকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলে স্বীকৃতির সঙ্গে এর আগেকার ধর্মগুলোকেও অপূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

আর একটি কথা। ইসলামের মহানবী [সা]-এর আবির্ভাবকাল, বিশেষজ্ঞদের মতে আবির্ভাব-পূর্ব শতবর্ষ 'আইয়্যামে জাহেলিয়া' বলে চিহ্নিত, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় The age of ignorance বা অজ্ঞতার যুগ। Ignorance-এর আভিধানিক অর্থ অজ্ঞানতা, মূর্খতা, শিক্ষাহীনতা। এই তিনটি শব্দেই ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করা বা তুচ্ছ করা কিংবা বাতিল করার অথবা প্রত্যাখ্যান করার মনোবৃত্তিটা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবেই ভাল কোন কিছুকে গ্রহণ করবে না, এমনি একটা মনোভাব রয়েছে, দোষমুক্তভাবে ভাল কোন কিছু না জানার কথা নেই। নবীজী [সা]-এর আবির্ভাবের আগে শতবর্ষকাল আরবে ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জনপদে এই অজ্ঞানতার যুগ বিদ্যমান ছিল। এর অর্থ কিন্তু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বা এলাকায় মানুষের কোন সভ্যতা-সংস্কৃতিহীনতা নয়। এর মর্মার্থ হচ্ছে : জ্ঞান বা সভ্যতা সাংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও সৎ জীবন বা মানবতাবাদী জীবনাচারের প্রতি অবজ্ঞাপ্রসূত নৈতিকতাবর্জিত অজ্ঞানতা।

আরব তথা সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রীয় এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রলেখার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়ার আগে সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিয়ে কিছু কথা বলে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। ঐতিহাসিক টয়েনবি পৃথিবীর ইতিহাসকে বিভিন্ন সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ক্রমবিকাশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে মানবেতিহাসের বিভিন্ন সংস্কৃতি বা কৃষ্টির বেশি সমরূপী বা সমপ্রকৃতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে তার সংশ্লিষ্ট উদ্ভব ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট; কিন্তু ভৌগোলিকভাবে সংযুক্ত এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সমন্বয়ে কোন এক সভ্যতা গড়ে ওঠে বলে সভ্যতার উদ্ভব

www.bjilibrary.com

ক্ষেত্র অনেক বেশি বৃহদায়তনবিশিষ্ট এবং একই কারণে তা অনেকটাই অসমরূপী বা অসমপ্রকৃতিসম্পন্ন এবং এ বক্তব্যের নিরিখে পৃথিবীর ইতিহাসকে ক্ষুদ্রায়তনভিত্তিক বিভিন্ন সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ক্রমবিকাশ না বলে বরং তাকে বিভিন্ন সভ্যতার ক্রমবিকাশ বলে আখ্যায়িত করাই অনেকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।

ক্রমসমন্বয় ও ক্রমবিবর্তন এবং উত্থান-পতনের অনিবার্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসের অভিযাত্রা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বা একই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে নানা জাতের মেধা ও প্রতিভার অবদানে গড়ে ওঠে নিজেদের সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। আর আগেই বলা হয়েছে, সেসব বিশেষ সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কোনো এক সভ্যতা। এভাবেই একদা সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যবিলনীয়, আসিরীয় ও কালদীয় সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সেমিটিক সভ্যতা, ইতিহাসে যা মেসোপটেমীয় সভ্যতা নামে অভিহিত; গড়ে উঠেছিল মিসরীয় সভ্যতা, গ্রেকোরোমান বাইজানটাইনীয় তথা হেলেনীয় সভ্যতা এবং ভারতীয় ও চীনা সভ্যতাসহ পৃথিবীর আরও আরও সভ্যতা।

সমন্বয় কিন্তু শুধু সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, সমন্বয় ঘটে সভ্যতার ক্ষেত্রেও। কাল প্রবাহে মানুষের সভ্যতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া যেন ছোট বড় স্রোতধারার সংমিশ্রণে বৃহদাকার নদী সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মতোই। নদীর সাগর-সঙ্গমে মিলিত হওয়ার প্রয়াসের মতোই যুগ-যুগান্তরের বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যুগ-যুগান্তরের বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণ-সমন্বয় যেন মহামানবতার পুণ্যাত্মায় মিলিত হওয়ার লক্ষ্যেই মানুষের চিরন্তন প্রয়াস।

কালে-কালে বহু ধারার সম্মুখীন হয়েছে এ প্রয়াস, সম্মুখীন হয়েছে অনেক বিপথগামিতার। যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস রক্তাক্ত হয়েছে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির সংঘর্ষে এক দেশের বিরুদ্ধে অন্য দেশের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায়। সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রযাত্রা স্তব্ধপ্রায় হয়েছে উচ্চাভিলাষী রক্তপিপাসু দিগ্বিজয়ীর গণহত্যায়। তবুও নীরবে নিভৃতে মানুষের আশা নতুন ভোরের প্রত্যাশায় কাটিয়েছে অন্ধকার রাত। আবার এগিয়েছে মহাকালের রথ। সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষের ইতিহাস পারস্পরিক হানাহানির ইতিহাস, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস, একের ওপর অন্যের রক্তক্ষয়ী প্রাধান্য বিস্তারের ইতিহাস। তবুও এই রক্তারক্তি হানাহানির মাঝেও লোকচক্ষুর অন্তরালে রচিত হয়ে চলেছে মানব সভ্যতার পরবর্তী স্তর। এই-ই হচ্ছে ইতিহাসের সত্য। হযরত আদম [আ] থেকে আরম্ভ করে হযরত ঈসা [আ] পর্যন্ত মানবেতিহাসের সুদীর্ঘ অভিযাত্রার বাঁকে বাঁকে রয়েছে এ সত্যেরই স্বাক্ষর।

পবিত্র আল কুরআনের সূরা আরাফের ১৭২ ও ১৭৩ নম্বর আয়াত : "স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদিগের নিজদিগের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি?' তাহারা বলে, 'নিশ্চই, আমরা সাক্ষী রহিলাম।' [এই স্বীকৃতি গ্রহণ] এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম' কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদিগের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদিগের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর; তবে কি

www.bjilibrary.com

মিথ্যাশ্রয়ীদিগের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে?'... ।" দুনিয়ায় এসে স্রষ্টার কাছে সৃষ্ট মানুষ এই অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করেনি, শিরক করেছে, ধ্বংস হয়েছে, সৃষ্টি করেছে মানুষের উত্থান-পতনের ইতিহাস। তৌহিদের বিপরীতে শিরকের পথভ্রান্তিই সে ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে চালিকাশক্তি।

ইতিহাসের এই উত্থান-পতন প্রক্রিয়ায় মিসর, গ্রীক, কালদানীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বিগত কালের ঘটনায় পরিণত হয়েছে; বিলুপ্ত হয়ে গেছে আরবের চারদিগন্ত বিভিন্ন রাজ্য। ভারতবর্ষের অবস্থাও তখন চরম নৈরাজ্যজনক, ব্রাহ্মবাদ ও বৌদ্ধবাদের মধ্যে চরম হানাহানি। পৃথিবীতে বিদ্যমান তখন দু'টি প্রধান শক্তি; তার একটি পারস্য শক্তি, অপরটি রোমান শক্তি। পারস্যের ধর্মীয় রীতি ছিল অগ্নি-উপাসনা। এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিলো ইরাক থেকে ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত। আর রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিলো তদানীন্তন পৃথিবীর তিনটি মহাদেশেই– এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায়। রোমানরা প্রথমে ছিলো প্যাগান, প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। পরে তারা এসে যায় খ্রিস্ট ধর্মের আওতায়, ক্রমে ক্রমে নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে-পড়ে। ইহুদীরাও এর আওতায় থেকে এক নড়বড়ে অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান ছিলো। পথভ্রান্ত ইহুদিরা দুনিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে ততদিনে ধনসম্পদ অর্জনকেই করে নিয়েছিল জীবনের একমাত্র কাম্য ও করণীয় কর্তব্য।

আর এই সময়টায় রোমান শক্তির অবস্থাও শোচনীয়তার পথে ধাবমান। এমনি অবস্থায় সে ধ্বংস তাদের ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে গথ-ভ্যান্ডাল-মোঙ্গোল প্রভৃতি বর্বর জাতির আক্রমণে। এ আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত হয়ে যায় সব কিছুই। সেটা পঞ্চম শতকে; এবং এই বিপর্যয়ের ফলে সেখানে আরম্ভ হয় শতাব্দীব্যাপী এক তামস যুগ। তখনই রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এক নব রূপ লাভ করে।

এরপর পারস্যের কথা, যার সংস্কৃতি এককালে খ্যাতির শীর্ষে ছিল অবস্থিত, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সেই সাসানীয় শান-শওকত এবং কায়ানী জৌলুস ও প্রতাপ সব কিছু হারিয়ে কোনো রকমে টিকে ছিলো মাত্র। ওই সময়ে পারস্যে আবির্ভূত হন ধর্মজ্ঞ জরথুস্ত্র। তিনি এসে আলো ও আঁধার, ভাল ও মন্দের জন্য ইয়াজদান ও আহরমান নামে দুই খোদার সন্ধান দেন এবং অগ্নিকে করেন মানুষের উপাস্য। পরবর্তীকালে খ্রিস্ট ও জরথুস্ত্রী মতবাদের সংমিশ্রণে মানী নামক এক দার্শনিক জন্ম দেন এক অভিনব মতবাদের। সেই মতবাদ মানীয় মতবাদ বলে পরিচিত হয়। এর শিক্ষা ছিলো : দুনিয়ার পাপ ও অন্যায়ের অবসানের জন্য প্রয়োজন পূর্ণ বৈরাগ্য, মানুষের বংশ বৃদ্ধির অবসান। বৈবাহিক সম্পর্ককে তিনি নিষ্প্রয়োজন বলে প্রচার করেন। ফলে যা হবার তাই হতে লাগল সমাজে। পুরাপুরি অনাচার।

আরবের আইয়্যামে জাহেলিয়ার কালে তার সমসাময়িক বিভিন্ন জাতি ও জনপদের রাষ্ট্রীয়-নৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো। এর থেকে আমরা জানলাম যে, ঐ সময়ে জ্ঞানবুদ্ধিতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও নৈতিকতার দিক দিয়ে

www.bjilibrary.com

সকল দেশের মানুষই ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তেমনি যুগে মানুষের আদি মাতৃভূমি খোদ আরবের অবস্থা তখন কেমন ছিল?

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ ইসলামের লীলাভূমি সেই আরব ভূখণ্ড, জাজিরাতুল আরব এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার সঙ্গমস্থলের কেন্দ্রভূমি। এই উপদ্বীপের বেশির ভাগ অধিবাসীই যাযাবর, বেদুঈনদের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বপুরুষদের অনৈতিক রীতিনীতির প্রতি তারা ছিল খুবই শ্রদ্ধাশীল।

আর আইয়্যামে জাহেলিয়ার ওই আরবদের নৈতিক অবস্থা কেমন ছিলো? এক কথায়, ভয়াবহ। পাপাচার, দুর্নীতি-কুসংস্কার-অরাজকতা-ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান ও নিন্দনীয় কার্যকলাপে কলুষিত ও অভিশপ্ত হয়ে পড়েছিল আরবদের জীবন। সুরা-নারী-যুদ্ধ এসব ছিলো তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার! মূর্খতা-বর্বরতা প্রকৃতি পূজায় তারা ছিলো সদা-নিমজ্জিত। কোথাও শান্তি নেই, মানবতা বলতে কোথাও কিছু নেই। নারীদের মর্যাদা নেই, দেশে অনেক পিতা অপমানে লজ্জায় কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়, দাস-দাসীদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন।

পৃথিবীর নানা রাজ্য-সাম্রাজ্য জনপদে এবং আরব দেশে বিরাজমান রাষ্ট্রীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের এই পরিবেশ কি স্মরণ করিয়ে দেয় না সে এহেন অসহনীয় চরম অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছিল এই মাটির পৃথিবী ও তার মানুষ? মুক্তি পেতে চেয়েছিল তারা? সর্বাঙ্গীণ জীবনের মুক্তি! অধীর আগ্রহে নিজেরই অজান্তে চেয়েছিল কোন প্রকৃত শান্তিদূতের আগমন!

অবশেষে, সেই অধীর চাওয়ার শেষেই তিনি, সেই শান্তিদূত তশরীফ আনলেন এই মাটির পৃথিবীতে! তশরীফ আনলেন তিনি 'সিরাজাম মুনীরা'রূপে, প্রদীপ চেরাগরূপে! আল্লাহর রহমতরূপে!

আশ্চর্য! তাঁর তশরীফ আনার মাস দিন এবং বিদায় নেয়ার মাস দিন ক্ষণ ঠিক এক, পার্থক্য শুধু ৬৩ বছর ব্যবধানের দু'টি অব্দের! জন্ম : ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের ক্ষণে মক্কা মুয়াজ্জামায়; ওফাত : ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার ফজরের ক্ষণে মদীনা মুনাওয়ারায়! তাঁর এই ৬৩ বছরের জীবনে তিনি মানুষের এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীরও সকল অধীর প্রত্যাশা যেন পূরণ করেছিলেন!

আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম [আ]-এর বংশধারায় উদ্ভূত আরবের সর্বসম্মানিত কোরায়েশ খান্দানের হাশিমী গোত্রে আমাদের নবীজীর জন্ম। পিতার নাম আবদুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা; দাদার নাম আবদুল মুত্তালিব [শায়রা] যিনি আবদুল মান্নাফের অন্যতম পুত্র হাশিমের সন্তান অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। আমাদের রাসূল [সা] যখন মায়ের রেহেমে তখন তাঁর আব্বা আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন, ধাত্রীমাতা বিবি হালিমা সাদীয়ার কাছে প্রতিপালক ৪ বছর বয়সে ফিরে আসেন আম্মা আমিনার বুকে, অত:পর ৬ বছর বয়সে হারান সেই আম্মাকেও,

www.bjilibrary.com

প্রতিপালিত হতে থাকেন দাদা আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে এবং দাদার ইন্তিকালের পর চাচা আবু তালিবের অভিভাবকতায়। বিবাহ ২৫ বছর বয়সে বিবি তাহিরা খাদীজাতুল কুবরার সঙ্গে [যিনি ছিলেন ৪০ বছর বয়সের এক ধনাঢ্য বিধবা], আরও ১৫ বছর পর ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তি এবং বাকি ২৩ বছর নবুয়তের কঠোর-কঠিন দায়িত্ব পালন– দুই পর্যায়ে : মক্কা পর্যায়ে ১৩ বছরের মতো, মদীনা পর্যায়ে সাড়ে ১০ বছরের মতো।

নবুয়ত-পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষার্থী এবং পরবর্তী দু'টি জীবনে [মক্কী ও মাদানী জীবনে] শিক্ষক। শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি আল্লাহরই পাঠাগারে যা ছিল বিচিত্র-চরিত্র মানুষের মেলসম্পন্ন এই বিশ্ব প্রকৃতি যেখানে আগত দিনগুলোতে প্রাপ্তব্য ওহীর দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ পাক নিজ তত্ত্বাবধানে লালন করেছেন, নানা শিক্ষায় দীক্ষিত করেছেন, সন্ধান দিয়েছেন মহাসত্যের পথে চলমান এক সদা-ইনকিলাবী জীবনের, এক সুন্দরতম আদর্শের।

সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল এই শিক্ষার্থীর চল্লিশটি বছরে যে মহামূল্য অর্জন, তাতে তাঁর চরিত্রে সুগ্রথিত হয় বিভিন্ন গুণ, সংকল্পে দৃঢ়তা, সাধনার অদম্যতা, অনুভূত সত্যে কায়েম থাকার সাহসিকতা, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, কৃতজ্ঞতা, তকদীরে সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিনয়-বদান্যতা ইত্যাদি। ব্যবহারিক জীবনে এসব শিক্ষা তিনি পেয়েছেন হাতে-কলমে, নানা কর্মকাণ্ডভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমস্যাপীড়িত মানুষের মধ্য থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলা নিয়ে দূর-অদূর দেশ-দেশান্তরে গমন করে।

অত:পর শিক্ষার্থী জীবনের অবসানে হেরা গুহায় নাযিল হয় আল্লাহর প্রথম ওহী। নবী অভিধায় ভূষিত হন ইসলামের নব রূপায়ণকারী হযরত মুহাম্মাদ [সা]। আরম্ভ হয় তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব নির্দিষ্ট কোন দেশ বা জাতির নবীত্বের স্থলে বিশ্বনবীত্বের দায়িত্ব। ইসলামের মহানবী [সা] অত:পর অগ্রসর হন সেই বিশ্ববিপ্লবের পথেই। বিশ্বের প্রথম সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব! এর রূপায়ণ পর্যায়ে বহুধা-বিচ্ছিন্ন আরব ভূখণ্ড জাতি-গোত্র-নির্বিশেষ এক পূর্ণাঙ্গ জাতিতে পরিণত হয়। তারপর সেই জাতি অগ্রসর হয় বিশ্ব বিপ্লবের পথে।

এ বিপ্লবের রূপরেখা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কামিয়াব হয়েছিলেন ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]। জীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিকামী ইসলামী ইনকিলাবকে পরম আগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল দেশ-দেশান্তরের অগণিত মানুষ। পৃথিবীর বুকে ঘটেছিল তার বিস্ময়কর বিস্তার! পবিত্র আল কুরআনের বর্ণনা অনুসারে যাঁর জীবনই হচ্ছে এক 'উসওয়াতুন হাসানাহ' বা সুন্দরতম আদর্শ, তাঁকে কোনো একক দেশ বা জাতির জন্য নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমাতুল্লিল আলামীনরূপে প্রেরণ করেছিলেন। রহমাতুল্লিল আলামীন বিশ্বজগতের জন্য রহমত!■

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহর [সা] আনুগত্য ও অনুসরণ

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

রাসূলুল্লাহর [সা] জীবদ্দশায় তাঁর আনুগত্যের অপরিহার্যতা

রাসূলুল্লাহর [সা] জীবনকালে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত আল কুরআনের মাধমে শরী'আতের বিধি-বিধান লাভ করতেন। অনেক সময় কুরআনের আয়াত নাযিল হতো সংক্ষিপ্ত ও সাধারণভাবে। যেমন সালাতের বিষয়টি। কুরআনে সম্পর্কিত হুকুম ছিল সংক্ষিপ্ত। রাক'আতের সংখ্যা, অবস্থা, সময় ইত্যাদি বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা ছিলো না। তেমনি যাকাতের হুকুমও ছিলো সাধারণভাবে। কী পরিমাণ অর্থে যাকাত ফরয হবে তার কোনো ব্যাখ্যা ছিলো না, ছিলো না অন্যান্য শর্তের কথা। এ ধরনের বহু হুকুম এমন ছিলো যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া তার ওপর আমল করা সম্ভব ছিলো না। এ কারণে সাহাবায়ে কিরামকে [রা] অবশ্যই রাসূলুল্লাহর [সা] শরণাপন্ন হতে হয়েছে। তেমনিভাবে এমন বহু ঘটনা ও প্রেক্ষাপট ছিল কুরআন সে বিষয়ে কিছু বলেনি। সে বিষয়ে বিধান জানার জন্য রাসূলুল্লাহর [সা] কাছে যেতে হয়েছে। কারণ তিনি তো তাঁর রবের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাতা হিসেবে এসেছেন। সুতরাং তিনিই ভালো জানেন আল্লাহর শরী'আতের উদ্দেশ্যাবলী, সীমা-সরহদ, পদ্ধতি ও লক্ষ্যসমূহ ইত্যাদি। নিম্নে কুরআন ও হাদিসের আলোকে অতি সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহর [সা] প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরা হলো :

www.bjilibrary.com

১. কুরআনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর [সা] দায়িত্ব ছিল ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারের। আল্লাহ্ বলেন :[১]

"এবং আমরা তোমার ওপর এই যিকির [কুরআন] নাযিল করেছি যাতে তুমি লোকদের তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার যা তাদের উদ্দেশে নাযিল করা হয়েছে যাতে তারা চিন্তা করে।"

২. মানুষ যখন কুরআনের মর্ম ও ভাবের ব্যাপারে মতপার্থক্যের সৃষ্টি করবে তখন তিনি ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করবেন। আল্লাহ্ বলেন :[২]

"আমরা তো তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।"

৩. পারস্পরিক মতবিরোধের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত, মত ও ব্যাখ্যা মানুষের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :[৩]

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনো মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক মতবিরোধের মীমাংসার ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে, অত:পর তুমি যে সিদ্ধান্ত দেবে সে সম্পর্কে নিজেদের মনে দ্বিধা অনুভব না করে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।"

এ আয়াত তাঁকে এমন একজন বিচারপতি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, যাঁর নিকট মীমাংসার জন্য রুজু হওয়া এবং যাঁর সিদ্ধান্ত শুধু বাহ্যত নয়, বরং আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ঈমানের শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন যে, রাসূল [সা] যাতে মানুষকে তাদের দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে পারেন সেজন্য তাঁকে আল কুরআন ও আল হিকমাহ্ দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :[৪]

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলো।"

জামহুর আলিম ও কুরআন বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, আয়াতে উল্লিখিত হিকমাহ হলো কিতাব তথা কুরআন থেকে ভিন্ন একটি জিনিস। আর তা হলো আল্লাহ তাঁর রাসূলকে [সা] দীনের যে সকল গোপন বিষয় ও শরী'আতের বিধি-বিধান অবহিত করেছেন তাই। আর আলিমগণ তাকে আস-সুন্নাহ্ বলে অভিহিত করে থাকেন। ইমাম আশ শাফি'ঈ [রহ] বলেন :[৫]

"আল্লাহ "আল কিতাব" উল্লেখ করেছেন, সেটা হলো আল কুরআন, তিনি "আল হিকমাহ্" উল্লেখ করেছেন। আমি শ্রেষ্ঠ আল কুরআন বিশেষজ্ঞদের বলতে শুনেছি, আল হিকমাহ্ হলো রাসূলুল্লাহর [সা] সুন্নাহ। আমি যা বললাম, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, তাঁরা

www.bjilibrary.com

যা বলেন, তারই কাছাকাছি কথা। কারণ আল কুরআন উল্লেখের পরই আল হিকমাহ্ এসেছে। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ্ শিক্ষা দানের অনুগ্রহের কথা বলেছেন। সুতরাং এখানে আল হিকমাহ্ অর্থ রাসূলুল্লাহর [সা] সুন্নাহ ছাড়া আর কিছু বলা সঙ্গত হবে না। কারণ আল হিকমাহ্ শব্দটি আল কিতাবের সাথে সংযুক্তভাবে এসেছে। তা ছাড়া আল্লাহ তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ফরয করেছেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধ মানা অপরিহার্য করেছেন। সুতরাং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ [সা] ফরয হওয়ার কথা ছাড়া আর কোন কিছু বলা সঙ্গত হবে না। যেমন আমরা বলেছি, আল্লাহ্ তাঁর ওপর ঈমান আনার সাথে তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের কথাও বলেছেন।"

ইমাম আশ শাফি'ঈ [রহ] আয়াতে উল্লিখিত আল-হিকমাহ্ দ্বারা যে সুন্নাহ বোঝায় সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কারণ আল্লাহ আল হিকমাহ্কে আল কিতাবের ওপর 'আত্ফ অর্থাৎ সংযোগ অব্যয়ের মাধ্যমে যুক্ত করেছেন। ফলে দু'টি যে ভিন্ন জিনিস তা বোঝা যায়। আর তা কেবল সুন্নাহ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দানের যে অনুগ্রহের কথা বলেছেন, তার মুধ্যে সুন্নাহও একটি। আর সত্য ও সঠিক জিনিস ছাড়া আল্লাহর অনুগ্রহ হতে পারে না। সুতরাং আল কুরআনের মতো সুন্নাহর আনুগত্য-অনুসরণও ওয়াজিব। আমাদের ওপর কেবল আল কুরআন ও রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণ ওয়াজিব। অতএব, একথা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হিকমাহ্ হলো আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর [সা] যে সকল কথা ও সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে, তাই।

৫. ব্যাপারটি যখন এরূপ, তখন রাসূলকে [সা] যে আল কুরআন ও সেই সাথে অন্য যে জিনিসটি দান করা হয়েছে তার আনুগত্য ওয়াজিব। আল-কুরআনে রাসূলের [সা] পরিচয় দিতে গিয়ে সে কথা স্পষ্টভাবে এসেছে এভাবে :[৬]

"সে [নবী] তাদেরক সৎ কাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে, তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ বৈধ করে এবং কলুষ জিনিসসমূহ নিষিদ্ধ করে।"

যেহেতু আয়াতে উল্লিখিত শব্দসমূহ 'আম" বা ব্যাপক অর্থবোধক সেহেতু হারাম-হালালের গণ্ডিও হবে ব্যাপক। এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, তাঁকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন এবং তাতে তাঁর ক্ষমতাকে শুধু কুরআনিক বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পর্যন্ত সীমিত করার কোনো শর্ত নেই। আর এ কথারই প্রতিধ্বনি করে হযরত মিকদাদ ইবন মা'দিকারাব [রা] থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর [সা] হাদিসটি। তিনি বলেন :[৭]

"তোমরা জেনে রাখ, আমাকে আল-কিতাবের অনুরূপ আরেকটি জিনিস দেয়া হয়েছে।"

৭. আল্লাহ্ বলেন :[৮]

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলে তা থেকে বিরত থাকো।"

www.bjilibrary.com

এ আয়াতেও এমন কোন শর্ত নেই যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, তিনি কুরআনের আয়াতের আকারে যা কিছু দেন কেবল তাই গ্রহণ কর।

কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলের আনুগত্যের কথা এসেছে। যেমন :

৮. [৯]"আমরা রাসূলকে এই উদ্দেশেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে।"

৯. [১০]"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে।"

১০. [১১]"তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তাহলে সৎ পথ পাবে।"

১১. [১২]তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহ আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয় এবং এখানেও এমন কোন ইঙ্গিত মোটেই নেই যে, তিনি আমাদেরকে যে নির্দেশ কুরআনের আয়াতের আকারে দেবেন, কেবল সেসব নির্দেশেরই আনুগত্য করতে হবে।

১২. আল্লাহ বলেন :[১৩]

"হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে।" এ আয়াতে রাসূলের আহ্বানে সাড়া দানের জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৩. আল্লাহ বলেন :[১৪]

"বল [হে রাসূল], তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন "ফাত্তাবিউ কিতাবাল্লাহ"-এর পরিবর্তে "ফাত্তাবিউন" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় রাসূলের অনুসরণকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বলে গণ্য করা হয়েছে।

১৪. রাসূলে করীমের [সা] আদেশ অমান্য বা তাঁর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে এভাবে :[১৫] 'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করবে না: তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ তো তাদের জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি।"

১৫. মু'মিনদেরক রাসূলের সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধাচরণের মোটেই সুযোগ বা অনুমতি দেয়া হয়নি।

আল্লাহ বলেন :[১৬]

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"

www.bjilibrary.com

১৬. রাসূলুল্লাহর [সা] সঙ্গে থাকাকালে তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে না যাওয়া ঈমানের অনুষঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে :[১৭]

"মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত কোনো ব্যাপারে একত্র হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না; যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব, তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ইমাম ইবন কায়্যিম আল-জাওযী [রহ] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :[১৮]

"মুমিনগণ রাসূলের সঙ্গে থাকাকালে তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে না যাওয়াকে যখন ঈমানের অনুষঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তখন ঈমানের অনুষঙ্গ হওয়ার জন্য এটা আরো বেশি উপযুক্ত যে, তারা রাসূলের অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বা মতবাদের দিকে যাবে না, আর তাঁর অনুমতি জানা যাবে তিনি যা নিয়ে এসেছেন এবং তাতে দেয়া তাঁর অনুমতির ভিত্তিতে।"

১৭. আল্লাহ বলেন :[১৯]

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হবে না এবং আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল তার সাথে সেভাবে উঁচু স্বরে কথা বলবে না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন কায়্যিম [রহ] বলেন, "রাসূল না বলা পর্যন্ত তোমরা বলবে না, নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নির্দেশ দেবে না, ফাতওয়া না দেয়া পর্যন্ত ফাতওয়া দেবে না, তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তোমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।" আলী ইবনে আবী তালহা ইবনুল 'আব্বাস [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন :

"কিতাব ও সুন্নাহপরিপন্থী কোন কথা বলবে না।" আল-'আওফী ইবনুল 'আব্বাস [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

"তাঁর [রাসূল] কথার আগের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।" আয়াতের মূল কথা হলো, রাসূল [সা] কোনো কথা বলা অথবা কোনো কাজ করার আগে তোমরা তাড়াহুড়ো করে কোনো কথা বলবে না অথবা কোন কাজ করবে না।

দ্বিতীয় আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবন কায়্যিম [রহ] বলেন :

"যখন রাসূলের কণ্ঠস্বরের চেয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা তাঁদের কর্ম নিষ্ফল হওয়ার কারণ তখন তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার বিপরীত ও অতিরিক্ত মতামত, বুদ্ধিবৃত্তি, রুচি, স্বাদ-আহ্লাদ ও জ্ঞান-গরিমার অবস্থা কেমন হবে? এগুলো কি তাঁদের কর্ম নিষ্ফল হওয়ার জন্য অধিক উপযোগী নয়?"[২০]

www.bjilibrary.com

উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং এ রকম আরো বহু আয়াতের কারণে সাহাবায়ে কিরামের [রা] জন্য রাসূলুল্লাহর [সা] শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য ছিল। তিনি তাঁদের নিকট কুরআনের আহ্‌কাম ব্যাখ্যা করতেন, জটিল বিষয়গুলো সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁদের পারস্পরিক মতপার্থক্য দূর করতেন, তাঁদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন। সাহাবায়ে কিরাম ও রাসূলুল্লাহর [সা] আদেশ-নিষেধের সীমা যথাযথভাবে মেনে চলতেন এবং তাঁদের জানা মতে রাসূলুল্লাহর [সা] সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত কাজ ছাড়া তাঁর সকল কাজ, ইবাদত ও আচরণ হুবহু অনুসরণ করতেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর [সা] এই আদেশ মেনে সালাতের হুকুম-আহকাম, আরকান ও সার্বিক অবস্থা রাসূলুল্লাহর [সা] সালাত থেকে গ্রহণ করতেন। তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহর [সা] নির্দেশ অনুসারে তাঁরা হজ্জের বিধি-বিধান ও নিয়ম-রীতি তাঁর থেকেই গ্রহণ করেন। তিনি যখন জানতেন কোন সাহাবী তাঁকে কোন কাজে অনুসরণ করছেন না তখন অসন্তুষ্ট হতেন। যেমন, একবার একজন সাহাবী সাওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার ব্যাপারে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট পাঠান। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা [রা] উক্ত মহিলাকে জানান যে, রাসূল [সা] সাওম অবস্থায় তাঁর বেগমদের চুমু দেন। মহিলাটি ফিরে গিয়ে তাঁর স্বামীকে বিষয়টি অবহিত করেন। স্বামী মন্তব্য করেন :

"আমি রাসূলুল্লাহর [সা] সমকক্ষ নই। আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য যা ইচ্ছা হালাল করতে পারেন।"

কথাটি রাসূলুল্লাহর [সা] কানে গেল। তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন :

"আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তাঁর বিধি-বিধানের সীমা-সরহদসমূহও তোমাদের চেয়ে বেশি জানি।" তেমনি তিনি যখন সাহাবায়ে কিরামকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মাথা ন্যাড়া করতে ও ইহরাম ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা তা করলেন না তখন তিনি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই যখন দ্রুত ইহরাম ভেঙে ফেলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম [রা]-ও দ্রুত তাঁকে অনুসরণ করে হালাল হয়ে যান।

এ কথাও জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম [রা] রাসূলকে [সা] যা করতে দেখতেন তাই করতেন, যা বর্জন করতে দেখতেন, বর্জন করতেন। রাসূলুল্লাহর [সা] এই করা বা না করার কারণ বা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা জানা প্রয়োজন মনে করতেন না। ইমাম আল-বুখারী [রহ] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন উমর [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] একটি সোনার আংটি ধারণ করেন, তা দেখে লোকেরাও সোনার আংটি ধারণ করে। অত:পর তিনি তা খুলে ফেলে বলেন, 'আমি আর কখনো এটি পরবো না।' লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে।

কাজী আয়াদ তাঁর 'আশশুফা' গ্রন্থে আবু সা'ঈদ আল-খুদরী [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] সাহাবীদের সঙ্গে সালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ সে অবস্থায় জুতা খুলে বাম পাশে রেখে দেন। তা দেখে সাহাবীগণও তাঁদের জুতা খুলে ফেলেন। সালাত শেষ করে রাসূল [সা] বলেন : তোমরা জুতা খুললে কেন? তাঁরা

www.bjilibrary.com

বললেন : আমরা আপনাকে জুতা খুলতে দেখেছি তাই আমরাও খুলেছি। তিনি বললেন : জিবরাইল আমাকে অবহিত করেন যে, আমার জুতা জোড়ায় নাপাকি আছে।[২১]

ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ [সা] মুসলিমদের সঙ্গে যোহরের সালাত দু'রাক'আত আদায় করেন। তারপর তাঁকে আল-মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করার নির্দেশ দান করা হয়। তিনি সেদিকে ঘুরে দাঁড়ান এবং মুসলিমদের সকলে তাঁর সাথে ঘুরে যান।[২২]

সাবাহায়ে কিরাম [রা] কেবল পরকালীন বিষয়ের আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মানতেন তাই নয়, বরং পার্থিব বিষয়েও তাঁর আদেশ একই রকম মানতেন। যেমন ইবন মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে। এক জুমআর দিনে তিনি মাসজিদে এলেন। তিনি যখন দরজায়, দেখলেন রাসূল [সা] খুতবা দিচ্ছেন। তাঁর কানে ভেসে এলো রাসূলুল্লাহর [সা] আদেশ, 'তোমরা সকলে বসে পড়।' এ আদেশ কানে যেতেই তিনি মাসজিদের দরজায় বসে পড়েন। তাঁর এ অবস্থা রাসূলুল্লাহর [সা] দৃষ্টিতে পড়ে। তিনি ডাক দেন :

'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ! চলে এসো।'[২৩]

রাসূলে করীমের [সা] জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম [রা] এমনই ছিলেন। তাঁর সকল কথা, কাজ ও নীরব সমর্থনকে শর'ঈ বিধান বলে মানতেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত ছিলো না। তাঁদের কেউই কুরআনের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকে সঙ্গত মনে করতেন না। সাহাবায়ে কিরাম [রা] কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর [সা] সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন না।

তবে পার্থিব কোনো বিষয়ে রাসূলের [সা] স্বীয় চিন্তাপ্রসূত কোনো কথা বা কাজ হলে তাঁরা মতপার্থক্য করতেন। যেমন, বদর যুদ্ধের সময় আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির [রা] শিবির স্থাপনের স্থান নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। তেমনিভাবে কোন দীনি বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা আসার পূর্বে রাসূলের [সা] চিন্তা-অনুধ্যানপ্রসূত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তাঁরা দ্বিমত পোষণ করতেন। যেমন করেছিলেন উমর [রা] বদর যুদ্ধে বন্দীদের ও হুদাইবিয়ার সন্ধির ব্যাপারে। আর সাহাবায়ে কিরাম যদি বুঝতে পারতেন, কোন কাজ রাসূলে করীমের [সা] সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত তাহলে তাঁরা তা অনুসরণ করতেন না অথবা তাঁরা যদি বুঝতেন রাসূলের [সা] কোন আদেশ করা বা না করা ঐচ্ছিক ব্যাপার তাহলে তাঁদের অনেকে তা অনুসরণ করতেন না। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম [রা] রাসূলে করীমের [সা] পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করতেন।

রাসূলুল্লাহর [সা] ইনতিকালের পর তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ ওয়াজিব

রাসূলে করীমের [সা] জীবদ্দশায় কুরআনের নির্দেশক্রমে সাহাবায়ে কিরামের [রা] ওপর তাঁর ইত্তেবা ও অনুসরণ যেমন ওয়াজিব ঠিক তেমনিভাবে তাঁর ওফাতের পর মুসলিমদের ওপর তাঁর সুন্নাহর অনুসরণও ওয়াজিব। সাধারণভাবে যে সকল আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহর [সা] আনুগত্য-অনুসরণ ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, তা তাঁর জীবনকালকে সীমিত করে না। যেমনিভাবে কেবল সাহাবায়ে কিরামের [সা] সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্তও বোঝা যায় না, বরং পরবর্তীকালে মুসলিমদেরকও সন্নিবিষ্ট করে। কারণ,

www.bjilibrary.com

আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার যে মৌল কারণ তা সর্বকালের মানুষকে সন্নিবিষ্ট করে। আর তা হলো, সব যুগের মুসলিমই হলো এমন রাসূলের অনুসারী যাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, তেমনিভাবে যে কারণে তাঁর আনুগত্য করতে হবে তা তাঁর জীবনকালের মতো ওফাতের পরও বিদ্যমান। যেহেতু তাঁর কথা, কাজ ও আদেশ-নিষেধ এসেছে একজন নিষ্পাপ বিধানদাতা থেকে, যাঁর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সুতরাং তাঁর জীবনকাল ও ওফাতের পরের কালের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

কুরআন মজিদ সাক্ষী যে, তা [কুরআন] স্বয়ং একটি বিশেষ যুগে একটি বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও যেমন একটি বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী নির্দেশনামা, অনুরূপভাবে তার বাহক রাসূলও [সা] একটি সমাজে কয়েক বছর যাবৎ রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সত্ত্বেও গোটা মানব জাতির জন্য আজ পর্যন্ত ও অনাগতকাল পর্যন্ত পথপ্রদর্শক। যেভাবে কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে :[২৪]

"এই কুরআন আমার নিকট ওহি করা হয়েছে যাতে আমি এর সাহায্যে তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট তা পৌঁছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।"

আল কুরআনের বাহক রাসূল [সা] সম্পর্কেও বলা হয়েছে :[২৫]

"[হে মুহাম্মাদ] বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।"

"আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।"[২৬]

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীগণের শেষ।"[২৭]

এদিক থেকে কুরআন ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] পথনির্দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি সাময়িক ও সীমিত হয় তবে উভয়ই হবে, যদি বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী হয় তবে উভয়ই হবে। আমরা সবাই জানি ৬১০ খ্রিস্টাব্দে কুরআন নাযিল শুরু হয় এবং ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তার নাযিলের ধারাবাহিকতা শেষ হয়। আমরা আরো জানি যে, এই কুরআনের সম্বোধনকৃত লোক ছিল তৎকালীন আরব জাতি এবং তাদের অবস্থা সামনে রেখে তাতে পথনির্দেশ দান করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে : আমরা কিসের ভিত্তিতে এই পথনির্দেশকে সর্বকালের জন্য এবং আগত-অনাগত গোটা মানব জাতির জন্য হিদায়াতের উৎস বলে স্বীকৃতি দেই? এই প্রশ্নের যে উত্তর হতে পারে, নিম্নোক্ত প্রশ্নেরও ঠিক একই উত্তর হবে যে, এক ব্যক্তির নবুওয়াতী জীবন যা সপ্তম শতকে মাত্র ২৩টি বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা সর্বকালের জন্য এবং গোটা মানব জাতির জন্য কিভাবে পথ নির্দেশের মাধ্যম হতে পারে? যারা কেবল কুরআনের সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন হওয়ার প্রবক্তা, তারা আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের মধ্যে কিসের ভিত্তিতে পার্থক্য করে? কোন্ যুক্তিতে তারা কুরআনের পথনির্দেশ সাধারণ বা ব্যাপক এবং রাসূলের পথনির্দেশ সীমিত ও নির্দিষ্ট বলে?

www.bjilibrary.com

রাসূলে করীম [সা] তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর থেকে দূরে অবস্থানকারী মুসলিমকে, বিশেষত মু'আয ইবন জাবালকে [রা] ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁর থেকে দূরে অবস্থানকালে সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দেন। ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযী [রহ] ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে :[২৮]

"মু'আয ইবন জাবাল [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূল [সা] তাঁকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন : তোমার সামনে কোন বিরোধ দেখা দিলে তার ফায়সালা করবে কিভাবে? বললেন : আল্লাহর কিতাবে যা কিছু আছে তা দ্বারা আমি ফায়সালা করবো। রাসূল [রা] জানতে চাইলেন : যদি আল্লাহর কিতাবে সে বিষয়ে কিছু না থাকে? মু'আয [রা] বললেন: রাসূলুল্লাহর [সা] সুন্নাহ দ্বারা করবো। রাসূল [সা] আবার প্রশ্ন করেন : যদি রাসূলুল্লাহর [সা] সুন্নাহতেও কোন সমাধান না থাকে? মু'আয [রা] বললেন : তাহলে আমি আমার চিন্তা-অনুধ্যানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব এবং এ ব্যাপারে কোন রকম অলসতা করবো না। তাঁর এ জবাব শুনে রাসূল [রা] বললেন, সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আল্লাহর রাসূলের দূতকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করেছেন যাতে আল্লাহর রাসূল [সা] খুশি হন।"

রাসূলে করীমের [সা] ওফাতের পরও তাঁর সুন্নাহর ওপর আমল করা যে ওয়াজিব তা এত বেশি সংখ্যক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, তার ভাব মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছেছে। এখানে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :[২৯]

'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা তা শক্ত করে ধরে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"

'রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন : "আমার উম্মাতের প্রত্যেকে জান্নাতে যাবে, তবে যে অস্বীকার করবে সে ছাড়া। লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অস্বীকার করবে? বললেন : যে আমার আনুগত্য করবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই হবে আমাকে অস্বীকারকারী।"

'ইরবাদ ইবনে সারিয়্যা [রা] বলেন :[৩০]

"রাসূলুল্লাহ [সা] আমাদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদেরকে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিলেন। তাতে আমাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, আমাদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হলো। অতঃপর বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যেন একজন বিদায়ী ব্যক্তির উপদেশ! সুতরাং আপনি আমাদেরকে কিছু অন্তিম কথা শোনান। বললেন : তোমরা অবশ্যই শুনবে এবং আনুগত্য করবে- যদিও সে একজন হাবশী দাস হোক না কেন। তোমাদের কেউ বেঁচে থাকলে খুব শিগগির বহু মতবিরোধ দেখতে হবে। অতএব, তোমাদের উচিত হবে আমার সুন্নাহ্ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ অনুসরণ করা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার মতো শক্তভাবে তা আঁকড়ে থাকবে। নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলি থেকে দূরে থাকবে। কারণ সকল বিদ'আতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।"

উপরোক্ত হাদিসে তিনি সেসব লোকের সম্পর্কে সতর্ক করেন যারা সুন্নাহ ত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া মত পথে চলবে। তিনি বলেন :[৩১]

www.bjilibrary.com

'তোমরা সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকবে। কারণ সকল নতুন সৃষ্টি বিষয়ই বিদ'আত, আর প্রতিটি বিদ'আতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।'

তেমনিভাবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তাঁর পরে পৃথিবীতে কিছু অলস ও বিলাসী মানুষ আসবে যারা আমার সুন্নাহ অস্বীকার করবে।[৩২]

"রাসূল [সা] বলেন : আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ পৌছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানি না। যা আল্লাহর কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করবো।"

মিকদাদ ইবন মা'দিকারাব [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন :

"সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ আরো একটি জিনিস। সাবধান! এমন যেন না হয় যে, প্রাচুর্যের গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসমান কোন ব্যক্তি নিজের আরাম কেদারায় বসে বলবে, তোমরা কেবল কুরআনের অনুসরণ কর, তাতে যা কিছু হালাল পাবে তা হালাল মানবে এবং যা কিছু হারাম পাবে তা হারাম মানবে অথচ রাসূল যা কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছেন তা মূলত আল্লাহর হারামকৃত বস্তুর সমান। সাবধান! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নয় এবং নখরযুক্ত হিংস্র জন্তুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। ...

ইরবাদ ইবন সারিয়্যা [রা] থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল [সা] ভাষণ দেয়ার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বলেন : "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি নিজের আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে এ কথা মনে করবে যে, কুরআনে যা কিছু হারাম করা হয়েছে তাছাড়া আল্লাহ অন্য কোন জিনিস হারাম করেননি? সাবধান! আল্লাহর কসম! আমি যেসব নির্দেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছি তাও কুরআনের অনুরূপ অথবা তার অধিক। আহলি কিতাবদের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ, তাদের স্ত্রীলোকদের মারধর করা এবং তারা তাদের ওপর আরোপিত কর আদায় করার পরও তাদের গাছের ফল খাওয়া আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন।"

উপরোক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহর [সা] একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে যে, মুসলিমদের মধ্যকার একটি দল হাদিস অগ্রাহ্য করবে এবং নিজেদের কেবল কুরআনের অনুসারী বলে দাবি করবে। এর অন্তর্নিহিত কারণও উক্ত হাদিসে ইঙ্গিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঐসব লোক হবে বিলাসী ও দুনিয়াদার। এরা হাদিসে বর্ণিত ইসলামের বিস্তারিত আদেশ-নিষেধের পাবন্দী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিজ নিজ স্বেচ্ছাচারিতা বহাল রাখার জন্য কুরআনের অনুসারী হওয়ার দাবি করবে। কারণ কুরআনে মূল বিষয়গুলোই মাত্র বর্ণিত হয়েছে, ব্যাখ্যা আসেনি।

সুন্নাহ্র এই অপরিসীম গুরুত্বের কারণে সাহাবায়ে কিরামের [রা] প্রচার-প্রসারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তাঁরা মনে করতেন এই সুন্নাহ তাঁদের নিকট গচ্ছিত রাখা রাসূলুল্লাহর [সা] আমানত। পরবর্তী প্রজন্মের নিকট তা যথাযথভাবে পৌছানোর দায়িত্ব তাঁদের। আর রাসূল [সা] তা পৌছানোর উৎসাহ দিয়েছেন এভাবে:[৩৩]

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ সেই লোকটির প্রতি দয়া করুন, যে আমার মুখের কথা শুনবে, অত:পর যেরূপ শুনলো, সেরূপ বর্ণনা করলো। আমার বাণী যাদের নিকট পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা আমার মুখ থেকে শ্রবণকারীর চেয়েও অধিক ধারণ ক্ষমতার অধিকারী হবে।"■

টীকা :

১. সূরা আন-নাহল-৪৪
২. প্রাগুক্ত -৬৪
৩. সূরা আন-নিসা-৬৫
৪. সূরা আলে ইমরান-১৬৪
৫. আস-সুন্নাহ ও মাকানাতুহা-৫০
৬. সূরা আল-আর'রাফ-১৫৭
৭. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ ফি আল-ইহতিজাজ বিস সুন্নাহ-১১
৮. সূরা আল-হাশর-৭
৯. সূরা আন-নিসা-৬৪
১০. প্রাগুক্ত-৮০
১১. সূরা আন-নূর-৫৪
১২. সূরা আলে ইমরান-১৩২
১৩. সূরা আল-আনফাল-২৪
১৪. সূরা আলে ইমরান-৩১
১৫. সূরা আন-নূর-৬৩
১৬. সূরা আল-আহযাব-৩৬
১৭. সূরা আন-নূর -৬২
১৮. ইবন কায়্যিম, ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/৪৯
১৯. সূরা আল-হুজুরাত-১-২
২০. ই'লাম আল-মুওয়াককি'ঈন-৪৯
২১. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৫৪
২২. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত-২/৭
২৩. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৫৪
২৪. সূরা আল-আন'আম-১৯
২৫. সূরা আল-আ'রাফ-৫৮
২৬. সূরা আন-নিসা-২৮
২৭. সূরা আল-আহযাব-৪
২৮. ই'লাম আল-মুওয়াককি'ঈন-১/১৬২; আল-আমিদী, আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম-২/৭৭৩
২৯. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক [রহ]
৩০. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা-৫৬
৩১. মুসনাদে আহমাদ-৪/১২৭; আবু দাউদ- [৪৬০৭]; তিরমিযী [২৬৭৬]; ইবন মাজা [৪৩]
৩২. আবু দাউদ- [৪৬০৫]; তিরমিযী- [২৬৬৩]; মিফতাহুল জান্নাহ- ১১, ২৫, ৫৪
৩৩. মিফতাহুল জান্নাহ-৮

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

রোম সম্রাটকে লিখিত হযরত নবী করীম [সা]-এর পত্র

মাওলানা মহিউদ্দীন খান

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপের দুই দিকে ছিল দু'টি বিরাট রাষ্ট্রশক্তি। একটি পারস্য সাম্রাজ্য এবং অপরটি রোমান সাম্রাজ্য। আর এ দু'টি সাম্রাজ্যই ছিল তখনকার দুনিয়ার সেরা দু'টি শক্তি। আরব উপদ্বীপের পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরের দুই তীরে বিস্তৃত ছিল পারস্য সাম্রাজ্য। বর্তমান আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইয়ামান পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিলো। তখনকার এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক শক্তিমান এবং প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারকরূপে পারস্য সাম্রাজ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা এখনও পর্যন্ত ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে আছে।

অপরদিকে আরব উপদ্বীপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলাকা থেকে শুরু করে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল প্রাচীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। আরবরা এটাকে রোম সাম্রাজ্যরূপে অভিহিত করত। এই দু'টি বিশাল সাম্রাজ্যের সীমান্ত বর্তমান ইরাকের দজলা-ফুরাত তীরে একত্র হয়েছিল। রোম ইউরোপের প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি। বর্তমানে ইতালির রাজধানী। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশাল রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব-রোমান

www.bjilibrary.com

সাম্রাজ্যের আওতাধীন ছিল এশিয়া-মাইনর, মিসর, শাম, ফিলিস্তিন প্রভৃতি অঞ্চল। সম্রাট কনস্টানটাইন ৩২৬ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত বসফোরাস প্রণালীর তীরে একটি শহরের পত্তন করেন। এটির নামকরণ করা হয়েছিল সম্রাটের নিজের নামের সাথে যুক্ত করে কনস্টানটিনোপল। মুসলমানগণ এ শহরটি অধিকার করে এর নামকরণ করেছিলেন ইস্তাম্বুল। কয়েক শতাব্দীব্যাপী এই ঐতিহ্যবাহী শহরটি ইসলামী খিলাফতের রাজধানী ছিল এবং এখনও পর্যন্ত এটি মুসলিম জাহানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে বিবেচিত।

কনস্টানটিনোপল-কেন্দ্রিক বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশকেই পবিত্র কুরআনে ও ইসলামী ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্য নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি ছিল কায়সার।

ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবনের বর্ণনানুযায়ী এই সাম্রাজ্যটি ছিল তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুসভ্য এবং সম্রাট কায়সার সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হওয়ার পাশাপাশি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রধানরূপেও বিবেচিত হতেন। প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির তিন বছরের মাথায় [৬১৩ খ্রি.] ইরানের শাহান শাহ খসরু পারভেজ হঠাৎ করেই রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আগ্রাসী ইরানীরা ইরাক, শাম, মিসর অধিকার করে এশিয়া-মাইনরে ঢুকে পড়ে। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস [৬১০-৬৪১ খ্রি.] ইরানীদের এই হামলা প্রতিহত করতে পারলেন না। অগ্নি উপাসক ইরানীরা রোম সাম্রাজ্যের সমগ্র পূর্ব অঞ্চল দখল করে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অভাবিতপূর্ব জয় লাভ করার পর ইরানীরা খ্রিস্টান জনগণের ওপর ভীষণ অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। খ্রিস্টধর্মের সব ক'টি আলামত ভূলুণ্ঠিত করা হয়, এমন কি তাদের সর্বপ্রধান ধর্মীয় আলামত পবিত্র ক্রুসের সেই দুর্লভ কাষ্ঠখণ্ডটি বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে ছিনিয়ে এনে তদানীন্তন পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছে দেয়া হয়, যেটি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ কাষ্ঠখণ্ডটিতেই হযরত ঈসা [আ]-কে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল!

প্রতিবেশী দু'টি বৃহৎ শক্তির মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ এবং রোমানদের সেই শোচনীয় পরাজয়ের সময়টিতে মক্কায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারিগণের ওপর চলছিল কাফের-মুশরেকদের পক্ষ থেকে অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন। অগ্নি উপাসক পারস্যবাসীদের অবিশ্বাস্য বিজয় সংবাদে মক্কার অংশীবাদী পৌত্তলিকরা ছিল দারুণ উল্লসিত। তারা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল, 'ওহি-নবী-রাসূল ও আসমানী দীনের দাবিদার খ্রিস্টানরা যেভাবে পৌত্তলিক পারসিকদের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই আসমানী প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির দাবিদার মুসলমানরাও আমাদের হাতে উৎখাত হবে।'

মক্কার কাফেরদের সে উল্লাস ও আস্ফালনের জবাবেই নাযিল হয় পবিত্র কুরআনের সূরা রূমের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত যে আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, রোম তার প্রতিবেশীর হাতে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এই পরাজয়ই শেষ কথা নয়। খুব শিগগিরই

www.bjilibrary.com

আগামী কয়েক বছরের মাথায় ওরা পুনরায় জয়ী হবে। অগ্র-পশ্চাৎ সব বিষয়ই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। সেদিন মুসলমানগণও উৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও দয়ালু। এটা আল্লাহর ওয়াদা, তিনি কখনও ওয়াদা খেলাপ করেন না।

পবিত্র কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল। এক. তখনকার সেই দুরবস্থার কবল থেকে রোম সাম্রাজ্যের আশু উত্তরণ ঘটবে এবং পৌত্তলিকদের বর্তমান উল্লাস বিষাদে রূপান্তরিত হবে।

দুই. সেদিন আল্লাহর সাহায্যের বরকতেই মুসলমানদেরও উল্লসিত হওয়ার কারণ ঘটবে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যখন উচ্চারিত হয়েছিল তখন রোমানদের পক্ষে বিজয়ী পারস্য শক্তির ওপর পুন:বিজয় লাভ তো দূরের কথা, তাদের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন দূরতম সম্ভাবনাও ছিল না। অপরদিকে মুসলমানগণও তখন যেমন অবর্ণনীয় দুরবস্থায় পতিত ছিল সেই পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষেও অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে কোন সুসংবাদের আশা করাটা ছিল সম্পূর্ণ দুরাশা মাত্র। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারিগণ কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর এতটাই দৃঢ় আস্থাশীল ছিলেন যে, হযরত আবু বকর [রা] উবাই ইবনে খালফ নামক জনৈক কুরাইশ সর্দারের সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়া না হওয়ার প্রশ্নে এক শ' উটের বাজি ধরে বসলেন অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কুরআনে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যদি বাস্তবায়িত না হয় তবে হযরত আবু বকর [রা] উবাইকে এক শ' উট দেবেন। আর যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায় তবে উবাই হযরত আবু বকর [রা]-কে এক শ' উট প্রদান করবে। এই ঘটনার কয়েক বছর পরই [৬২২ খ্রি.] একদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে এলেন, অপরদিকে রোম সম্রাট কায়সার তার রাজধানী কনস্টানটিনোপলের সন্নিকটে ইরানের অবরোধ ভেঙে প্রতিপক্ষের ওপর প্রতি আক্রমণ করতে সমর্থ হলেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ইরানীদের ওপর প্রতি আক্রমণ করার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন, তখন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের বহু জ্ঞানী-গুণীর মনেও এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, এটাই সম্ভবত রোম সম্রাটের শেষ যুদ্ধযাত্রা। কিন্তু সকল জল্পনা-কল্পনার জাল ছিন্ন করে রোম সম্রাট বিজয় লাভ করলেন। শুধু জয় লাভই করলেন না, আজারবাইজান পর্যন্ত পৌছে পারসিকদের সর্বাপেক্ষা বড় অগ্নিকুণ্ডটি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিলেন। অপরদিকে হিজরি ২ সনে বদরের ময়দানে অকল্পনীয় বিজয় লাভ করে মজলুম মুসলমানগণও উল্লসিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন। আর এভাবেই পবিত্র কুরআনের তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হলো। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ও শত্রুর ওপর অকল্পনীয় বিজয় লাভ করার আনন্দে উদ্বেলিত হিরাক্লিয়াস বাইতুল-মোকাদ্দাস জিয়ারত করতে এসেছিলেন। ঠিক এ সময়টিতেই নবী করীম

www.bjilibrary.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত দেহইয়া বিন খলিফা কালবি [রা] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রসহ বাইতুল-মোকাদ্দাসে পৌছেন।

ভরা দরবারে হযরত দেহইয়া বিন খলিফা কালবি [রা] প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রটি সম্রাটের হাতে অর্পণ করেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম!

আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বরাবরে। ন্যায় পথের অনুসারিগণের প্রতি সালাম। অত:পর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি শান্তি লাভ করতে চান তবে ইসলামে দীক্ষিত হোন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দেবেন। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আপনার সকল প্রজা সাধারণের ভ্রষ্টতার দায়ও আপনার ওপরই পতিত হবে।

হে আহলে কিতাবগণ! বিতর্কিত সকল বিষয় স্থগিত রেখে আস আমরা এমন একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছি যে বিষয়ে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। আর তা হচ্ছে, আমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না। অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক সাব্যস্ত করবো না। আল্লাহ ছাড়া কাউকেই আমাদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করবো না। যদি এ বিষয়গুলো আপনি অস্বীকার করেন তবে শুনে রাখুন যে, সর্বাবস্থায়ই আমরা আল্লাহর একত্বের বিশ্বাসে অটল থাকবো। —মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এই মোবারক পত্রের পাঠ শ্রবণ করে সম্রাট হিরাক্লিয়াস কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তার মনোজগতে তখন যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছিল! দরবারের লোকদের নির্দেশ দিলেন, আরবের কোনো বাণিজ্য কাফেলা বাইতুল-মোকাদ্দাসে অবস্থানরত থাকলে তাদের মধ্য থেকে দু-একজন বিজ্ঞ লোককে যেন দরবারে ডেকে আনা হয়। ঘটনাক্রমে সে সময় কুরাইশদের প্রধান ব্যক্তি আবু সুফিয়ান বাণিজ্য উপলক্ষে বাইতুল-মোকাদ্দাসে অবস্থান করছিলেন। তাকেই দরবারে হাজির করা হলো।

সম্রাট তার সাথে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর বংশ মর্যাদা, তাঁর চরিত্র, তাঁর প্রচারিত দীনের মৌল শিক্ষা, এই ধর্ম যারা গ্রহণ করেছেন তাদের অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলেন।

আবু সুফিয়ানের সাথে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের যে কথোপকথন হয়েছিল, বুখারী শরীফের বর্ণনানুযায়ী তা ছিল নিম্নরূপ :

সম্রাট কায়সার : তোমাদের শহরে যিনি নবুওয়াতের দাবি করেছেন, তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন?

আবু সুফিয়ান : অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত।

কায়সার : নবী-রাসূলগণের সবাই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন যেন কেউ তাঁর অনুগত্য গ্রহণ করতে গিয়ে নিজেকে ছোট করা হচ্ছে এমনটা ভাবতে না

www.bjilibrary.com

পারে। এঁর বংশে কি অতীতে অন্য আরও কেউ নবী হওয়ার দাবি করেছেন বা কেউ কি রাজত্ব করেছেন?

আবু সুফিয়ান : না, কখনও না।

কায়সার : যদি এমনটি হতো তবে এরূপ মনে করার অবকাশ ছিল যে, পারিবারিক ধ্যান-ধারণার প্রভাবে এ ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে প্রচার করছে কিংবা সে তার পূর্ব-পুরুষের বাদশাহি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে এমন একটি দাবির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যারা তাঁর ধর্ম মত গ্রহণ করেছে তারা সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীর, না দুর্বল শ্রেণীর?

আবু সুফিয়ান : সাধারণ সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক।

কায়সার : নবী-রাসূলগণের অনুসারী প্রথমাবস্থায় সাধারণত গরিব লোকেরাই হয়ে থাকে। তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে না কমে যাচ্ছে?

আবু সুফিয়ান : তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে, কমছে না।

কায়সার : ঈমানের আকর্ষণ এমনটাই হয়ে থাকে; তা দিন দিন শুধু বর্ধিত হয়। আচ্ছা, এ পর্যন্ত কি কেউ বিরূপ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে গেছে?

আবু সুফিয়ান : এ পর্যন্ত কেউ এমনটি করেনি।

কায়সার : ঈমানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সত্যের প্রভাবেই তা মানবহৃদয়ে দৃঢ়মূল হয়। আর একবার তা হৃদয় স্পর্শ করলে আর কখনও তা বিচ্যুত হয় না। আচ্ছা! নবুওয়াতের দাবি উত্থাপন করার আগে কি তোমরা এই লোকটিকে সত্যবাদী বলে মনে করতে না কখনও তাকে মিথ্যায় জড়িত হতেও দেখা গেছে?

আবু সুফিয়ান : না, তিনি কখনও মিথ্যা বলতেন না।

কায়সার : যে ব্যক্তি কোন সময় মানুষের সাথে মিথ্যা বলে না, সে কেন সৃষ্টিকর্তার নামে মিথ্যা বলতে যাবে? নবীগণ কখনও মিথ্যা বলেননি, কাউকে প্রতারণাও করেননি। ইনি কি কখনও কোন চুক্তি বা ওয়াদা-অঙ্গীকারের অন্যথা করেছেন?

আবু সুফিয়ান : এখনও পর্যন্ত তো এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, তবে সম্প্রতি তাঁর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে [হুদায়বিয়ার সন্ধি]। দেখা যাক, সেটির মর্যাদা তিনি রক্ষা করেন কি না?

কায়সার : পয়গম্বর কখনও চুক্তি ভঙ্গকারী হননি। তোমাদের সাথে কি তাঁর কখনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?

আবু সুফিয়ান : জি হ্যাঁ, কয়েকবারই যুদ্ধ হয়েছে।

কায়সার : যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে?

আবু সুফিয়ান : কখনও আমরা জয়যুক্ত হয়েছি, কখনও তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন।

কায়সার : আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের অবস্থা সাধারণত এমনটিই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত জয় তাঁদেরই হয়ে থাকে। তাঁর শিক্ষার মূল কথাগুলো কী?

আবু সুফিয়ান : তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর। অন্য কাউকে

www.bjilibrary.com

আল্লাহর সাথে শরিক করো না। চারিত্রিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চল। সত্য কথা বল। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর। পূর্বপুরুষদের অংশীবাদী রীতি-নীতি পরিত্যাগ কর। নামায পড়।

কায়সার : প্রতিশ্রুত যে নবীর কথা আমরা জেনে আসছি, তাঁর শিক্ষা হবে এমন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, অতি সত্বরই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তবে এমন ধারণা ছিল না যে, তিনি আরবের বুকে আবির্ভূত হবেন! হে আবু সুফিয়ান! যদি তুমি মিথ্যা বলে না থাক, তবে সেই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আমি যে স্থানটায় বসে আছি, এটিও তাঁর পদানত হয়ে যাবে। হায়! আমি যদি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারতাম তবে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম। [বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, তারীখে-তাবারী, ৩য় খণ্ড]

আবু সুফিয়ান পরে বর্ণনা করেছেন, আমার একবার ইচ্ছা হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ [সা] যেহেতু আমাদের ধর্মের শত্রু সুতরাং তাঁর সম্পর্কে সম্রাটের মন বিষিয়ে দিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেকের তাড়নায় সত্য কথাই আমাকে বলতে হয়েছে। আমি সম্রাটের প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাবে সঠিক উত্তর দিয়েছি। তবে এতটুকু বলতে ছাড়িনি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান কুরাইশ গোত্রের মধ্যে মোটেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মমতটি এমন কিছু নয়, যা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো কিছু থাকতে পারে! আবু সুফিয়ানের সাথে সম্রাটের আলোচনা দরবারিদেরকে রীতিমত ক্ষুব্ধ করে ফেলেছিল। রাসূলের [সা] পত্রের প্রতি সম্রাটের মুগ্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে দরবারিদের ক্ষোভের মাত্রা চরমে পৌঁছেছিল।

এমন প্রতিকূল অবস্থায় সম্রাট হযরত দেহইয়া [রা]-কে লক্ষ্য করে বললেন, যদি আপনজনদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এবং তাদের হাতে আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের নবীর আনুগত্য গ্রহণ করতাম। নিঃসন্দেহে তিনি সেই প্রতিশ্রুত নবী, আমরা যাঁর অপেক্ষা করছি। [বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড]

বুখারী শরীফের আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অন্তরে সত্যের জ্যোতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিংহাসন হারানোর ভয়ে সে আলো স্তিমিত হয়ে যায়।

ইতিহাসের প্রামাণ্য বর্ণনা অনুযায়ী রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে লিখিত এই পত্রটি ছিল হযরত আবু বকর [রা]-এর হস্তলিখিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে পত্রের ওপর সিলমোহর লাগিয়েছিলেন। হিজরি সপ্তম শতাব্দীকাল পর্যন্ত এই পবিত্র পত্রটি স্পেনে সংরক্ষিত ছিল। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ আল্লামা সুহাইলি [রহ] তাঁর সময়কালে পত্রটি স্পেনে সংরক্ষিত ছিল এবং তিনি সেটি যিয়ারত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কস্তলানি [রহ] [৮৫১ হি.-৯২৩ হি. মুতাবেক ১৪৪৭-১৫১৭ খ্রি.] লিখেছেন যে, মালিক মনসুর কালাদুন সালেহি [৬৭৮-৮২ হিজরি]

www.bjilibrary.com

স্পেনের এক শাসক আলফানসুর নিকট একজন দূত প্রেরণ করেছিলেন। আলফানসু মালিক মনসুরের দূত সাইফুদ্দিন ক্বালিজকে উক্ত পবিত্র পত্রখানা দেখিয়েছিলেন। পত্রটি স্বর্ণনির্মিত একটি বাক্সের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল। আলফানসু বলেছিলেন যে, এটি রাসূলুল্লাহর [সা] ঐ পত্র যা তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। [কস্তলানি ১ম খণ্ড, ৬৭ পৃ.]

পবিত্র এ পত্রটি বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে পুনরায় আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী স্পেনে মুসলমানদের পতনের পর পত্রটি কোন না কোনভাবে পবিত্র মক্কায় নীত হয়। সেখান থেকেই এটি শরীফ হোসাইনের পুত্র আমীর আবদুল্লাহর হস্তগত হয়। এই আমীর আবদুল্লাহ ছিলেন জর্দানের পরলোকগত বাদশাহ হোসেনের পিতামহ।

আমীর আবদুল্লাহর নিকট থেকে পত্রটি তার এক স্ত্রীর হাতে পড়ে। সেই ভদ্রমহিলা পত্রটি হস্তান্তর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তখনকার আবুধাবীর শাসক [আরব আমিরাতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান] শায়খ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পর্শধন্য এই অমূল্য পত্রটি নগদ দশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যে ক্রয় করে নেন। এটা ছিল ইতিহাসে যে কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সর্বোচ্চ মূল্য।

পবিত্র এই পত্রটি মসৃণ পাতলা চামড়ার ওপর লিখিত। আটটি ছত্রে পত্রটি সমাপ্ত। শেখ যায়েদের সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর ইবরাহিম কর্তৃক বিভিন্নভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পর এটিই যে সেই আসল পত্র সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। শায়খ যায়েদ মূল্যবান পত্রটি আবুধাবীর জাদুঘরে সংরক্ষিত করেছেন বলে জানা যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত পত্রাবলির যে কয়টি মূল কপি এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে আবুধাবীতে সংরক্ষিত এই পত্রটি তন্মধ্যে পঞ্চম। ইতোপূর্বে আরও চারটি পত্রের আসল কপি শনাক্ত করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে

১. হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসির বরাবরে লিখিত পত্র।

২. রোম সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত মিসরের শাসক মকোকাসের উদ্দেশে প্রেরিত পত্র।

৩. বাহরাইনে নিযুক্ত ইরানের শাসনকর্তা মানযারের নামে প্রেরিত পত্র।

৪. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজকে লিখিত পত্র।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এগুলো যে আসল পত্র সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া গেছে।

হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণনাপরম্পরার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত পত্রাবলির যে বয়ান রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দ্বারা শনাক্তকৃত পাঁচটি পত্রের পাঠোদ্ধার করে দেখা গেছে, এগুলোতে একটি শব্দেরও গরমিল নেই। হাদিসের বর্ণনাগুলো কত বিশ্বস্ততার সাথে সংরক্ষিত হয়েছে, এটাও তার একটা বাস্তব প্রমাণ! আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ।■

www.bjilibrary.com

মহানবীর [সা] মহান শিক্ষা

হাফেজা আসমা খাতুন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর [রা] বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে মুহাজিররা! পাঁচটি মন্দ কাজ এমন আছে, সেগুলোতে জড়িয়ে পড়লে তোমাদের পরিণাম খুবই খারাপ হবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যেন এই পাঁচটি মন্দ কাজ তোমাদের মধ্যে জন্ম না নেয়। সেগুলো হলো :

১. ব্যভিচার : এ পাপ যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে যা আগে ছিল না।

২. মাপ ও ওজনে কম করা : এই মন্দ কাজ যদি কোন জাতির মধ্যে জন্ম নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি চাপিয়ে দেন এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

৩. যাকাত না দেয়া : এই মন্দ কাজ যাদের মধ্যে দেখা দেয়, তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। আর ঐ অঞ্চলে যদি পশু বা পাখি না থাকে, তবে আদৌ বৃষ্টি হয় না।

www.bjilibrary.com

৪. আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা : এই মন্দ কাজ যখন কোথাও দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অমুসলিম শক্রদের চাপিয়ে দেন, যারা তাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে যায়।

৫. যদি মুসলমান শাসক আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন না করে তবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দেন এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ও খুন-খারাবী করতে শুরু করে। [বাইহাকী, ইবনে মাজা, যাদে রাহ : ১৩০ পৃ.]

মহানবী [সা] কথা, কাজ, শিক্ষা ও তাঁর সাহাবীদের যেসব কাজ অনুমোদন করেছেন, তাকেই হাদীস বলা হয়। নবী করীম [সা] বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতদিন এ দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু'টি জিনিস হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং রাসূল [সা]-এর সুন্নাহ, আল হাদীস।"

মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি ঘরে এ দু'টি জিনিস বর্তমান রয়েছে। কিন্তু দু:খজনক ও বেদনাদায়ক বিষয় হলো, মুসলমানগণ এ দু'টি জিনিস থেকে যেমন জানার চেষ্টা করে না, তেমনি কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মানারও চেষ্টা করে না। ফলে কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানের অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অন্যায়, অনাচার, পাপাচার প্রবেশ করেছে। কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষা সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে পারলে তবেই দুর্নীতি, অন্যায়, অনাচারের মূলোৎপাটন সম্ভব।

কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানই মানুষের অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন। আখিরাতের আদালতে বান্দার প্রতিটি কাজের জবাবদিহি আল্লাহর দরবারে করতে হবে এবং এর ভিত্তিতেই বান্দাহর স্থায়ী জীবন নির্ধারিত হয়। সে হয় চিরস্থায়ী সুখের স্থান জান্নাতের অধিবাসী হবে, নয়তো কঠিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

কুরআন-সুন্নাহ যে যত বেশী জেনে বুঝে অধ্যয়ন করবে, অর্থসহ পাঠ করবে, তার ভেতরেই তত বেশী খোদাভীতি এবং আখিরাতে জবাবদিহির ভয় জাগ্রত হবে। এরাই আল্লাহর ভয়ে ও আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবে, মানুষের অধিকার নষ্ট করবে না, আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ ও শিক্ষা মেনে চলতে সদাসচেষ্ট থাকবে।

আসুন, আমরা দেখি, বর্তমান মুসলমান সমাজে উপরোক্ত পাঁচটি কাজ ছড়িয়ে পড়েছে কিনা এবং এর পরিণাম কী হচ্ছে!

প্রথম হচ্ছে ব্যভিচার। আজকের প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে সর্বত্র ব্যভিচার মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ফলে মরণব্যাধি এইড্স, ক্যান্সার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে যা আগে কোনদিন ছিল না। এ মরণব্যাধি এইড্স, ক্যান্সার থেকে বাঁচতে হলে ব্যভিচার পরিত্যাগ করতে হবে এবং ব্যভিচারের সমস্ত পথ রুদ্ধ করতে হবে।

১. ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করতে হলে :

ক. সিনেমা, টিভি থেকে যৌন উস্কানিমূলক নৃত্য, গান প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

শিক্ষামূলক, জাতি গঠনমূলক, নির্মল আনন্দদায়ক ছায়াছবি ও আমাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে এমন চিত্র প্রদর্শন করতে হবে।

খ. রাস্তাঘাটে পোস্টারিং-এ বিজ্ঞাপনে নারী চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে। ইরানে, সৌদি আরবে তাদের বিজ্ঞাপনে পোস্টারিং-এর দোকানে, বিপণীতে কোন নারী চিত্র নেই। তাই বলে কি সে দেশে ব্যবসাপণ্য চলে না? এ হচ্ছে দেশের ভেতরে কতিপয় ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনদের, বিশেষ করে কতিপয় বিভ্রান্ত এনজিও-গোষ্ঠীর তৎপরতা, যারা এ দেশের মুসলমান যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে এবং ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য ও খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

গ. নারী-পুরুষ সবাই আল কুরআনে আল্লাহর নির্দেশিত পর্দার বিধান যথাযথ মেনে চলতে হবে।

ঘ. যেসব পুরুষ এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট নয় এবং ২/৩ স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম, তাদেরকে বিয়ের সুযোগ দিতে হবে।

ঙ. চাকুরীজীবী স্বামী-স্ত্রীকে একই জায়গায় চাকুরীর সুযোগ দিতে হবে। পৃথক জায়গায় রাখা যাবে না।

চ. ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স হলেই বিয়ে দিতে হবে। ছেলেদের ২০/২২ বছরের মধ্যে এবং মেয়েদের ১৬/১৮ বছরের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে।

ছ. কাজের ছেলেমেয়েদেরকেও ঐ বয়সেই বিয়ে দিতে হবে। আল কুরআনের নির্দেশও তাই।

আল কুরআনে আল্লাহপাকের নির্দেশ ও রাসূল [সা]-এর আদর্শ, শিক্ষা মেনে চললেই সমাজ থেকে ব্যভিচার নির্মূল হবে। মানুষ মরণব্যাধি এইড্স, ক্যান্সার ও নতুন নতুন রোগ থেকে বেঁচে যাবে। এছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

২. ওজনে মাপে কম দেয়া :

এমন কাজ যদি কোন জাতির মধ্যে জন্ম নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি চাপিয়ে দেন এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

নবী করীম [সা] মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছেন, যখন তুমি নিজে কোন জিনিস কাউকে ওজন করে মেপে দাও, তখন একটু বেশী দাও। যখন তোমার প্রাপ্য নিজে ওজন করে নাও তখন একটু কম নাও।

রাসূলে করীম [সা]-এর এ শিক্ষা যদি কোন মুসলমান বা কোন ব্যবসায়ী আমল করে, তাহলে ঐ ব্যবসায়ীর যেমন সুনাম হবে, তার দোকানে বিক্রিও বেশী হবে এবং আল্লাহ তা'আলাও তার ব্যবসায়ে অনেক বরকত দেবেন। ওজনে কম দিলে ব্যবসায়ী আল্লাহর রহমত, বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

জাতির এ বদ অভ্যাসের জন্য যদি আল্লাহ্ তা'আলা জাতির ওপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন এবং বৃষ্টি বন্ধ করে দেন তাহলে সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

www.bjilibrary.com

কোন জাতির ওপর যদি অত্যাচারী শাসক চেপে বসে, দেশে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে দেশের ব্যবসায়ীরা এসব মন্দ কাজে লিপ্ত আছে। ব্যবসায়ীদের এ বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত।

৩. যাকাত না দেয়া :

এ মন্দ কাজ যে জাতির মধ্যে দেখা যায়, তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর ঐ অঞ্চলে যদি পশু-পাখি না থাকে, তাহলে আদৌ বৃষ্টি হয় না।

নামাযের মতোই যাকাত আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের ওপর ফরয করেছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। যে ধনী ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন না। [আল হাদীস]

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টন হলে দেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব থাকতে পারে না। দারিদ্র্য, বেকারত্ব দূর হলেই দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী নামায কায়েম, যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টনের দায়িত্ব পালন করে, তাহলেই দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন সম্ভব।

৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা : এই মন্দ কাজ যখন কোথাও দেখা দেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর অমুসলিম শত্রুদের চাপিয়ে দেন, যারা তাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে যায়।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সা] সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, একদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাবী করা, অপর দিকে আল্লাহর প্রেরিত আল কুরআনের আদেশ-নিষেধ অমান্য করা এবং রাসূল [সা]-এর শিক্ষা অবমাননা করা, উপেক্ষা করা, না মানা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা। ইসলামকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করা ও ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করা ও জেল-জুলুম দেয়া। এ সবই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

৫. যদি মুসলমান শাসক আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন না করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দেন এবং তারা পরস্পরে লড়াই ও খুন-খারাবী করতে শুরু করে দেয়। [বাইহাকী, ইবনে মাজা, জাদেরাই : ১৩০ পৃ.]

আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা জালিম, ফাসেক, কাফের।" [সূরা আল মায়েদা : ৪৪, ৪৫, ৪৭ আয়াত]

সূরা আল মায়েদার তিনটি আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন করে না, তারা জালিম, তারা কাফের। তারা ফাসেক। এত বড় হুঁশিয়ারী প্রদানের পরও মুসলমান দেশের শাসকরা আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের আইন অনুযায়ী দেশ শাসন না করার কারণে বাংলাদেশসহ প্রতিটি মুসলিম দেশেই সরকার, বিভিন্ন দল, জনগণ মারামারি ও খুন-খারাবিতে লিপ্ত আছে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহপ্রদত্ত আল কুরআন সব সমস্যার একমাত্র নির্ভুল সমাধান। আল কুরআনে বিশ্বাসী ও আল্লাহর কিতাব আল কুরআন সকল জাতি, সকল দেশের ও সকল মানুষের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। আল কুরআন মানব জীবন সমস্যার নির্ভুল সমাধান। আল্লাহর রাসূল [সা] আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ীই জাহিলী সমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

আসুন, আমরা সবাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বশেষ নবী, আদর্শ মানব, শ্রেষ্ঠ মানব মহানবীর [সা] আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হই। তাহলেই সমাজে ন্যায় ইনসাফ, সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক মানুষ নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই যার যার অধিকার ফিরে পাবে। আর একমাত্র তখনই সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে। জনগণ ও দেশবাসী আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হবে।■

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ : ফোন : ৭১২৪৩২৮,০৭১৭২৯৬৪৬৩৬

আমরা জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয়সমূহ অবলম্বনে
ইসলামী বই প্রকাশ করে থাকি

আমাদের প্রকাশিত কতগুলো প্রয়োজনীয় ইসলামী বই

১. কুরআন মাজীদের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
২. আলকুরআন কথা বলে
৩. ইসলামের আলোকে স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও দাম্পত্য জীবন
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
৫. ইসলামে নারী বনাম প্রচলিত ভুল
৬. রাসূল (স) এর স্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত
৭. কুরআন হাদীসের আলোকে সহীহ দুআর ভাণ্ডার
৮. হাদিয়াতুল মুসাল্লিন [নামাযের প্রামাণ্য মাসআলা]
৯. আত্মপরিচয়ে আলকুরআন
১০. নবী রাসূলদের অলৌকিক ঘটনাবলী
১১. তাফসীরুল কুরআন সূরা ফাতিহা ও বাকারা
১২. তাফসীরুল কুরআন আমপারা
১৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মকছুদুল মোমেনীন
১৪. প্রশ্নোত্তরে ছোটদের প্রিয় নবী (স)
১৫. মিরাজ ও বিজ্ঞান
১৬. কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
ও ইমাম হোসাইনের (রা) শাহাদাত
১৭. শেষ মনযিলের পথে
১৮. আল কুরআনে আলোকিত বিশ্বনবী (স)
১৯. মানবাধিকার সনদ ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন
২০. ইসলাম বনাম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা
২১. সুনির্বাচিত হাদিস সঞ্চয়ন
২২. যুক্তি প্রমাণের আলোকে পর্দার বিধান
২৩. আল কুরআনে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়
২৪. আসহাবুর রাসূল (স) (১ম খণ্ড)
[বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী]
২৫. ছোটদের প্রিয়নবীর প্রিয়কথা
২৬. ইসলামের উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার
২৭. রোযা কি, কেন রাখবেন, কিভাবে রাখবেন
২৮. ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর অধিকার
২৯. নারী ও ইসলাম
৩০. তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি
৩১. পরিবেশ ও ইসলাম
৩২. মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বাংলাদেশ
৩৩. মক্কা মদীনা ও হজ্জের বিধি বিধান
৩৪. দুর্নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ
৩৫. হিজাব পর্দা ও ফ্যাশন

www.bjilibrary.com

আলোর অধিক ॥ জ য় নু ল আ বে দী ন আ জা দ

তোমার প্রতিটি শব্দ আলোর অধিক
আচয়ন সৌরভে মণ্ডিত–
তাইতো এত দরুদ এবং ভালবাসা
শুধু তোমারই জন্য হে রাসূল!

জীবনের অন্তিম আহ্বানে কী করে বললে
এত সব নিগূঢ় কথা আরাফাত ময়দানে–
ভাবতে গিয়ে অবাক হইনি তেমন,
তোমার তো অলৌকিক সম্পর্ক স্বয়ং স্রষ্টার সাথে
ওহী তো আসতো কেবল তোমারই কাছে
দিনে-রাতে যে কোনো প্রহরে।
অবাক হয়েছি তবে মুযদালিফার নিলিপ্রান্তরে–
কেন যে বলেছিলে এভাবে উম্মতকে
খোলা আকাশের নিচে বালি আর
কাঁকরের মাঠে রাত কাটাতে–
সারা রাত!

মুযদালিফার আসমান একেবারেই অন্য রকম
চারপাশে নানা বর্ণ ও ভাষার হাজারো মানুষ
তবুও তারকাখচিত আকাশ কাছে টানে–
অনেক কাছে।
অপলক তাকাতেই মৌন সে আকাশ
মেলে ধরে অপার রহস্যের মেঘমালা–
দৃষ্টি চলে যায় উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে
জানি না কোথায় কত উচ্চতায় আল্লাহর আরশ!
তবে কি স্রষ্টার সন্ধানেই মুযদালিফায় রাত্রি যাপন?
বল, হে মুহম্মদ প্রিয় রাসূল আমার!

www.bjilibrary.com

দু'টি কবিতা ॥ আ শ রা ফ আ ল দী ন

দুর্দিনে পড়ে আছি

আজ বড় দুর্দিনে পড়ে আছি।
জন্মের ক'মুহূর্ত পরেই যে আমার কান্না থেমে গিয়েছিল
আযানের শব্দ শুনে
আজ সেই আমার সেই নিজ দেশে
বড্ড কান্না পায় আযানের শব্দ শুনে
মুয়াজ্জিনের কাতর ভঙ্গিমা দেখে, ইমাম সাহেবের
ম্রিয়মাণ মুখ দেখে আর কি এক প্রকার হতাশায় নিমজ্জিত
ঐক্যহীন নতমুখ মুসল্লিদের আনাগোনা দেখে।

হে প্রিয় নবী আমার! তোমার শেখানো পথে ঈমান এনেছি বলে
যে কোন কাজের শুরুতে
হিম্মতসঞ্চারী তকবীর দেয়া আমার আজন্মের অভ্যাস যদিও
ইদানিং সেই একই সমাজে ও দেশে তকবীর বলতে গেলে মনে হয়
রাজনীতির ভূতুড়ে অলিন্দ থেকে একটি কালো বিড়াল
বেখাপ্পা তাকিয়ে আছে,
চোখে তার অচেনা সন্দেহ।

হে রাসূল আমার! বাংলার আবহমান জীবনের ভেতর
প্রশান্ত উদার জমিন ও হাওয়াতে
যেভাবে যুগ যুগ ধরে পড়েছি দরুদ আর
গলা ছেড়ে করেছি কেরাত দুরন্ত,
আজ যেন সেই স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে চায় কোন এক তস্কর,
সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের কথা বলে
বিনা অপরাধে আমাকেও চোর সাজিয়ে
বিদেশী বেদীন নাফরমানদের মতো
আমাদেরও ক্ষমতার আর নেতাদের অনেকেই।
সেই অশুভ প্রচ্ছায়া দেখো কেমন দ্বিধায় ফেলেছে
পুরোটা জাতির প্রতিটি ঈমানী মনকে।

হে কামলেওয়ালা রাসূল আমার!
তোমার উম্মত এ জাতির সিংহভাগ আ'ম জনতার
দরুদমুখী মন আজ অশান্ত উৎকণ্ঠিত;
তারা শুধু সেজদায় পড়ে নিষ্পত্তি চায়!

মোরাকাবা

বড় সাধ মনে সম্ভ্রমে চুমি নবী ছাহেবের হাত;
মানুষ হয়েও খোদার বন্ধু বিশুদ্ধ পারিজাত।

আমরা এখন সব প্রত্যাখ্যান করে
সার্বভৌম আলোর মিছিলে যেতে চাই।

www.bjilibrary.com

সার্বভৌম আলোর মিছিলে যেতে চাই ॥ মা হ ফু জ পা র ভে জ

'সাতটি তারার তিমির'-এ 'তিমির হননের গান'টি অবিরাম শুনিয়াছি
'সাতটি তারার তিমির'-এ 'তিমির হননের গান'টি অবিরাম শুনিতেছি
প্রশ্ন শুনিয়াছি 'তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে আমরা কি তিমিরবিলাসী?'
কবি বলিয়াছেন যদ্যাপি : 'আমরা তো তিমিরবিনাশী হতে চাই।'
তারপর শতবর্ষ তারপর 'তিমিরবিলাস' তারপর অবশেষে 'তিমিরবিনাশী'

হয়েছি কি?

লোডশেডিং-তাড়িত কালো হৃৎপিণ্ডে আমরা মাছির কালো পাখনায়
'তিমিরবিনাশ'-এর অন্ধ-স্বপ্ন দেখি শতবর্ষের সুদীর্ঘ কালো উড্ডয়নে!
আমাদের পাশ দিয়ে কালো পদক্ষেপে "কালের যাত্রা ধ্বনি" প্রলোভনে শুনিয়েছে :
দাঙ্গা, রক্ত, বিভাজন, বৈরিতা, দ্বৈরথ ও নৈরাজ্যের ছোপ ছোপ কালো ইতিকথা...

প্রগাঢ় তিমির হেনেছে আঘাত
আমাদের বুকের জমিনে
আমাদের এই বাংলায়
আমাদের বসবাসে
আমাদের জীবনে-যৌবনে-পৃথিবীতে
এবং মৃত্যুতে
'সাতটি তারা তিমির'-এ 'তিমির হননের গান'টি অবিরাম শুনিয়াছি
'সাতটি তারার তিমির'-এর তিমির হননের গান'টি অবিরাম শুনিতেছি

অন্ধকার আর কত অন্ধকার হলে আলো আলো বলো ঠিক আলোকেই চাই
প্রকৃত আলোকে চাই জীবনের সঞ্জীবনে...
নিখাঁদ আলোকমালা যার একমাত্র প্রতিশব্দ 'নূর' :
হেরার পাহাড় থেকে কল-কল ছল-ছল প্রবাহিত আলোর মিছিল...

আমরা এখন সব প্রত্যাখ্যান করে সার্বভৌম আলোর মিছিলে যেতে চাই।

www.bjilibrary.com

প্রেরিত মহাপুরুষ ॥ এ না য়ে ত র সূ ল

তখনও ফুটতো বসরাই গোলাপ
পাখিদের কূজনে চোখ মেলতো সমগ্র পৃথিবী
তখনও একদল ছিল অন্ধ
দু'চোখে আঁটা নিরেট অহংকারের ঠুলি
সত্য সুন্দর থেকে পৃথক সব—

নিরেট অন্ধকার সেই ক্লান্তিলগ্নে
এসেছিলে তুমি আলোর মশাল জ্বেলে
ওরা বলেছিল—
আমরাই শক্তিশালী উপাস্য সবার
আর তুমি ছিলে সত্য মিথ্যার মাঝে
সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী—পথপ্রদর্শক
হে প্রেরিত মহাপুরুষ মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম।

হেঁটে যাও মোকামের উচ্চ চূড়ায় ॥ ম হি উ দ্দি ন আ ক ব র

তোমরা স্বীকার করলেই বা কী আসে যায় তাঁর?
অস্বীকারেও বিন্দুমাত্র হবে না ম্লান! তাঁর যে আলোর বলয়—
শত সহস্র সূর্য সে আলোর মাকাম ঘিরে আবর্তিত হয়।

সে আলোর মিনার পরিশুদ্ধ আত্মাকেই শুধু নির্মল করে না
অশুদ্ধ আত্মায় আনে পবিত্রতার প্লাবন,
তাবৎ কলঙ্ক-কালিমা কাল-কালান্তরের ক্ষত চিহ্ন .
নিমেষেই ধুয়ে মুছে পাক সাফ করে দেয়
তাঁর পবিত্রতার ছোঁয়া...

তোমরা স্বীকার করো আর নাই বা করো-
পরশ পাথর কক্ষণো হারাবে না আপন জ্যোতি

অথবা তোমাদের স্বীকৃতির ডামাডোল যতোই পেটাও
তোমরাই হবে ধন্য, হবে আরো—আরো উত্তম,
কক্ষণো ঠকবে না, হবে না প্রতারিত—এখানে
প্রবঞ্চিত হবার কালো ছায়া কক্ষণো ফেলবে না ছাপ।

www.bjilibrary.com

আমিত্বদের কম্বলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও
হাবিয়াখানার লনে,
জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক অহমের ইবলিশ...

তারপর—
যদি বা হৃদয়ের নিভৃত কোণে
অরুণোদয়ের আভা অনুভব করো,
তবে আর বিলম্ব নয়— ঘুরে দাঁড়াও তক্ষুণি
নিজেকে সম্পন্ন মানুষ করে নাও
'উসুয়াতুন হাসানার কোমল স্নানে,
আর
হেঁটে যাও মাকামের উচ্চ চূড়ায়...

শুধু তোমার জন্য হে রাসূল ॥ আ ব দু ল হা লী ম খাঁ

আমি আজো মিটিং মিছিলে যাই
নির্বাচন করি ভোট চাই
গান গাই হাসি
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!
আমি আজো পাহাড় কাটি
পাথর ভাঙি রাস্তা তৈরি করি
ঘরদোর বাঁধি
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!
আমি আজো মাঠ চাষ করি
ধান বুনি পেঁয়াজ রসুন বুনি
বাগানে ফুল ফুটাই
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!
আমি আজো নদীতে নৌকা বাই
পাল তুলি জাল টানি
সাঁতার কাটি
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!
আমি আজো যুদ্ধ করি
মানুষকে ঘৃণা করি

www.bjilibrary.com

মানুষকে ভালোবাসি
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!
আমি আজো আছি
জেগে জেগে ডাকছি:
হে ভাইয়েরা জাগো, বোনেরা জাগো
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!
আমি আজো স্বপ্ন দেখি
কবিতা লিখি ছবি আঁকি
ভালো লাগে শীত গ্রীষ্মকাল
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!
আমি আজো বেঁচে আছি
আরো বেঁচে থাকতে চাই
পৃথিবী সুন্দর করে সাজাতে চাই
শুধু তোমার জন্য হে রাসূল!

নূরনবী ॥ আ ব দু ল কু দ্দু স ফ রি দী

রূপালী চাঁদের মতো রূপময় তোমার জীবন,
কস্তুরী সুরভি যেন পুষ্টারেণু পাপড়ি কোমল
রূপবতী প্রজাপতি শবনম তারা ঝলমল
নীলাভ আকাশে যেন কুমকুম ঊষার কিরণ!

আকাশের মতো তুমি সীমাহীন অসীম বিশাল,
তোমার চলার পথ—ছায়াপথ আলোর সরণি
বহতা নদীতে তুমি বেয়ে চলো পারের তরণী
নিখিল বিশ্বের তুমি অনুপম জানে মহাকাল।

দিবস-রজনী শুধু তোমাকেই ভাবি নূরনবী,
রাতের আঁধারে তুমি দীপশিখা তুমি ধ্রুবতারা,
ঊষার আকাশে তুমি আলোকিত অত্যুজ্জ্বল রবি,
আলোর প্রভাত হাসে, দিকে দিকে পড়ে যায় সাড়া।
তোমার কাছেই আমি বারবার ফিরে ফিরে আসি,
অনন্তর জানি আমি তোমাকে যে কতো ভালোবাসি!

www.bjilibrary.com

সত্যের চাষবাস ॥ আ মি ন আ ল আ সা দ

মরুর আকাশে দুলে ওঠে সোনালী আলোর চাঁদ
প্রকৃতিপাত্রে ঢেলে দেয় কেউ শিল্পিত শরবত
লোকালয় ছেড়ে যায় পালিয়ে অন্ধকারের ফাঁদ
ঝর্ণার মতো আপতিত হয় সুবর্ণ হরকত

মনুষত্বের বাগানে আবার গোলাপ বেলী ফোটে
শীতার্ত প্রাণ পেয়ে যায় আলো উত্তাপ উজ্জ্বলতা
মুক্তির আগুনে শৃঙ্খল ভেঙে শান্তিপাখিরা ছোটে
হারিয়ে সত্তা ম্লান হয়ে যায় মিথ্যার প্রগাঢ়তা

এক লহমায় থমকে দাঁড়ায় হায়েনার উৎসব
সমাজ দেহের পশুশক্তিরা কিম্ভূতকিমাকার
ম্রিয়মাণ হয়ে শঙ্কায় দোলে থামিয়ে কলরব
সুখ নি:শ্বাসে ভরে অন্তর দূর হয় হাহাকার

ক্লান্তির ঘুম ভাঙে প্রদীপ্ত হয় আত্মার উচ্ছ্বাস
চলে উৎসব সোনালী ফলায় সত্যের চাষবাস।

আমার জীবনে ॥ রে জা র হ মা ন

উপদ্রবময় দিনের নীলাভ যাতনা
ব্যথাদীর্ণ পৃথিবীর নিবিড়তা
শূন্যতার মুখোমুখি জীবন চলে কবিতার মতো...

তোমার ঐশ্বর্যের মহিমায়
হেরার বিচ্ছুরিত আলো জেগে ওঠে জীবনে ও মনে
খুলে যায় শান্তির দরজা—

আজন্ম আকণ্ঠ ঋণে হাত জোড়
মাঠে-ঘাটে, সকাল-সন্ধ্যায়
জমে ওঠে মুহূর্ত উল্লাস।

উচ্চারিত অনুচ্চরিত ভাবনার স্রোত বড় বেশী ভাসে
দু:খের কোন ইতিহাস নেই, ভূগোল নেই
হৃদয়ে অন্য কোন স্মৃতিস্থাপকতা নেই
তোমার সৌহার্দ্যই হোক আমার জীবনে
দীর্ঘতম বসন!

www.bjilibrary.com

কামারুম মুনির ॥ ত ম সু র হো সে ন

পৃথিবী তিমিরে পূর্ব পশ্চিম জুড়ে ছিল অসীম অন্ধকার
রাতের তিমিরে ঢাকা পড়েছিল সত্যের সমুজ্জ্বল প্রভা
মেঘের কালো আস্তরণে নিভে ছিল তারাদের হাসি।

আঁধারাবৃত পথে হাঁটতো না ধ্যানমগ্ন বিদগ্ধ পথিক
পথহারা জনতার ছিল না কোন সুনিবিড় শান্তির মোকাম।
নির্বোধ পশুর দাপটে কম্পিত করেছে ভূতল অন্ধ নরাধম।

সুকুমার বোধগুলো চাপা পড়েছিল অনড় কালের পাথরে
সুশীল ভাবনার ছিল না মূল্য পাপদুষ্ট মানুষের কাছে
মদমত্ত উল্লাসে ছুটতো হায়েনারা লবণাক্ত রক্তের নেশায়।

জ্যোতিষ্কের তসবী দুলিয়ে জগতের বুকে এলেন মহান পুরুষ
পাহাড়ের শিলাময় দৃঢ়তায় বিকশিত হলেন তিনি চরাচরে
তাঁর এক হাতে জ্বলে অনাবিল চাঁদ অন্য হাতে পবিত্র কুরআন।

জমাট আঁধার কেটে এলেন পবিত্র কাবার চত্বরে
মানাত হোবলের বুকে হানলেন দুর্মর আঘাত
কুচক্রী ইবলিশের রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ে খান খান হয়ে।

সত্যপন্থী মানুষ ঠাঁই দিলো তাঁকে হৃদয়ের গভীর কন্দরে
যাঁর কথা লিখা আছে জব্বুর তওরাত আর ঈসার ইনজিলে
আরশের পুরোভাগে আলোর অক্ষরে খোদিত বর্ণাঢ্য তাঁর নাম।

খোদার বন্ধু তিনি ত্রিলোকে মৃত্যুহীন ইনসানে কামিল
তিনি অনির্বাণ সিরাজ, বাশিরুন নাজি, কামারুম মুনির
তাঁর নূরে আলোকিত হয় মাগরিব, মাশরিক, শিমাল-জুনুব।

www.bjilibrary.com

জানা নেই ভাষার কারুকাজ ॥ মা সু দা সু ল তা না রু মী

সকাল থেকে বসে আছি সন্ধ্যে অবধি আজ
তোমার প্রশংসা লিখবো বলে
আমার আয়ত্তে নেই এমন ভাষার কারুকাজ।
কতজন অমর হলো তোমার কাসিদা লিখে—
শেখ সাদীর 'বালাগাল উলা' প্রচারিত হলো দিকে দিকে।
সহসা বাজলো কানে মা-আয়েশার সুমিষ্ট সেই বাণী
যেনো ডেকে বলছেন আমায়, তুমি কুরআন পড়নি!
কুরআন আমার রবের আয়াত, আর চলমান কুরআন রাসূল
কুরআন পড়ে জানবে তাঁকে, নেই তাতে কোনো ভুল।

ওগো হিরন্ময় প্রেমিক পুরুষ
স্বীকার করতে নেই কোনো লাজ,
তোমার মহত্ত্ব গৌরব বর্ণনা করি
আমার আয়ত্তে নেই এমন ভাষার কারুকাজ।

www.bjilibrary.com

নিবরাস ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসা

শিক্ষা জগতে এক নুতন দিগন্ত ...

উন্নত মানসম্পন্ন শিক্ষায় আমাদের অঙ্গীকার

নিবরাস ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসা

প্লে থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত (মানবিক ও বিজ্ঞান)

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ফুল টাইম

- মাদরাসা বিভাগ
- তাহ্‌ফিজুল কোরআন বিভাগ
- গার্লস বিভাগ

আরবি ও ইংরেজি মাধ্যম

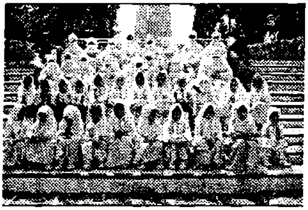

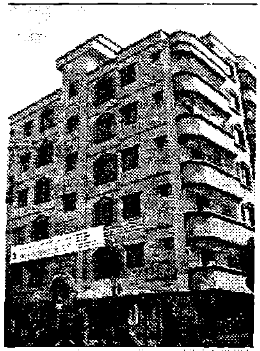

মূল ক্যাম্পাস

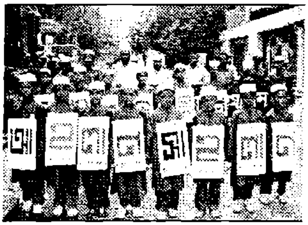

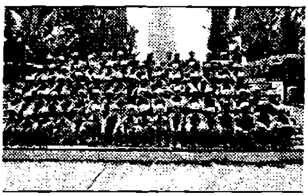

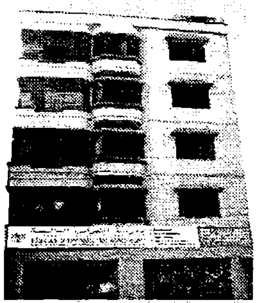

ভবন-২

ভবন-৩

পরিচালনায় : নিবরাস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাড়ী # ১, সড়ক # ৫, ব্লক # ডি, বনশ্রী, (টিভি ভবনের পূর্ব পার্শ্বে), রামপুরা, ঢাকা-১২১৯, ফোন : ৮২৭০৬৪৯
ফ্যাক্স : ৮২৭০৯১৩, মোবাইল : ০১৭১১০৬৯৮৯৮, ০১৫৫২৩৩৬৩৩২, E-mail : nibrasbd@yahoo.com

www.nibrasbd.com

www.bjilibrary.com

সুমাইয়া

মাহবুবুল হক

সুমাইয়া মসজিদে নববীর দক্ষিণ পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। চোখে এখন আর ঝরনার ধারা নেই। আছে খেজুরের রসের মতো কিংবা রাবার গাছের রসের মতো অকিঞ্চিৎ প্রবাহ। ক্ষীণ ধারা। চাঁদের মতো লাবণ্য জড়ানো মুখটা আঠালো হয়ে উঠেছে। যেন অনিমেশ মেঘে ঢাকা তারা! সেই যে যোহরের সময় এসেছে, আর ওঠার নাম নেই! আছর গড়িয়ে এখন মাগরিবের সময়। সামিয়া এসে তম্বি করে :

কী রে বাড়ি যাবি না? দুপুরে তো কিছু খাসনি! রোযাইতো রাখতে পারতিস। খালি কেন যে উপোস করলি! কী হয়েছে তোর? কেন এতো ভেঙ্গে পড়লি?

সুমাইয়া কথা বলে না। ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আকাশে পেঁজা তুলার মতো খণ্ড খণ্ড মেঘ। ওরা ভেসে বেড়ায়। কিন্তু এ যেন দিক-লক্ষ্যহীন ভেসে চলা! আগে মেঘগুলো সুযোগ পেলেই ভূমধ্যসাগরের দিকে ছুটে যেতো। আজকাল আর সরাসরি ওদিকে যায় না। ইয়াসরিবের আকাশেই ঘোরাফেরা করে। নিচের দিকে ঈ যেন খুঁজে ফেরে!

সামিয়া আবার জোর করে, চল্ বাড়ি চল্, এভাবে এখানে পড়ে থাকছিস কেন? কি হয়েছে তোর?

www.bjilibrary.com

সুমাইয়া কথা বলে না। মসজিদের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকার চেষ্টা করে। সামিয়ার টানাটানিতে মোটেও সায় দেয় না।

চল্ না, কিছু খেয়ে গল্প– বলার আসরে বসবি। ওখানে বসলে সব ভুলে যাবি। গল্প বলবি, গল্প শুনাবি– মনটা ভাল হয়ে যাবে।

সুমাইয়া শব্দ করে কেঁদে ওঠে। আর গল্প নেই, গল্প শেষ হয়ে গেছে। কে আর গল্প বলবে? কে শোনাবে জগৎ ও জীবনের সুন্দর সুন্দর কথা? যেসব গল্প শুনে শুনে আমরা অবাক হতাম, মোহিত হতাম, কখনও হাসতাম, কখনও কাঁদতাম, জীবনকে সাজাবার অনুপ্রেরণাও পেতাম, নারীদের কথা, মেয়েদের কথা এমন করে কে আর বলেছে বল? মায়েদের সম্মান, মায়েদের মর্যাদার কথা এমন উচ্চ কণ্ঠে কে আর ঘোষণা করেছে বল?

বলেনি, কেউ বলেনি। শুধু বলেছেন আমাদের প্রিয় নবী। আজ তিনি নেই। তাই বলে আমরা হতাশ হয়ে যাবো? তা হয় না সুমাইয়া, তা হয় না। তিনি তো বলেছেন, মুমিন বান্দা কখনও হতাশ হয় না। তুমি হতাশ হচ্ছো কেন? চলো বাড়ি চলো, তোমার আম্মা না খেয়ে বসে আছেন।

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে নিজের ঘরে ফিরছে। মৃদু-মন্দ বাতাসে তৃপ্তিময় সুঘ্রাণ। আবছা আলো-আঁধারে সামিয়া ও সুমাইয়া মসজিদে নববী থেকে বের হয়।

দুই.

প্রতিদিনের মতো সুমাইয়াদের বাড়িতে আজও গল্পের আসর বসেছে। নাফিয়া, নাজিফা, মুহসিনা, মাহদিয়া, মাহফুজাসহ অন্যারাও এসেছে। আজ গল্প বলার কথা সুমাইয়ার। সামিয়া সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে : প্রিয় নবীর ওফাতে আমরা সবাই ব্যথিত-মর্মাহত। কিন্তু সবার মন এক রকম নয়। আমরা শোক ও দু:খ সামলিয়ে উঠেছি। সুমাইয়া এখনও পারেনি। ও আজ সারা দিন মসজিদে নববীতে বসে কান্না-কাটি করেছে। ও আজ গল্প বলতে পারবে না। আমাদের মধ্য থেকে কাউকে আজ এ দায়িত্ব নিতে হবে। নাফিয়া হাত নেড়ে বলে : ঠিক আছে, আজ আমি তোমাদের গল্প শোনাব। নাফিয়া শুরু করে :

আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সূরা আলে ইমরানের ২০০ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "হে বিশ্বাস অর্জনকারিগণ, তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর।"

সূরা বাকারার ১৫৫ আয়াতে বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করবো। আর তোমাদের জান, মাল ও শস্যের ক্ষতি সাধন করেও পরীক্ষা করবো। [এ পরীক্ষায়] ধৈর্যশীলদেরকে সুখবর দাও।"

সূরা যুমার ১০ আয়াতে বলেছেন, "ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত পুরস্কার পূর্ণভাবে দেয়া হবে।"

www.bjilibrary.com

সূরা শূরার ৪৩ আয়াতে বলেছেন, "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, সেটা তার দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় বহন করে।"

সূরা বাকারার ১৫৩ আয়াতে বলেছেন, "ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

এবার আমি তোমাদের কাছে প্রিয় নবীর বলা একটি গল্প শোনাবো। গল্পটি তোমরা সবাই জান। সুমাইয়া অধীর হয়ে উঠেছে দেখে গল্পটি আমার মনে পড়ে গেল। আশা করি গল্পটি তোমাদের ভাল লাগবে। তবে শোনো–

সোহায়েব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক বাদশাহ ছিল। আর তার ছিল একজন যাদুকর। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন বাদশাহকে বলল, 'আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, কাজেই একটি বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু শিক্ষা দেব।' বাদশাহ একটি বালককে যাদু শিক্ষা দেয়ার জন্য তার কাছে পাঠালেন। তার যাতায়াতের রাস্তায় ছিল এক খৃস্টান দরবেশ। সে তার কাছে বসে তার কথাবর্তা শুনে মুগ্ধ হলো। এভাবে সে যাদুকরের কাছে আসার সময় পথে দরবেশের কাছে বসতে লাগল। যাদুকরের কাছে গেলে সে তাকে মারপিট করল। এতে সে দরবেশের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করল। সে বলল 'যখন তোমার যাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় হবে তখন তাকে বলবে, 'আমার পরিবারবর্গ আমাকে আটকে রেখেছিল।' আর যখন তোমার পরিবারবর্গের ভয় হবে তখন তাদেরকে বলবে, 'যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল।' এমতাবস্থায় একদিন একটা বিরাট জানোয়ার এসে লোকদের পথ আটকে দিল। বালকটি তখন [মনে মনে] বলল, 'আজ আমি জেনে নেব যে, দরবেশ শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ?' তাই সে একটি পাথর খণ্ড নিয়ে বলল : হে আল্লাহ! দরবেশের কাজ যাদুকরের কাজ থেকে তোমার কাছে যদি বেশী পছন্দনীয় হয়, তবে এই জানোয়ারটাকে মেরে ফেল, যাতে করে লোকেরা পথ চলতে পারে। তারপর সে ঐ পাথর খণ্ডটি নিক্ষেপ করল এবং তাতে জানোয়ারটি মারা গেল। আর লোকেরাও চলে গেল। তারপর সে দরবেশের কাছে এসে তাঁকে এ খবর জানাল। দরবেশ তাকে বলল : হে আমার প্রিয় ছেলে! আজ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তোমার ব্যাপারটা এখন আমার মতে একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছেছে। তুমি শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পড়ে যাও, তবে আমার সন্ধান দেবে না। বালকটি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দিত এবং মানুষের সব রকম রোগের চিকিৎসা করত। বাদশাহের পরিষদবর্গের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এ খবর শুনে বালকটির কাছে অনেক হাদীয়া নিয়ে এসে বলল, 'তুমি আমাকে আরোগ্য দান করবে। এজন্যই আমি তোমার জন্য এখানে এত হাদীয়া পেশ করছি।' বালকটি বলল : আমি কাউকেও আরোগ্য দান করি না। আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আন তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব

www.bjilibrary.com

তাতে তোমাকে তিনি আরোগ্য দান করবেন। সে তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। আল্লাহ্ তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে বাদশাহের নিকট পূর্ববৎ বসে গেল। বাদশাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমাকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিল? সে উত্তর দিল 'আমার রব বা প্রভু।' বাদশাহ বলল : আমি ছাড়াও কি তোমার রব আছে? সে বলল, আল্লাহ্ই তোমার ও আমার রব। এতে বাদশাহ্ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে বালকটির কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে আনা হলো। বাদশাহ্ তাকে বলল, 'হে প্রিয় ছেলে! তোমার যাদুবিদ্যার খবর পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করে থাক এবং এটা-সেটা আরও কত কি করে থাক!' বালকটি বলল, 'আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। আরোগ্য তো আল্লাহ্ই দান করেন।' এতে বাদশাহ্ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে খৃস্টান দরবেশের কথা বলে দিল। তখন দরবেশকে আনা হলো এবং তাকে তার দীন থেকে ফিরে আসতে বলা হলো। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন বাদশাহ্ করাত আনতে বলল। তারপর করাতটি তার মাথার মাঝখানে রাখা হলো এবং করাতটি তাকে চিরে ফেলল, এমন কি দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে আনা হলো। তাকেও তার দীন থেকে ফিরে আসার জন্য বলা হলো। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন তাকে বাদশাহ্ তার কতিপয় সংগীর কাছে দিয়ে বলল, 'তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে ওঠাও। যখন পাহাড়ের উচ্চ শিখরে তাকে নিয়ে পৌঁছবে তখন যদি সে তার দীন থেকে ফিরে আসে, তবে তো ঠিক নতুবা তাকে সেখান থেকে ফেলে দাও।' তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠল। সে বলল, 'হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে চাও এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান কর।' তখন পাহাড়টি কেঁপে উঠল। এতে তারা পড়ে গেল। আর সে বাদশাহের কাছে চলে এল। বাদশাহ্ তাকে বলল, 'তোমার সংগীদের কি হলো?' সে বলল, 'তাদের ব্যাপারে আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' তখন বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সংগীদের কাছে দিয়ে বলল, 'তাকে তোমরা একটি ছোট নৌকায় উঠিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। তারপর সে যদি তার দীন থেকে ফিরে না আসে, তবে তাকে সেখানে ফেলে দাও।' তারা তাকে নিয়ে চলল। ছেলেটি বলল, 'হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে চাও তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও।' এতে নৌকা তাদেরকে নিয়ে ডুবে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরল। আর ছেলেটি বাদশাহের কাছে চলে এল। বাদশাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সংগীদের কি হলো?' সে বলল, 'আল্লাহ্ই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হয়েছেন।' তারপর সে বাদশাহকে বলতে লাগল, 'তুমি আমার হুকুম অনুযায়ী কাজ করলেই আমাকে হত্যা করতে পারবে।' বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কি কাজ?' সে বলল, 'একটি মাঠে লোকদেরকে একত্র কর। তারপর আমাকে শূলের ওপর ওঠাও এবং আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝখানে রেখে বলো, বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম [অর্থাৎ বালকটির রব সেই আল্লাহর নামে তীর মারছি।] এই বলে তীর

www.bjilibrary.com

মার। এমনটি করলে তুমি আমাকে মারতে পারবে।' বাদশাহ তখন এক মাঠে লোকদেরকে একত্র করে শূলের ওপর উঠিয়ে তার তীরদানি থেকে একটি তীর ধনুকের মাঝখানে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম' এবং তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি বালকটির কানের কাছে মাথায় লাগল এবং সেখানে তার হাত রাখল। তারপর সে মারা গেল। এতে লোকেরা বলতে লাগল, 'আমরা বালকটির রব আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।' এ খবর বাদশাহের কাছে গেলে তাকে বলা হলো যে আশংকা তোমার ছিল তাই তো হয়ে গেল যে, সব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। বাদশাহ তখন রাস্তার পাশে গর্ত খোঁড়ার হুকুম দিলো। তারপর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালান হলো। বাদশাহ ঘোষণা দিলো, 'যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে আসবে না তাকে তোমরা এতে নিক্ষেপ কর।' যারা তাদের দীন থেকে ফিরে এল না তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। অবশেষে একজন মহিলা তার সন্তানসহ এল। সে আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করায় সন্তান বলল, 'হে আম্মা! আপনি সবর করুন [অর্থাৎ আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করবেন না]। কারণ আপনি তো সত্যের ওপর আছেন।'

পরে তাদের আর একটি বাচ্চা হয়। আনাস [রা] [এ হাদীসের বর্ণনাকারী] বলেন : আবু তালহা আমাকে এ বাচ্চা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে বলল এবং তার সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, "তোমাদের সাথে কোন কিছু আছে কি?" তিনি বললেন, "হাঁ, কিছু খেজুর আছে।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খেজুর নিয়ে চিবালেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। আর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। [বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উয়ায়না বলেন : আনসারদের একজন লোক বললেন, [অর্থাৎ আবু তালহার পুত্র] আবদুল্লাহর নয়টি সন্তান দেখেছি। তারা প্রত্যেকেই কুরআন পড়েছে। মুসলিমের এক বর্ণনায় এমন আছে : আবু তালহার ছেলে ইন্তিকাল করলে তার মাতা উম্মে সোলাইম বাড়ির লোকদেরকে বললেন, তারা যেন আবু তালহাকে ছেলে সম্পর্কে কিছু না বলে। তিনি নিজেই তাঁকে যা বলার বলবেন। আবু তালহা বাড়িতে এলে উম্মে সোলাইম তাঁকে রাতে খাবার দিলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া করলেন। তারপর উম্মে সোলাইম নিজেকে স্বামীর জন্য পূর্বের চেয়ে বেশী সুন্দর করে সাজালেন। আবু তালহা তাঁর সাথে মিলন করলেন। উম্মে সোলাইম যখন দেখলেন, আবু তালহা তৃপ্তি লাভ করেছেন এবং তার প্রয়োজন মিটে গেছে, তখন তাকে বললেন, "হে আবু তালহা! দেখুন, যদি কোন কাওম কোন পরিবারকে কিছু ধার দেয়, তারপর সেই ধার ফেরত চায় তবে কি সেই পরিবার তাদের ধার ফেরত না দেয়ার অধিকার রাখে?" আবু তালহা বললেন, "না।" উম্মে সোলাইম বললেন, তাহলে আপনার ছেলের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সওয়াব প্রার্থনা করুন। "আবু তালহা এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "তুমি আগে কিছু বললে না, এমন কি আমি মিলনের কাজও করে ফেললাম।

www.bjilibrary.com

আর তারপরে আমার ছেলে সম্পর্কে খবর দিলে! "তিনি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে সব খবর বললেন। রাসূলুল্লাহ [সা] দোয়া করলেন, "আল্লাহ তোমাদের দু'জনের রাতে বরকত দিন।" তারপর উম্মে সোলাইম গর্ভবতী হলেন। কোন এক সফরে তিনি [আবু তালহাসহ] রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ [সা] সফর থেকে মদীনায় সাধারণত রাতে ফিরে আসতেন না। যা হোক, তারা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন উম্মে সোলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হলো। এজন্য আবু তালহা তাঁর নিকট রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ [সা] চলে গেলেন। বর্ণনাকারী আনাস [রা] বলেন : আবু তালহা বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! তুমি জান যে, রাসূলুল্লাহ [সা] কোথাও যখন যান এবং কোথাও থেকে ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে সাথে থাকতে আমার ভাল লাগে। আর এখন তো আমি এখানে যে কারণে আটকে পড়লাম তা তুমি দেখছ।" উম্মে সোলাইম [রা] বলতে লাগলেন, হে আবু তালহা! আমি যে বেদনা অনুভব করছিলাম, এখন আর তা বোধ করছি না। চলুন যাই। "আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। মদীনায় আসার পর তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হলো এবং একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। আনাস [রা] বলেন, আমার আম্মা আমাকে বললেন : এ বাচ্চাকে সকালে কেউ দুধ পান করাবার আগে তুমি একে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও।" সকাল বেলা আমি বাচ্চা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। এভাবে তিনি হাদীসটির বাকি অংশ বর্ণনা করছেন।

গল্পের আসর শেষ হয়। খেজুরের পিঠা নিয়ে সবাই হৈ চৈ করে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে সুমাইয়াকে মধ্যমণি করে ওরা গান গায়। সুমাইয়াকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে অন্য সবাই বিদায় নেয়। সামিয়া থেকে যায়, বলে, "আমি থাকলে ওর মনটা যদি ভালো হয়! আব্বা-আম্মাকে বলে এসেছি কোন অসুবিধা হবে না।" সুমাইয়ার আম্মা খুব খুশী হন। বলেন, "এমন না হলে সই হয় কী রে!"

তিন.

নামায-খাওয়া সেরে সামিয়া ও সুমাইয়া এক বিছানায় শোয়। সুমাইয়ার ব্যবসায়ী ভাই এসে মায়ের সাথে কথা বলে। সুমাইয়ার কথা জানতে চায়। সুমাইয়া উঠে গিয়ে ভাইয়ের সাথে দেখা করে। "কীরে, তোর নাকি মন খারাপ, তোকে এবার আমরা বিয়ে দেবো। বিয়ে দিলেই তোর মন ভাল হয়ে যাবে" বলে সুমাইয়াকে আদর করে ভাইয়া আব্বাস। সুমাইয়া কিছুই বলে না। ধীরে সুস্থে ফিরে আসে নিজের কামরায়। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই সামিয়া প্রশ্ন করে : আচ্ছা সত্যি করে বলতো, তোর মনটা আজ এতো খারাপ হয়েছিল কেন?

– প্রিয় নবী নেই! কার কাছ থেকে আমরা সুন্দর সুন্দর গল্প শুনবো? যখনই একথা আমার মনে পড়েছে, মনটা আমার ঘোর বিষণ্নতায় ঢেকে গেছে। চারদিকে আমি শুধু

www.bjilibrary.com

অন্ধকার দেখেছি। দেখেছি অন্ধকারের চাদরে ঢেকে গেছে ইয়াসরিবের এই নগরী। আমি আলো আলো করে আলোর আশায় মসজিদে নববীতে ছুটে গিয়েছিলাম। ওখানে যাওয়ার পর আমার হৃদয়ের অন্ধকার ধীরে ধীরে দূর হয়ে আলোর মশাল জ্বলতে শুরু করছিলো। আমাকে কে যেন কানে কানে বললো : পড়শিদের মধ্যে গল্প বলার যুবক আছে, খুঁজে নে। নবীজীর জন্য দু:খ তো হবে, কিন্তু উনিতো তাঁর একান্ত প্রিয় মাবুদের কাছে চলে গেছেন। তাঁর জন্য দোয়া কর, দরুদ পড়। তাঁর মতো চলার চেষ্টা কর।

– কথাটা আমিও তোকে বলবো বলবো বলে ভাবছিলাম, তুই যদি কিছু মনে না করিস।

– আমি জানি আজ তোকে এখানে কে থাকতে বলেছে, তাও আমি জানি।

সামিয়া সুমাইয়াকে জড়িয়ে ধরে, "তুই আসলেই আমার সই। তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস।"

– পারবো না কেন? আব্বাস ভাইয়াকে তো তোর কথা বলেছি, বলে কি না বিয়ে-শাদী করতে অনেক দিরহাম লাগবে। আগে ব্যবসা করে কিছু আয়-উপার্জন করে নিই।

– থাক, এখন ওসব। মাসউদ ভাইয়া যা গল্প জানে–

– আমার চেয়েও বেশী?■

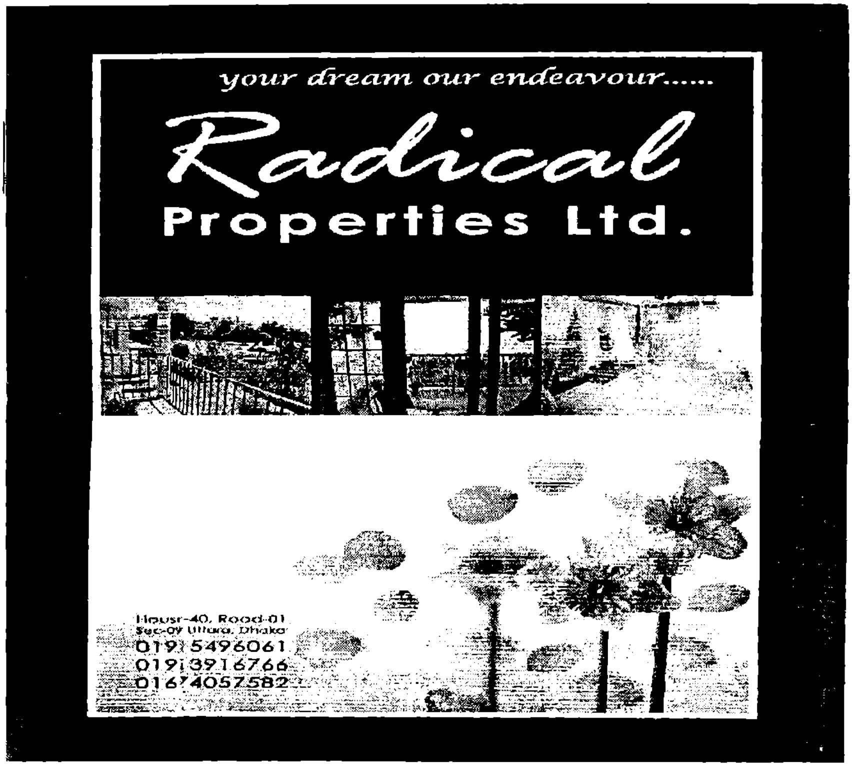

www.bjilibrary.com

মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ও বর্তমান সময়ের প্রয়োজন

প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের

নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আদর্শকে বাদ দিয়ে যেই বস্তুবাদী সভ্যতা একদিন মানব সমাজের কাঁধে চেপে বসেছিল সেই সভ্যতা আজ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাকা'-এর মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ঐশী জ্ঞানের যে প্রদীপ্ত মশাল হাতে নিয়ে একদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] হেরা গুহা হতে বেরিয়ে পড়েন সেই জ্ঞান এককালে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ধারায় অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। খোলাফা আল রাশিদুন ও উমাইয়া শাসনের পর ৭৫০ ঈসায়ী সালে আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলমানদের একক পদচারণা ছিল। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। বায়তুল হিকমাহ দারুল হিকমাত প্রভৃতি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সময় মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান জগতে পুরো বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু ক্রমে জ্ঞান চর্চায় মুসলিম অবদান স্তিমিত হয়ে আসে। ফলে ইসলামী সভ্যতায় ক্ষয়িষ্ণু ভাব পরিলক্ষিত হয়।

১১ শ' শতাব্দী হতে ১৩ শ' শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের এই পশ্চাদপদতার সুযোগে এক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে ইউরোপীয় সভ্যতা। কিন্তু ১৪ শত শতাব্দীর মাঝামাঝি

www.bjilibrary.com

পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নেতৃত্ব চলে যায় সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়দের হাতে। স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের পর বিশ্ব মানচিত্রে মুসলিম আধিপত্যের যবনিকাপাত ঘটে। অত:পর বিশ্বসভ্যতা কিংবা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানগণ কোনো উল্লেখযোগ্য ও অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি, এমন কি খ্রিস্টান চার্চের অধীনে ধর্মযাজকগণ রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী যে অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে এ সময়ও মুসলমানগণ সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে যাজকতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্টি হয় উদার নৈতিকতাবাদ। অতঃপর এ থেকে সৃষ্টি হয় সেক্যুলার চিন্তাধারাপ্রসূত ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ।

উদার নৈতিকতাবাদ নীতি-নৈতিকতাহীন ও মানবিক মূল্যবোধবিরোধী বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ কাঠামোতে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত করতে সক্ষম হলেও বস্তুত তা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং বলা যায়, মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সমাজ কাঠামোর গুণগত মানোন্নয়নে এই মতবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অপর দিকে পুঁজিবাদের নামে অবাধ শোষণ, নিপীড়ন এবং স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা সামাজিক সাম্য ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে মোটেই সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়নি যার ফলশ্রুতিতে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম নেয় সমাজবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। এই ব্যবস্থায় মাত্র হাতেগোণা কিছুসংখ্যক লোকের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকার কারণে বিপুল জনশক্তি তাদের শ্রম, মেধা ও যোগ্যতার যথাযথ কদর না পাওয়ায় অচিরেই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে চাপা ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে, যা একদা গণবিস্ফোরণে রূপ নেয়। ফলে মাত্র অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করার পূর্বেই সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জাদুঘরে প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত হয়।

সমাজতন্ত্রের পতনের পর ইসলামী আদর্শবাদ এই শূন্য স্থান পূরণে এগিয়ে আসবে এটাই ছিল সময়ের দাবি। কারণ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অদ্যাবধি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এতে রয়েছে অনবদ্য ও অবিকৃত ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন এবং সৃষ্টির সেরা মানব মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর সুন্নাহ তথা অনুপম আদর্শ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এ দু'টি উৎস একদা বিশ্বমানবতার সার্বিক সমস্যার সমাধানে দিকনির্দেশনা দানে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এখনো মানব জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগে উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধান দিতে সক্ষম। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক অনৈক্য ও বিভক্তি, উম্মাহর Concept সম্পর্কে অজ্ঞতা, ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য পাশ্চাত্যের তোষণনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাদপদতা, অসমসামরিক শক্তি, অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধানের চিন্তা-চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দর্শনের প্রভাব, সর্বোপরি সুবিধাবাদী নীতি ও আচরণ, সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব প্রভৃতি মুসলিম বিশ্বকে সমাজতন্ত্রের এই শূন্য স্থান পূরণপূর্বক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্বে গ্রহণের পথ হতে বিরত রাখে। আর এ কাজে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এগিয়ে আসে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত শক্তিশালী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

www.bjilibrary.com

মুসলিম বিশ্ব যাতে কোনদিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়াতে না পারে এ জন্য পশ্চিমা বিশ্ব সদা তৎপর। এ দিকে মুসলিম বিশ্ব আজ ভুলতে বসেছে নিজেদের সঠিক পরিচয়। এ পৃথিবীতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং খলিফা হিসেবে তাদের করণীয় সম্পর্কে আজ তারা উদাসীন। সুদীর্ঘ সময় অবধি অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র পাশ্চাত্যের কলোনি ও শাসন-শোষণের অক্টোপাসে বন্দী থাকায় এবং পশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার আদলে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব অঞ্চলে জনগণ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার কারণে মুসলিম মিল্লাত আজ তাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলিম মিল্লাতের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হলো তাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান লাভে এগিয়ে আসা এবং অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারপূর্বক এর বিকাশ সাধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মহান রাব্বুল আলামীন তাদেরকে খিলাফতের জিম্মাদারি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর নির্দেশিত পথে নিজেদের শ্রম, মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতার সর্বাত্মক ব্যবহারের মাধ্যমেই কেবল এই জিম্মাদারি আদায় হতে পারে। ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে সমন্বয় সাধনপূর্বক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা এ কাজে প্রধান সহায়ক হতে পারে বলে আশা করা যায়। এজন্য প্রয়োজন মুসলিম মিল্লাতের মাঝে সচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টি করা। এই পদক্ষেপ গ্রহণে মুসলিম শাসকদেরকে সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এর ওপর নির্ভর করছে গোটা বিশ্বের ভবিষ্যৎ। সুতরাং এই পদক্ষেপ গ্রহণে যত দেরি হবে বিশ্বমানবতার ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয়টিও সমপরিমাণে পিছিয়ে যাবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হিলফুল ফুজুল'-এর ধারণা এ ক্ষেত্রে আমাদের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

মদিনা হিজরতের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] মদিনার সকল গোত্র ও মদিনায় বসবাসকারী সকল ধর্মের লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মদিনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, সামাজিক শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকলের সমন্বয়ে 'মদিনা সনদ' নামে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই সনদের মাধ্যমে তিনি একটি 'উম্মাহ'র প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে ইসলামের অগ্রযাত্রায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে দ্বিধা-বিভক্ত মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধকরণ, তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং ইসলামী দুনিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হুমকিমুক্ত করার লক্ষ্যে মদিনা সনদের আদলে 'মুসলিম জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠিত এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই সংগঠনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যাদি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এর মাধ্যমেই পুঁজিবাদী বিশ্বের সকল ষড়যন্ত্র ও আধিপত্যবাদী নীতির যথাযথ সমালোচনা ও সময়োচিত জবাব দিতে হবে। তাছাড়া মদিনা সনদের আলোকে ন্যূনতম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথেও কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। এতে করে মুসলিম বিশ্বের Common Enemy-এর সংখ্যা হ্রাস পাবে।

www.bjilibrary.com

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পশ্চাদপদতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের অনগ্রসতার সুযোগে কূটকৌশলের মাধ্যমে পরাশক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে তাদের স্বার্থ হাসিল করে যাচ্ছে। সামরিক কিংবা আদর্শিক দিক দিয়ে যেসব দেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে সুকৌশলে তাদের এ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য জাতিসংঘকে কাজে লাগানো হচ্ছে, আর এক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রেস মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান 'জাতিসংঘ' নামক বিশ্ব সংস্থাটি আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। এই সংস্থা মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থ রক্ষায় দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইরান ও সুদানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এদেশ দুটোকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে নিঃশেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে। ইরাক ও লিবিয়া সামরিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলে তাদের সামরিক স্থাপনাসমূহ নিঃশেষপূর্বক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বিচ্ছিন্ন করার কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে। আফগানিস্তান হতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বিতাড়িত হওয়ার পর সেখানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আফগান জনগণের ইসলামী জযবা খতম করে সেখানে জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ লাগিয়ে দেয়। সকল ষড়যন্ত্রের অর্গল ভেদ করে সেখানে তালেবানের নেতৃত্বে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই সরকারকে উসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পৃক্ততার অজুহাতে আন্তর্জাতিক বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। অতঃপর ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর এই হামলার সাথে উসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরের সম্পৃক্ত থাকার কল্পিত অভিযোগ তোলে যা প্রমাণ করতে আমেরিকা পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এছাড়াও সন্ত্রাসে মদদ দান, নারী অধিকার খর্ব করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অজুহাত তোলে ২০০২ সালে সামরিক হামলা চালিয়ে আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে উৎখাত করে সেখানে হামিদ কারজাঈ-এর নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ পুতুল সরকারের প্রতিষ্ঠা করে এবং তালেবান নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন ও নিঃশেষ করে দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম অধ্যায়ের সূচনা করে। অপর দিকে ১৯৯১ সালে থেকে ইরাকের ওপর জাতিসংঘের অবরোধ আরোপ করে আমেরিকা ও ধনী মুসলিম দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। অত:পর এর তেল সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য এবং ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে হুমকিমুক্ত করার লক্ষ্যে ইরাকে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র থাকার মিথ্যা, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলে তার ওপর বর্বরতম ইঙ্গো-মার্কিন সামরিক হামলার চালায় যা চেঙ্গিসি বর্বরতাকেও হার মানায়। বিশ্ব ইতিহাসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এরূপ নিষ্ঠুরতম নিদর্শন করে আছে বলে আমাদের জানা নেই। সাদ্দামকে উৎখাতের নামে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও সামরিক স্থাপনাসহ ইরাকের সকল অবকাঠামো ও বিশ্বসভ্যতার প্রাচীন প্রত্নসম্পদ ধ্বংস করার পর আমেরিকা আজ সিরিয়া ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ওপরও সামরিক অভিযান চালানোর হুমকি দিচ্ছে।

www.bjilibrary.com

আলজেরিয়া ও তুরস্কে ইসলামী সরকারের পতনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা দেশগুলোর সামরিক জান্তা ও সেক্যুলার দলগুলোকে ন্যাক্কারজনকভাবে ব্যবহার করে গণতন্ত্রের বিকাশধারাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে এবং আমেরিকার চক্রান্তের কারণেই তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের নেতা নাজমুদ্দীন আরবাকানকে রাজনীতি হতে চিরতরে বিদায় নিতে হয়, অথচ বার্মার সামরিক জান্তার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রীকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে দ্বৈত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের মদদদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ আরোপ করে এর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে। ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচিকে তারা বরদাশত করতে পারছে না। ফলে এ দেশটির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ব্যানারে ষড়যন্ত্র চালিয়ে দেশটিকে বিশ্ব সম্প্রদায় হতে বিচ্ছিন্ন করার সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে যাচ্ছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়ন না করে জাতিসংঘ দ্বৈত নীতি গ্রহণ করেছে। অপর দিকে কাশ্মীরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করা হচ্ছে। চেচনিয়ার জনগণ রাশিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও অমুসলিম রাষ্ট্র তো দূরের কথা, কোন মুসলিম রাষ্ট্র পর্যন্ত এদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে এদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সন্ত্রাসবাদী রাশিয়া প্রয়োজনীয় সব কিছু করেছে, অথচ কোন মুসলিম রাষ্ট্রই চেচেন মুজাহিদদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি। কসবোতেও চলেছে মুসলিম নিধন। এমতাবস্থায় মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত প্রয়াস ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যতীত তাদের আত্মরক্ষার আর কোন পথ আছে বলে আমাদের জানা নেই। 'মুমিনগণ পরস্পর ভ্রাতৃতুল্য' এবং 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় থেকে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে' আল কুরআনের প্রভৃতি আয়াত এবং 'মুসলিমগণ পরস্পর অট্টালিকাতুল্য যার এক অংশ অপর অংশকে সুস্থিত মজবুত রাখে' এবং 'সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে মুমিনগণ একই দেহের ন্যায় যার কোন অঙ্গে আঘাত লাগলে তা পুরো দেহে সঞ্চারিত হয়' মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রভৃতি বাণীর আলোকে মুসলিম মিল্লাতকে সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করতে হবে। বর্তমানে কেবল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেই মুসলমানদের আত্মরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় বলে আমরা মনে করি।

আরব বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয়, বরং অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে, অথচ দেখা যায়, সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ব্যাংকে গচ্ছিত রাখছে। পাশ্চাত্যের এসব দেশ কোন না কোন অজুহাত কিংবা ইস্যু সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করে ফেলা অস্বাভাবিক নয়। এতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসহ পুরো মুসলিম উম্মাহর স্বার্থহানি হবে। সুতরাং বিত্তবান

www.bjilibrary.com

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উচিত অসচ্ছল ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর আর্থিক সমস্যা লাঘবে এগিয়ে আসা। 'সম্পদ শুধু' ধনীদের মাঝেই আবর্তিত হবে না। আল-কুরআনের এই আয়াত অনুসরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করা সচ্ছল মুসলিম দেশগুলোর নৈতিক দায়িত্ব শুধু তাই নয়, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থে পৃথক রাষ্ট্র সংঘ, কমন মার্কেট, ইসলামী অর্থ তহবিল প্রভৃতি গঠনের বিষয়টিও বর্তমানে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে। তা ছাড়া সকল মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য একই ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন করা গেলে গোটা ইসলামী দুনিয়া এ দ্বারা ব্যাপক কল্যাণ লাভ করতো বলে আমার বিশ্বাস।

মুসলিম বিশ্বে আধুনিক শিক্ষার্থে শিক্ষিত হওয়ার মতো যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকলেও সত্যিকার মুসলিম এবং আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির কর্মসূচি এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। পাশ্চাত্যের প্রভাব কিংবা অন্ধ অনুকরণের ফলে এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এবং তারা নিজেদের জাতীয় ধ্যান-ধারণা, আদর্শ-ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আলোকে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেনি। এটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] মদিনা হিজরতের পর মসজিদে নববীতে 'সুফ্‌ফ' কেন্দ্রিক যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তার সিলেবাস ও কারিকুলাম তাঁর ওপর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আল-কুরআনের পাঁচটি আয়াতেই বিদ্যমান। এসব আয়াতে দীনের বুনিয়াদি বিষয় হতে শুরু করে সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন পর্যন্ত সব কিছুকেই জ্ঞানার্জনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একে সামনে রেখে মুসলিম বিশ্ব যতদিন পর্যন্ত নিজেদের আদর্শের অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে না পারবে ততদিন আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি হওয়া দুরূহ ও দুঃসাধ্য হবে। তা'লীম-তারবিয়্যাত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হলেও এ প্রচেষ্টার ইতিবাচক ফলাফল সুদূর পরাহত। অধিকন্তু পরিবেশ–পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে এ প্রয়াস অনেক সময় পণ্ড শ্রমে পর্যবসিত হতে পারে। আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক প্লেটো যে দর্শন দিয়েছেন তা বর্তমানে অকার্যকর। তাছাড়া তার দর্শনের আলোকে পৃথিবীতে কখনো কোন আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তা হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। তার প্রস্তাবিত আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। পক্ষান্তরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] আল কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মদিনায় আদর্শ, কল্যাণ, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের সর্বোত্তম নমুনা। সুতরাং আমাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] কর্তৃক প্রদত্ত ও অনুসৃত পন্থায়ই কেবল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে হবে।

আর এ আন্দোলনের কর্মী বাহিনী হবে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত এবং নৈতিকতার শক্তিতে বলীয়ান। এটি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিম বিশ্বকে আজ নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে নৈতিকতাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও এর আধুনিকীকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমার বিশ্বাস, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও এর সাথে

www.bjilibrary.com

আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ব্যতীত একবিংশ শতকের জাহিলিয়াতের সকল চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যোগ্যতা অর্জন এবং তাগুতি শক্তির যথাযথভাবে মুকাবিলা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। বর্তমানে ১৩৫ কোটি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মুসলিম বিশ্বে মাত্র ৪৫ হাজার বিজ্ঞানী বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত আছেন, অথচ মাত্র ৪৫ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলে বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত আছে ৩৫ হাজার বিজ্ঞানী। ফলে মুসলিম বিশ্বের প্রযুক্তিগত আবিষ্কার উদ্ভাবনী তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আর যা কিছু অর্জন তাও পাশ্চাত্যের তদারকি ও নজরদারির আওতাধীন। যতদিন মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে না পারবে ততদিন তারা পাশ্চাত্যের প্রভামুক্ত হতে পারবে না। ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে ফরজ করে দিয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ দুশমন ও মুসলমানদের দুশমনের সাথে মুকাবিলা করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করাও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখার কথা বলা হয়েছে যাতে দুশমনের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত হয়। উন্নত বিশ্ব বর্তমানে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের অধিকারী। যদি মুসলিম বিশ্ব এর চাইতেও উন্নততর ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের অধিকারী না হয় তবে ইসলামবিরোধী শক্তির হৃদয়ে কোন প্রকার ভীতি সঞ্চারিত হবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] খায়বর দুর্গ দখলের সময় মানজানিক নামক অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করে প্রতিরক্ষায় অত্যাধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারে যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। আর তাঁর ব্যক্তিত্বের ভীতি ১ মাস সফরের দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে। যদি বর্তমানে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের অধিকারী হতো তাহলে অবশ্যই ইসলামবিরোধী শক্তি মুসলমানদের ওপর আগ্রাসন চালানোর সাহস করতো না। অতএব, মুসলিম বিশ্বকে বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে ইবাদত মনে করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদেরকে মুসলিম বিশ্বের চাইতেও শ্রেষ্ঠতর ও উন্নততর মনে করে। আমরা তাদের এই দাবিকে একেবারে অস্বীকার করি না। কারণ তাদের জাগতিক উন্নতি আছে, অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আছে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প-সাহিত্যে উৎকর্ষতা আছে। এত কিছুর পরও তাদের যে জিনিসটির সব চাইতে বেশি অভাব তা হলো মনুষ্যত্ববোধ, মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক চরিত্র। এর একমাত্র কারণ হলো তাদের নিকট বর্তমানে কোন নির্ভুল ঐশী গ্রন্থ নেই এবং নিষ্কলুষ চরিত্রসম্পন্ন সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শবান ব্যক্তির জীবনাদর্শ তাদের নিকট অনুপস্থিত। ফলে তারা আজ আদর্শিকভাবে চরম দেউলিয়া, মানবাকৃতির হয়েও মানুষ পদবাচ্যের অযোগ্য। তাদেরকে প্রকৃত মানুষ ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গঠন করার প্রধানতম দায়িত্ব 'খায়রে উম্মাত' তথা সর্বোত্তম জাতি হিসেবে আমাদের ওপর বর্তায়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে গভীর সঙ্কটে

www.bjilibrary.com

নিমজ্জিত। তাছাড়া আত্মপরিচয়ে ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কেও তারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী নয়। মুসলিম যুব সমাজও আজ অপসংস্কৃতির সয়লাবে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এসব সঙ্কট হতে উত্তরণের উপায় হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ। যদি মুসলিম বিশ্ব মানবসম্পদ উন্নয়ন, পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি জোরদার, বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, উন্নত সামরিক সরঞ্জাম হস্তগতকরণ এবং শক্তিশালী গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমের বিকাশ সাধনপূর্বক তাদের সোনালি ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম না হয় তবে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বিজাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও তথাকথিত বৃহৎ শক্তি আমাদের স্কন্ধে চেপে বসবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] বলেন, এমন একদিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি তোমাদের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করবে যেভাবে ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ করে। জনৈক প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন : আমরা কি সেদিন সংখ্যায় খুব নগণ্য হয়ে যাবো? মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বললেন : না, বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। কিন্তু তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বলতে কিছু থাকবে না, বরং তোমাদের ওজন পানির উপরস্থিত ফেনার ন্যায় হালকা হবে। তোমাদের শত্রুর অন্তরে তোমাদের সম্পর্কে যে ভীতি বিদ্যমান ছিল তা দূর হয়ে যাবে এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা প্রবেশ করবে। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ [সা]! সেই দুর্বলতাটা কী? মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বলেন : দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] আরো ইরশাদ করেন : অচিরেই মুসলিম উম্মাহর ওপর ফিতনা তথা বিপর্যয় নেমে আসবে। বর্ণনাকারী হারিস আল আওয়ার জিজ্ঞেস করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ [সা]! এই বিপর্যয় হতে আত্মরক্ষার উপায় কী? মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বলেন : কেবল আল্লাহর কিতাব তা আল কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণ। এতে অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলি, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ও পারস্পরিক ব্যবহারিক জীবনের দিকনির্দেশনাসহ সকল কিছু বিদ্যমান। এর বিরোধিতা করলে ধ্বংস অনিবার্য। এই গ্রন্থকে বাদ দিয়ে হিদায়াত অন্বেষণ করা হলে তাতে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। এটি আল্লাহর মজবুত রশি, বিজ্ঞানময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপদেশ। এতে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সঠিক পথের দিশা রয়েছে। যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ অনুসরণ করে বক্তব্য রাখবে তার বক্তব্য যথার্থ হবে, যে এটি অনুসরণ করবে সে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে, আর যে এটি অনুসরণ করে বিচার-ফায়সালা করবে সে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। আর যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানাবে তাকে হিদায়াত প্রদান করা হবে।

অতএব, আমাদেরকে আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'আল আমর বিলমারূফ' তথা সুবৃত্তির উন্মেষ এবং 'আন নাহি আনিল মুনকার' তথা সংবৃত্তি নির্মূলে কর্মসূচি গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রথমে আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংশোধনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর মুসলিম বিশ্বের সার্বভৌমত্বের হেফাজতের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই করতে মুসলিম বিশ্বকে পারস্পরিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। মহানবী হযরত

www.bjilibrary.com

মুহাম্মাদ [সা] যেই পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতায় যে ধরনের কর্মসূচি দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন আমাদেরকেও তার অনুসরণ করতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর জীবন ও আদর্শই হচ্ছে আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুপম আদর্শ, যা অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল উম্মাহ তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম।

সবশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করে আমি এই প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই :

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কী হলো? তোমরা কেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছো না, আর সংগ্রাম করছো না নির্যাতিত নিপীড়িত নারী, পুরুষ ও শিশুদের স্বার্থে, যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ হতে নিষ্কৃতি দাও, তুমি আমাদের জন্য আমার কাছে থেকে অভিভাবক ও সহায্যকারী পাঠাও।"■

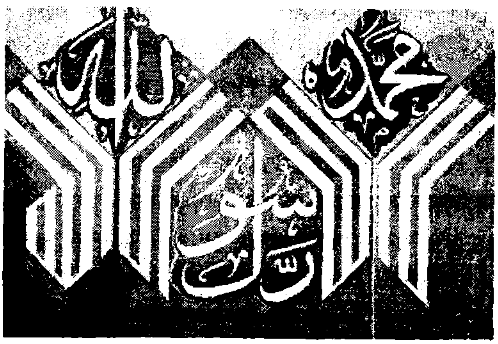

www.bjilibrary.com

মহানবী [সা]-এর আদর্শ রাষ্ট্র

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

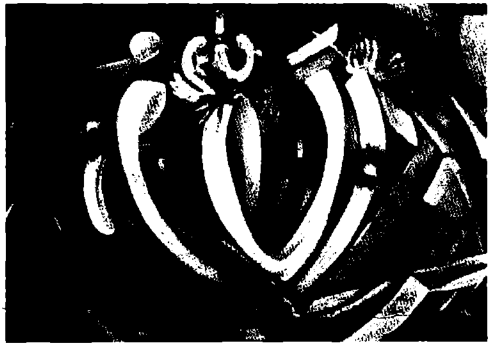

মহানবী মুহাম্মাদ [সা]-এর আবির্ভাবের সময় আরব দেশ বহু গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত ছিলো। বিভিন্ন এলাকা গোত্রপতিদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। সেখানে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করত। মূলত সেটাকে শাসন না বলে নৈরাজ্য বলাই অধিকতর সমীচীন। কারণ কোথাও কোন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল না, নীতি-নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ইত্যাদি কোনো কিছুর বালাই ছিলো না সেখানে। সর্বত্র এক নৈরাজ্যকর, শোষণ-জুলুম, অন্যায়-অবিচার, অনৈতিক-অশ্লীল অবস্থা বিরাজমান ছিলো। সমগ্র দেশে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্ব ছিল না। তাই এ সময়কে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য আরব দেশ ভিন্ন জগতের অন্যান্য দেশের অবস্থাও তখন মোটামুটি এ রকমই ছিল। সভ্যতার আলো তখন পৃথিবী থেকে প্রায় দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। আরব দেশসহ সমগ্র পৃথিবীতে যখন এরূপ এক অন্ধকার যুগ বিরাজমান তখন মহানবী মুহাম্মাদ [সা] আরব দেশের মক্কা নগরীতে আবির্ভূত হলেন ৫৭০ ঈসায়িতে। তিনি এ অধ:পতিত সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করে এটাকে এক আলোকিত সুসভ্য সমাজে পরিণত করলেন। সমগ্র বিশ্বও সে আলোকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জগতের এ বিস্ময়কর বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হলো তা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

মহানবী [সা]-এর আদর্শ সমাজ পরিগঠনের বিষয় জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই তাঁর সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া প্রয়োজন। তিনি অন্যদের মতই মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। মানব জাতির মধ্যে তিনি সর্বোত্তম, সর্বগুণে গুণান্বিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল [সা] অর্থাৎ মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে একজন মনোনীত ব্যক্তি। সমগ্র মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশে আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। তাছাড়া তিনি শুধু একজন রাসূলই ছিলেন না, সকল নবী-রাসূলের [সা] মধ্যেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। মহানবী [সা]-এর এ পরিচিতি প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন এজন্য যে, তিনি পৃথিবীতে যে আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করেছেন, তা মানুষের মনগড়া কোনো রাষ্ট্র ছিলো না। সেটা ছিলো মহান স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই প্রদত্ত বিধানানুযায়ী রাসূল [সা] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র।

মহানবী [সা]-এর পরিচয় দিতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ আল কুরআনে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার কিছু কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" [সূরা কালাম, আয়াত : ৪]

"এবং তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।" [সূরা ইনশিরাহ, আয়াত :৪]

"[হে রাসূল] আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সারা জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ।" [সূরা আম্বিয়া, আয়াত :১০৭]

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।" [সূরা আ'রাফ, ১৫৮ নম্বর আয়াতের আংশিক]

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।" [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫১]

ওপরে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে মহানবী [সা]-এর পরিচয় দেয়া হয়েছে। এছাড়া আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে তাঁর সম্পর্কে আরো বিস্তৃত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। মহানবী [সা]-এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার জন্য উপরোক্ত আয়াতসমূহের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট মনে করি। তিনি কিভাবে আল্লাহপ্রদত্ত মিশন মানব সমাজে প্রচার করেছিলেন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিগঠনে সক্ষম হয়েছিলেন, এখানে সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তবে সে বিষয়টি আলোচনার আগে জাহিলিয়াতের যুগে আরবের সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিলো সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

মহানবী [সা]-এর আগে আরব সমাজের অবস্থা

মহানবী [সা]-এর নেতৃত্বে আদর্শ সমাজ গঠনের আগ পর্যন্ত সমগ্র আরব উপসাগরীয় এলাকার সমাজকাঠামো সম্পূর্ণ ধসে পড়েছিল। তারা তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রে বিভক্ত

www.bjilibrary.com

ছিলো, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, ছোট ছোট বিষয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো এবং সে যুদ্ধ চলতো কখনো যুগ যুগ ধরে। তাদের নৈতিকতা ছিলো অতি নিম্নমানের। চুরি-ডাকাতি, হত্যা-লুণ্ঠন, মদ-জুয়া, ব্যভিচার ইত্যাদি সমাজ ও চরিত্র-বিধ্বংসী নানা তৎপরতায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন আরব সমাজের অবস্থা ছিলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

এক. শতধা বিভক্ত জাহিলিয়াতের সমাজ ব্যবস্থায় তখন অসংখ্য দেব-দেবীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এক আল্লাহর পরিবর্তে সেখানে অসংখ্য মনগড়া দেব-দেবী এবং হাতে বানানো মূর্তির পূজা করা হতো। প্রতিটি গোত্রের প্রতিভূ হিসেবে এক একজন প্রধান দেবতা বা দেবী ছিলো। তারা এসব কাল্পনিক দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা-অর্চনা করতো। আরব উপসাগরীয় এলাকায় তখন ৩৬০টি প্রধান গোত্রের প্রতিভূ হিসেবে পবিত্র কাবা-গৃহে মোট ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

দুই. তৎকালীন আরবে চরম অজ্ঞতা ও নির্মম বর্বরতা বিরাজমান ছিল। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ও শোষণ ছিল সাধারণ ব্যাপার। এ ধরনের আচরণে সমাজের বিবেক আহত হওয়া দূরে থাক, বরং এগুলোকে হাসি-তামাশার বিষয় বলেই গণ্য করা হতো।

তিন. ছোটখাটো বা তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটত। এ ধরনের অর্থহীন রক্তপাত বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার জের অনেক সময় চলতো বংশানুক্রমে যুগ যুগ ধরে।

চার. সমাজে নারী জাতি ছিল সবচেয়ে নিগৃহীত ও অবহেলিত। নারীর অধিকার ও মর্যাদা বলতে কিছুই ছিলো না। পরিবারের অর্থ-সম্পদে নারী বা কন্যা সন্তানের কোনো অংশ নির্ধারিত ছিলো না। তাদেরকে কেবল ভোগ-লালসার উপকরণ মনে করা হতো। যে কোনো সামাজিক উৎসব-আনন্দে নারীদেরকে নাচ-গান ও সুরা-পরিবেশনকারী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্মকে মনে করা হতো চরম অভিশাপ ও অবমাননাকর। এ অভিশাপ ও অবমাননার হাত থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশে অনেক সময় জন্মের পর শিশু কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করে পরিবারের মান-সম্ভ্রম রক্ষার ব্যবস্থা করা হতো।

পাঁচ. ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। দাস-দাসীরা তাদের প্রভুদের গৃহে বন্দী হয়ে অসহায় ও চরম লাঞ্ছনাপূর্ণ জীবন যাপন করতো। পশুরা যেমন ব্যবহার পেত, অনেক সময় দাস-দাসীরা তেমন ব্যবহারও পেত না, পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হতো তাদেরকে।

ছয়. চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন-রাহাজানি, পরসম্পদ হরণ, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি ছিল তখন সমাজের স্বাভাবিক চিত্র।

সাত. মদ্যপান, ব্যভিচার, নাচ-গান ও চরম নৈতিকতাবিরোধী আচরণ, অসংযত আনন্দ-উৎসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ফলে সমাজে পাপবোধ এক রকম তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল।

www.bjilibrary.com

আট. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ, জুয়া, লটারি ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল, নৈতিকতাবিরোধী শোষণমূলক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে আসন করে নিয়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ন্যূনতম ব্যবস্থাও ছিল না এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল পর্বতপ্রমাণ।

নয়. সমাজে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অসংখ্য ছোট-বড় গোত্রে বিভক্ত সমাজে তাই সবলের রক্ত-চক্ষু ও খড়গ-কবলে দুর্বলের জীবন ছিল ত্রস্ত-বিপন্ন। বিধবা, এতিম, দরিদ্র-নিঃস্ব লোকদের কোন নিরাপত্তা ছিল না।

দশ. আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ও ন্যায়বিচার না থাকায় অন্যায়-অনাচার ও নিরাপত্তাহীনতায় মানুষের জীবন ছিল সর্বদা বিপদাপন্ন। বর্বরতা, নৃশংসতা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ছিল সর্বব্যাপক।

মহানবী [সা]-এর সমাজ সংস্কার বা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হবার আগে অর্থাৎ নবুওয়ত লাভের সময় পর্যন্ত আরব দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল ওপরে সংক্ষেপে তার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরা হলো। এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই তৎকালীন আরব সমাজের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা চলে। তৎকালীন আরবদের অবশ্য একটা খ্যাতি ছিল, সেটা হলো তাদের কাব্যপ্রীতি। মুখে মুখেই তারা কাব্য রচনা করতো, কবিতা আবৃত্তি করতো, আসর বসিয়ে কবিতার বাহাস হতো। বিভিন্ন উৎসব-আনন্দের অনুষ্ঠানে কবিদের ডাক পড়তো। কবিরা সেখানে তাদের কাব্য-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের বাহবা কুড়াতেন। শ্রোতারাও ছিল কাব্যরসিক। কবিতার গুণাগুণ বিচারে তাদের পারদর্শিতাও কম ছিল না। এসব আসরে শ্রোতাদের প্রশংসাধন্য কবিরাই তৎকালীন আরব সমাজে খ্যাতিমান কবির মর্যাদা পেতেন। কিন্তু ঐসব কাব্য-কবিতার মধ্যেও নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় ছিল সুস্পষ্ট। কবিতার আসরেও চলতো অঢেল মদ্য পান ও অশ্লীল নাচ-গানের জমজমাট মহড়া।

মহানবী [সা]-এর আদর্শ রাষ্ট্র

এমনি চরম অধ:পতিত, অনাচারগ্রস্ত ও অজ্ঞতার নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত বর্বর সমাজে মহানবী [সা] এলেন ঐশী আলোর উজ্জ্বল বর্তিকা নিয়ে। অমা-রজনীর জমাট অন্ধকার যেমন উষার সোনালি আলোর বন্যায় অপসৃত হয়, মহানবী [সা]-এর নবুওয়াতি আলোকধারায় তেমনি আরব সমাজের নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকাররাশি ধীরে ধীরে অপসৃত হলো। পৌত্তলিক-মুশরিক সমাজে আল্লাহর একত্ববাদ কায়েম হলো। শত-সহস্র বছরের অনাচার, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, পাপ-পঙ্কিলতার অবসান ঘটে এক সুস্থ, সুন্দর শান্তিপূর্ণ মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো।

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মূলে প্রধানত দু'টি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত : এ সমাজ বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল ইসলাম বা আল্লাহর দেয়া ঐশী-বিধান। দ্বিতীয়ত : এ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মূল কারিগর ছিলেন মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহানবী [সা]। আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে মহানবী [সা]-এর সর্বোত্তম জীবনাদর্শের

www.bjilibrary.com

আদলে এ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিগঠিত হয়। তাই এ আদর্শ সমাজ শুধু আরব জাতির ইতিহাসে নয়, বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসেও সকল মানুষের জন্য এক দীপ্ত প্রেরণার অনন্ত উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

মানব জাতি তার ঈপ্সিত শান্তি, কল্যাণ ও সুন্দর সমাজ গঠনে আগ্রহী হলে মহানবী [সা]-এর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হতে পারে তার জন্য একমাত্র মডেল। সে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষ সমঅধিকারের ভিত্তিতে সুখী-সমৃদ্ধ নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা পেতে পারে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, অসহায়-দুর্বল, এতিম-বিধবা, শ্রমিক-মনিব প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এ ধরনের নিশ্চয়তা রয়েছে সেখানে। সংক্ষেপে এ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপরেখা নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা যায় :

এক. বিশ্বজাহান, জিন-ইনসান তথা কুল-মাখলুকাতের যিনি স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা সেই এক, অদ্বিতীয়, লা-শরিক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন এবং সে ঈমানের দাবি অনুযায়ী সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করা।

দুই. সকল অর্থহীন, মনগড়া দেব-দেবী ও হাতে-বানানো মূর্তির পূজা-অর্চনা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। পৌত্তলিক-মুশরিকী চিন্তা-চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বা খিলাফত কায়েম করা।

তিন. 'কানান্নাছু উম্মাতাও ওয়াহিদাতান'- অর্থাৎ সকল মানুষ এক সম্প্রদায়ভুক্ত। আদি পিতা হযরত আদম [আ] থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বংশ, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ ইত্যাদি কোন কিছুর ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা অযৌক্তিক। একমাত্র তাকওয়া [পরহেজগারি] অর্থাৎ মানবিক সদগুণাবলীর ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। ঐক্যের এ মূলনীতির ভিত্তিতে মহানবী [সা] পারস্পরিক সমস্ত বিভেদ ও কোন্দল ভুলে গিয়ে শতধা বিভক্ত আরব জাতিকে তথা সমগ্র মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হবার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের বাণীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মহানবী [সা] বিদায় হজ্জের বাণীতে বলেন :

'হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন যে, হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে পয়দা করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সমাজ ও গোত্রে ভাগ করে দিয়েছি যেন তোমরা পৃথকভাবে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে চলে এবং তাঁকে বেশি স্মরণ রাখে। সুতরাং কোন আরব কোন অনারব বা আজমির তুলনায় কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নয়। পক্ষান্তরে কোন অনারব বা আজমিও তেমনি কোন আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় ব্যক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। হ্যাঁ, মর্যাদা ও সম্মানের যদি কোন মাপকাঠি থাকে তাহলে তা হলো একমাত্র তাকওয়া বা পরহেজগারি [সকল কাজ ও কথায় আল্লাহকে সচেতনভাবে মেনে চলা]। মহানবী [সা]-এর স্পষ্ট

www.bjilibrary.com

ঘোষণা : 'সমগ্র মানব জাতি এক আদমের সন্তান এবং আদমের প্রকৃত পরিচয় এই যে, তাঁকে মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এখন থেকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সকল দাবি, রক্ত ও বিত্ত-সম্পদের সকল দাবি ও সকল প্রতিশোধ স্পৃহা আমার পায়ের নিচে পদদলিত হলো।'

চার. নারীর ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদার কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন। পরিবারের সম্পত্তিতে [পিতা, মাতা ও পরবর্তীতে স্বামী] নারীর ন্যায্য অধিকার, পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানকে ভিন্ন দৃষ্টিতে না দেখা, স্বামী-স্ত্রীর সমঅধিকার এবং সর্বোপরি মাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা এটাই মহানবীর [সা] শিক্ষা বা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি। নারীকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী না বানিয়ে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্ভ্রম ও মর্যাদার ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ, পর্দা প্রথার প্রচলন, ব্যভিচার-অনাচার-নগ্নতা-অশ্লীলতার মূলোৎপাটন করে সুস্থ সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার শিক্ষা আমরা মহানবী [সা]-এর সমাজ ব্যবস্থা থেকেই পাই।

পাঁচ. দাস-প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে ক্রীতদাসদেরকে মুক্তি দানে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান, গোলাম-মনিবের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টি, সকল শ্রেণীর মানুষের সমমর্যাদা দান এবং সকল মানুষের স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনের সুযোগ প্রদান করেছে ইসলাম। তাই দেখা যায়, হাবশী গোলাম যোগ্যতার বলে ইসলামী সমাজে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। গোলাম-মনিবের স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্ক সম্পর্কে মহানবী [সা]-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা, 'হে লোক সকল! নিজের দাস-দাসী সম্পর্কে তোমরা খেয়াল রাখবে। তাদেরকে তাই খেতে দাও যা কিছু তোমরা আহার করবে, তোমরা যে ধরনের জামা-কাপড় পরিধান করবে তেমন জামা-কাপড়ই তাদেরকে পরিধান করাতে হবে।' [বিদায় হজ্জের বাণী]।

ছয়. চুরি, ডাকাতি, জুলুম, শোষণ, হত্যা, অনর্থক রক্তপাত ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাত. মদ্য পান, ব্যভিচার, নগ্নতা, অশ্লীলতা, নাচ-গান ও অন্যান্য সকল প্রকার নৈতিকতাবিরোধী অসামাজিক কার্যকলাপ রহিতের ব্যবস্থাকরণ।

আট. মানুষের সকল মৌলিক মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

নয়. সামাজিক ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা।

দশ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ-বৈষম্যের হাতিয়ার সুদ, জুয়া, অসম বণ্টন, মজুদদারি, মুনাফাখোরি ইত্যাদি জনস্বার্থবিরোধী অর্থনৈতিক প্রথার বিলোপ সাধন করে সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমঅধিকার, শ্রমের মর্যাদা প্রদান, যাকাত, ওশর ও সদকা ইত্যাদি প্রচলনের মাধ্যমে সুষম ও কল্যাণময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা।

এগার. আখিরাতের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। সামাজিক শান্তি, সাম্য, সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ও সর্বক্ষেত্রে কল্যাণধর্মী প্রবণতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাওহিদ ও

www.bjilibrary.com

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস একান্ত অপরিহার্য। মহানবী [সা]-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ এ দু'টো মূল দর্শনের ভিত্তিতেই বিরচিত।

মহানবী [সা]-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজের মূল ভিত্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ওপরে বিবৃত হলো। মূলত আল্লাহর রাসূল হিসেবে মহান স্রষ্টার নির্দেশ বা তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী মহানবী [সা] যে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা কেবল আরব দেশেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসে তা ছিল এক অনন্যসাধারণ মহোত্তম বিপ্লব। অনন্তকাল পর্যন্ত সে বিপ্লবের সমুজ্জ্বল বিভা বিশ্ব-মানবকে অনুপ্রাণিত করবে।

উপসংহার

ওপরে মহানবী [সা]-এর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণনা করা হলো তা একদিনে বা হঠাৎ করে সম্পন্ন হয়নি। সে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দীর্ঘ তেইশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, কঠোর আত্মত্যাগ, অবর্ণনীয় দু:খ-কষ্ট-জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করে বিজয়ের স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছেন। অতি নিষ্ঠার সাথে তিনি ক্রমাগত ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সে দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তিনি তাদেরকে তাওহিদের চেতনায় ও ইসলামের বিধানানুযায়ী গড়ে তুলেছেন। তাঁদের মন-মানসিকতা ও চরিত্র গড়ে উঠেছে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শে। এরপর তিনি তাঁদেরকে সংঘবদ্ধ করে সমাজের সকল অনাচার, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, বিশৃঙ্খলা, অনৈতিক ব্যবস্থা দূর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। মক্কার জমিনে কাজটি খুব সহজ পরিগণিত না হওয়ায় তিনি আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেছেন। মহাবিপ্লবের জন্য, মানব জাতির মহোত্তম কল্যাণ সাধনের উদ্দেশে সর্বস্ব পরিত্যাগ করে প্রিয় স্বদেশভূমি ছেড়ে হিজরত করা মানব জাতির ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল ঘটনা। মদিনায় গিয়ে তিনি প্রথমে একটি ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে সীমিত ভৌগোলিক এলাকায় ইসলামের বিধি-বিধান চালু করেন। তারপর ধীরে ধীরে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, ভয়-ভীতি ও তাগুতি শক্তির তাণ্ডব উপেক্ষা করে তিনি মাত্র দশ বছরের মধ্যে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। সে ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের তিনিই ছিলেন প্রধান অধিকর্তা। সে রাষ্ট্রের নীতি, আইন-কানুন, বিচার-সালিশ, প্রশাসন সব কিছু তিনি পরিচালনা করেছেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ অথবা শান্তি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন ইসলামের শাশ্বত বিধানানুযায়ী। যে কোনো বিচারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা ছিলো সর্বকালের জন্য আদর্শ স্থানীয়।

রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে মূলনীতি অনুসরণ করেছেন, সেটাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় হিকমাতের সাথে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা উপলব্ধি করা যায়। এখানে উদাহরণস্বরূপ মাত্র একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। ইসলামে মদ নিষিদ্ধ। কিন্তু তা একবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি। আল কুরআনে পর্যায়ক্রমে তিনবার এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়। প্রথমবারে মদের মধ্যে কী কী উপাদান আছে, তা বলা হয়েছে এবং ভালো উপাদানের তুলনায়

www.bjilibrary.com

তাতে মন্দের পরিমাণ যে বেশি সে ধারণা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মদ্য পান অবস্থায় নামাযে শামিল হতে বারণ করা হয়েছে। এভাবে মদ সম্পর্কে এবং এর অপকারিতার বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার পর তৃতীয় পর্যায়ে মদকে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দিয়ে নয়, বরং ধীরে ধীরে মন-মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মহানবী [সা]-এর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের নমুনা মানব জাতির সামনে বিদ্যমান। সেটা কিভাবে, কিসের ভিত্তিতে পরিগঠিত হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানব জাতি সর্বদা কল্যাণের প্রত্যাশী। সে ঈপ্সিত কল্যাণ কিভাবে আসতে পারে সে সম্পর্কেই যত বিতর্ক ও মতবিরোধ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা মানুষের সংগ্রামের বিষয় অবগত হয়েছি। তাদের সীমাহীন ত্যাগ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের পরিণতি কখনো তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। কল্যাণ ও শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র স্রষ্টার বিধান অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। মহানবী [সা] তাঁর আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর উজ্জ্বল প্রমাণ রেখে গেছেন। শুধু মুসলমান নয়, যে কোন মানুষই যদি প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের প্রত্যাশী হয় তাহলে তাঁকে অবশ্যই স্রষ্টার বিধান মেনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

তাই কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ, বিভ্রান্তি-বিতর্ক নয়, মানব জাতিকে আজ সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে, সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ব্যক্তিজীবন ও সামষ্টিক জীবন তথা মানব কল্যাণমুখী শাশ্বত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ [সা]-এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া শান্তি ও কল্যাণের অন্য কোন বিকল্প নেই।■

www.bjilibrary.com

একটি সুন্দর সমাজ গঠনে মহানবী [সা]-এর আদর্শ

অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে আসছে। তাছাড়া মানুষের প্রকৃতিতেই সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রবণতা বিদ্যমান। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানিগণ বলেছেন, "মানুষ তার জানের নিরাপত্তা ও জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনেই সমাজবদ্ধ জীবন যাপন শুরু করে।" তাই মানুষের সাথে সমাজের সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। যাবতীয় উন্নত সুযোগ-সুবিধা দিয়েও একজন মানুষকে যদি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একাকী রাখা হয় তাহলেও সে দারুণভাবে অস্বস্তি বোধ করবে।

মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই সমাজ। একটি সুন্দর সমাজ হোক, সুখী সমাজ হোক, এ কামনা সকলেরই। মানুষকে আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষকে আল্লাহপাক সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, বরং মানুষ যাতে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে একটি সুখী সমাজ তৈরি করে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য নবী [সা]-এর মাধ্যমে কিছু বিধি-বিধানও নাযিল করেছেন। এই বিধি-

www.bjilibrary.com

বিধানগুলো আল্লাহর দেয়া। এগুলো মেনে চললে মানুষের ব্যক্তিজীবন যেমন সুন্দর হবে তেমনি সুন্দর হবে সমাজ জীবনও।

নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে। বর্তমান সমাজকে আমরা আধুনিক সমাজ, সভ্য সমাজ ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষিত করে থাকি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের কারণে মানুষ অনেক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, যে সুন্দর সমাজে মানুষের প্রত্যাশা তা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘন অহরহই চলছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট মানবতা তার সৃষ্টিকর্তার নিকট ফরিয়াদ করছে, আর্তনাদ করছে। বারুদের মতো জ্বলছে গোটা বিশ্ব। অসহায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের করুণ আর্তনাদ আধুনিক সভ্যতাকে ধিক্কার দিচ্ছে। এমতাবস্থায় মহানবী [সা]-এর আদর্শই মানুষের প্রত্যাশিত একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে পারে যে সমাজে ধনী, দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ- নির্বিশেষে সকল মানুষ স্বস্তি ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে মহানবী [সা]-এর প্রদর্শিত সুন্দর সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

১. সার্বভৌমত্ব আল্লাহর : মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সকলেই আল্লাহর বান্দাহ। একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রভু নয়। একজন মানুষ সে যত বড়ই জ্ঞানীগুণী হোন না কেন, তিনি তারই মতো, তিনি একজন মানুষের প্রভু হতে পারেন না। একজন মানুষ সে যে কোন বর্ণ বা ধর্মের হোক না কেন, সে হবে আরেকজনের বন্ধু ও কল্যাণকামী। রাসূল [সা] প্রতিষ্ঠিত সমাজে এটাই লক্ষ্য করা গেছে। মানুষের মধ্যে যখন এই চিন্তা-চেতনা থাকবে তখন সে কারো ওপর জুলুম করবে না, অত্যাচার করবে না। কারণ, তার যিনি প্রভু সেই আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর মানুষ যখন অন্য মানুষের প্রভু হয়ে বসবে তখন তার ওপর জুলুম-অত্যাচার চালাবে।

২. পরস্পরের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা : একটি সুন্দর ও সুখী সমাজ গড়তে হলে সমাজে বসবাসরত লোকদের পরস্পরের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসার গুণ থাকতে হবে। আল্লাহপাক প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মধ্যে এ দয়া ও ভালোবাসার গুণ সৃষ্টি করেছেন যার কারণে বিপদগ্রস্ত কোন মানুষ দেখলে তার প্রতি আমাদের দয়ার সৃষ্টি হয়। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বর্তমান অবক্ষয়ের যুগেও লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহপাক বলেছেন, "তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন [সূরা রূম-২১ নং আয়াত]। কিন্তু মানুষের মধ্যে আল্লাহপাক যেমন দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম-প্রীতির গুণাবলী দান করেছেন তেমনি হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসার মতো দোষও মানুষের মধ্যে রয়েছে। উদ্দেশ্য– মানুষকে পরীক্ষা করা এবং পরকালে জান্নাত বা পুরস্কার প্রদান। দুনিয়াতে আল্লাহপাক নবী রাসূল [সা] পাঠিয়েছেন যাতে তাঁরা মানুষের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে পারেন। নবী করীম [সা] ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, যে সমাজের মানুষ পরস্পরের প্রতি দয়া ও ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষা করে চলতো।

www.bjilibrary.com

৩. একে অপরের প্রতি কল্যাণ কামনা : সমাজে বসবাসরত মানুষগুলো যদি একে অপরের কল্যাণ কামনা না করতে পারে তাহলে সে সমাজ বসবাসের উপযোগী হতে পারে না। তাই নবী করীম [সা] ইসলামের মর্মকথা "আদ্‌দীনু নাসিহাত"– দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা। হাদীসটি ছোট্ট হলেও এর তাৎপর্য ও গভীরতা অনেক। সমাজের মানুষ যদি একে অপরের কল্যাণ কামনা করতে পারে তাহলে সে সমাজে থাকবে না কোন হিংসা-বিদ্বেষ, সংঘাত, হানাহানি। বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার বুলি আওড়িয়ে নিজেরাই অন্যের মানবাধিকার হরণের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হবে না। নবী করীম [সা] এ মহান শিক্ষা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে প্রচার করেছেন।

৪. বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদেরকে স্নেহ করা : বড়দের সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা একটি সামাজিক মূল্যবোধ। এ মূল্যবোধ যত অটুট থাকবে সমাজ তত সুন্দর হবে। নবী করীম [সা] ১৪শ বছর পূর্বে এ মূল্যবোধকে এত বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন যে, তিনি তাঁর পাক জবানীতে বলেছেন, "যারা বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" নবী করীম [সা]-এর এ অমূল্য বাণী যদি আমরা মেনে চলি তাহলে সমাজে শান্তির ফল্গুধারা বয়ে যাবে। দলমত, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ অনেক কমিয়ে দেবে।

৫. প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দর ব্যবহার : সমাজে বসবাসরত মানুষের নিকটতম ব্যক্তি হলো তার প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক খারাপ হলে সেখানে বসবাস করা যায় না। অশান্তির দাবানলে পুড়তে হয় অহরহ। তাই মহানবী [সা] তাঁর উম্মতদেরকে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। নবী করীম [সা] বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় [মিশকাত]।" প্রতিবেশীর বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, তার বাসায় উপহারসামগ্রী পাঠানো, উত্তম খাবার রান্না হলে প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠানো, মারা গেলে জানাযায় অংশগ্রহণসহ প্রতিবেশীর কল্যাণে সব সময় সচেষ্ট থাকাকে মহানবী [সা] অতি উত্তম সওয়াবের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৬. অভুক্ত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা : সমাজে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহু লোকের বাস। মহানবী [সা] অভুক্ত মানুষকে খাবার প্রদানের জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে শুধু উৎসাহিতই করেননি, বরং তার দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহকারে খানা খায়, অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে পড়ে থাকে অভুক্ত অবস্থায়" [বাইহাকী]।

৭. সমাজে নারীর যথাযথ সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা : পৃথিবীতে একজন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর মাধ্যমেই সমাজের সূচনা হয়। আর এখন পর্যন্ত নারী ও পুরুষের সমন্বয়েই সমাজের এ ধারা অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীর যথাযথ মর্যাদা সমাজে ছিল না। বর্তমানের ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজে নারীকে ভোগের সামগ্রী, পণ্যের বিজ্ঞাপনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কিন্তু নবী করীম [সা] সমাজে নারীর মর্যাদা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী পরস্পরের সহায়ক। [আত তাওবা-৭১]

৮. অধীনস্থ মানুষদের প্রতি সদ্ব্যবহার : একটি সমাজে সকল শ্রেণীর লোক বাস করে। সমাজে এমন লোক আছে যার অধীনে অনেক লোক কাজ করে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তার অধীনস্থ লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। অনেক ক্ষেত্রে জুলুমও করে। জুলুমের শিকার হয়েও ঐ মানুষগুলো মুখ বুজে পড়ে থাকে। আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে থাকে। নবী করীম [সা] মুসলামনদেরকে সতর্ক করেছেন এধরনের আচরণ থেকে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লিখিত আছে, নবী করীম [সা] বলেছেন, "তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিত তাকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরে। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার ওপর অধিক কর্মভার চাপানো হয়, তবে যেন তাকে সাহায্য করা হয়।"

৯. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ : একটি সমাজে যদি সৎ বা ভালো কাজের প্রসার এবং অসৎ বা মন্দ কাজে বাধার সৃষ্টি না হয় তাহলে সে সমাজ কখনো শান্তির সমাজ হতে পারে না। এ কাজটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে যারা থাকবেন তাদের পক্ষেই পুরোপুরি হক আদায় করে করা সম্ভব। তবে সমাজের অন্যান্য মানুষ যে করবে না তা নয়। আল্লাহ মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে" [আলে ইমরান : আয়াত-১১০]। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অল্প সংখ্যক লোক। তাদেরকে যদি সামাজিকভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিরোধ না করা যায় তাহলে এ ধরনের অসামাজিক কাজ আরও বাড়তে থাকে এবং সমাজ থেকে শান্তি বিদায় নেয়। ধীরে ধীরে যারা ভালো মানুষ বা ঈমানদার লোক তারা নিজেদেরকে কোন রকমে রক্ষা করার জন্য খারাপ কাজের প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে নিজেরা লুকিয়ে থাকে। ফলে সমাজে খারাপ কাজের প্রবণতা বেড়ে যায়। অল্প সংখ্যক খারাপ লোকদের প্রভাবে ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এভাবে সমাজ দুষ্ট লোকদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়।

একজন মানুষ হিসেবে যে ধরনের শান্তিময় সমাজ আমরা প্রত্যাশা করি তা মহানবী [সা]-এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল প্রতিষ্ঠা সম্ভব। একটি সুন্দর ও কল্যাণকর সমাজ তৈরির জন্য মহানবী [সা] যে সমস্ত সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন এবং শুধু উপদেশ নয়, বরং নিজে পালন করে একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিয়ে গেছেন তার সামান্য নমুনা তুলে ধরা হলো। সকলেরই উচিত ঐ ধরনের একটি সুখী ও সুন্দর সমাজ যাতে আমরা তৈরি করতে পারি সেজন্য মহানবী [সা]-এর আদর্শ অনুসরণ করা।■

www.bjilibrary.com

মহানবী [সা]-এর শিক্ষাক্রম ও বর্তমান শিক্ষাক্রমের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

যুগের উন্নতির সাথে সাথে আমাদের শিক্ষাক্রমেও সাধিত হয়েছে প্রভূত উন্নয়নের ছোঁয়া। আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখী গবেষণার যে বিশাল সম্ভাবের সমারোহ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। মূলত শিক্ষাকে সকল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য যে বিরাট সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনার দ্বার আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্মোচিত হয়েছে, সে তুলনায় আমাদের আগে যারা অতিবাহিত হয়েছেন তাদের সুযোগ-সুবিধা ছিল অনেক বেশী সংকুচিত। বর্তমান সময়ের এত বিশাল সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের শিক্ষা সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করতে পারছে না এবং স্বাধীন মুসলিম জাতিসত্তা হিসেবে সত্যিকার শিক্ষার যে মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা আমাদের রয়েছে বর্তমান শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে সে লক্ষ্যও আমাদের অর্জিত হয়নি। এর বিপরীতে যদি আমরা রাসূল [সা] ও সাহাবাদের যুগের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকাই, তাহলে ফলাফলের দিক থেকে দেখব যে, তা শতভাগ সফল ও সার্থক, অথচ সে যুগে শিক্ষাপোকরণ ছিল সীমিত এবং প্রযুক্তি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে তারা ছিল

www.bjilibrary.com

আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী পিছিয়ে। ফলে স্বভাবতই একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, রাসূল [সা]-এর সফল শিক্ষাক্রম ও আমাদের আধুনিক শিক্ষাক্রমের মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? সেটা কি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করার ক্ষেত্রে, নাকি সিলেবাসের ক্ষেত্রে অথবা যারা কারিকুলাম তথা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন তাদের ক্ষেত্রে? নাকি পার্থক্য রয়েছে উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই?

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে দেখা যায় যে, উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই আমাদের বর্তমান শিক্ষাক্রম ও রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ প্রবন্ধে আমরা সে পার্থক্যগুলো কিছুটা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রম থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করব।

প্রথমত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য

আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর মানুষের মূল লক্ষ্য হলো আখিরাতের সাফল্য অর্জন এবং দুনিয়ায় সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুনিয়ার কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও উন্নয়নের জন্য যত কাজই করে সেটি করে আখিরাতে সাফল্য অর্জনের সোপান হিসেবে। শুধু দুনিয়া অর্জনই এদের মূল লক্ষ্য নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভকেই নিজেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছে। আর তা অর্জনের প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয় তাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ও আন্দোলন।

এ দু'শ্রেণীর লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

"তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা দুনিয়া চায় এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা চায় আখিরাত।" [সূরা আলে ইমরান : ১৫২]

তিনি আরো বলেন, "মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় [প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব] দান করুন।" এদের জন্য আখিরাতে কোন অংশই থাকবে না। আর মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোকও রয়েছে যারা বলে, "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ প্রদান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ প্রদান করুন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।" এদের জন্য [আখিরাতে] রয়েছে একটা অংশ তারা যা অর্জন করেছে সেজন্য।" [সূরা আল-বাকারা : ২০০-২০৩]

কোন সন্দেহ নেই যে, নবী [সা] ও তাঁর সাহাবাগণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। কেননা আখিরাতের প্রশ্ন তাঁদের সকলের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তাঁরা সব সময় এভাবে তটস্থ থাকতেন, আখিরাতে কিভাবে আল্লাহর কাছে আমি নাজাত পাব এবং পুরস্কৃত হব?

নবী [সা]-এর জীবনের বহু ক্ষেত্রে আমরা এ ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি। এর কিছু দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উল্লেখ করছি–

১. নবী করীম [সা] যখন প্রকাশ্য দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন তখন তিনি এ ঘোষণাও প্রদান করেন যে, ইসলাম গ্রহণের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত।

www.bjilibrary.com

হাদীসের ভাষায় সে লক্ষ্যটি হলো জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। আবু হুরাইরা [রা] বলেন, "যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, 'আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন' [সূরা আল-শূ'আরা : ২১৪], তখন রাসূলুল্লাহ [সা] সাধারণ ও খাস সব লোককে ডেকে বললেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচাও। হে বনী কা'ব সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি নিজেকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচাও। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন কাজেই আসব না।" [সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৫৪৮, ৪৩৯৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৩০৫, আর-রহীক, আল-মাখতুম, পৃ. ৬৯]

২. সহল ইবনু সা'দ [রা] বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূল [সা]-এর সাথে ছিলাম। সাহাবাগণ তখন মাটি খোঁড়ার কাজ করছিলেন। আমরা আমাদের কাঁধে মাটি বহন করছিলাম। রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, "হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।" [সহীহ বুখারী, আল-মাগাযী]

৩. জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ ও জান্নাতে প্রবেশের আমল সম্পর্কে সাহাবাদের জিজ্ঞাসা ও জানার আগ্রহ প্রমাণ করে যে, এটা তাদের ভাল কাজে লিপ্ত হওয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার মৌলিক লক্ষ্য।

মুয়ায ইবনু জাবাল [রা] বলেন, 'আমি রাসূল [সা]-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমল সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।'... [মুসনাদ আহমাদ : ৫/২৩০, সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-২৬১৬]

জাবের ইবন আবদুল্লাহ [রা]-এর হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ [সা]-কে জিজ্ঞাসা করল, "আমি যদি ফরয সালাতসমূহ আদায় করি, রমাদানের সাওম পালন করি, হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলি, আর এর অতিরিক্ত আর কোন আমল না করি, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব?' রাসূল [সা] বললেন, 'হ্যাঁ।" [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৫]

এভাবে দেখা যায় যে, ইসলামের প্রথম প্রজন্ম তথা সাহাবাদের আগ্রহ, কামনা-বাসনা সবই ছিল আখিরাতমুখী। তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা ছিল একটাই, "কিভাবে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাব এবং জান্নাত লাভ করতে পারব?" এ জিজ্ঞাসার উত্তরের মধ্যই নিহিত ছিল তৎকালীন শিক্ষা দান, শেখা ও শিখন ফল তথা রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রমের প্রকৃত অবয়ব। আল্লাহ তা'আলা যখন আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠালেন, তখন তাঁকে ও তাঁর পরবর্তী বংশধরকে শিক্ষাক্রমের এমনই দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেছিলেন,

"আর আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে হিদায়াত এলে যারা সে হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা আল-বাকারা : ৩৮]

www.bjilibrary.com

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি ও আখিরাতে সফলতার পূর্বশর্ত হলো আল্লাহর হিদায়াতের অনুসরণ। আর হিদায়াত তো শুধু অহীর মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অনুরূপভাবে অহীর জ্ঞান ভালভাবে না বুঝলে তা অনুসরণ করা যায় না এবং একমাত্র শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই সে জ্ঞান মানুষ অনুধাবন করতে পারে। এজন্যই ইসলাম শিক্ষার প্রতি চূড়ান্ত গুরুত্বারোপ করেছে এবং একে ফরয বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণকর সকল জ্ঞান অর্জনের প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া হলো আখিরাতে সফলতা লাভের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার কর্মক্ষেত্র। সে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দু'টি ধারা বহমান। একটি হলো সাধারণ শিক্ষা ও অপরটি মাদরাসা শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে সকল প্রকার জাগতিক উন্নতি সাধন। এ লক্ষ্যেই বার বার ঢেলে সাজানো হয়েছে আমাদের সকল স্তরের শিক্ষাক্রমকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও খোলা হয়েছে আধুনিক সব বিষয়। পার্থিব উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখছে না বলে ধর্মীয়, বিশেষ করে ইসলাম শিক্ষাকে ধীরে ধীরে সাধারণ শিক্ষাক্রম থেকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা চলছে। এ Common objective-এর পাশাপাশি আমরা দেখি যে, দেশের শাসকশ্রেণী, কর্তৃত্বলোভী বহিঃশক্তি, রাজনৈতিক দলসমূহ, এনজিওসমূহ, পরিবার, শিক্ষক ও ছাত্র– প্রত্যেকেরই শিক্ষা বিষয়ে নিজ নিজ বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে। বিদেশী শক্তি আমাদের শিক্ষাক্রমে তার সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, শাসকশ্রেণী তথাকথিত "সৎ নাগরিক" গড়ে তোলার উদ্দেশে শিক্ষাক্রমকে নিজেদের জনমত সাজিয়ে নিচ্ছে, রাজনৈতিক দলসমূহ নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে প্রচার করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রকে উপযোগী ময়দান হিসেবে গ্রহণ করছে, শিক্ষকগণ একে অর্থোপার্জনের হাতিয়ার মনে করছেন, পরিবার শিক্ষাকে তার সন্তানের ভবিষ্যতের গ্যারান্টি মনে করছে এবং শিক্ষা লাভ করে একজন ছাত্র ভাল কোন পদে চাকরি করাকেই লক্ষ্য হিসেবে স্থির করছে।

মাদরাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যদিও ইসলামী চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা, কিন্তু সেখানে পার্থিব শিক্ষার সাথে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। মাদরাসাসমূহ সত্যিকার ভাল আলেম ও 'ইনসান কামেল' উপহার দিতে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে বলে এ ধারণা যে কারো জন্মাতে পারে যে, শিক্ষার এ ধারায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে রাসূল [সা]-এর অনুসরণে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম আজো তৈরি করা হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনায় লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষাক্রম ও রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রমের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত শিক্ষার Contents ও সিলেবাসের পার্থক্য

রাসূল [সা]-এর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার উপকরণ ও বিষয়সমূহ এতটাই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে, তাতে উম্মাহর পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠত, উম্মাহর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদা প্রকাশ পেত এবং সে শিক্ষা মুসলিম-অমুসলিম জগতের সকল মানুষের খেদমত ও কল্যাণ সাধন করত।

www.bjilibrary.com

রাসূল [সা]-এর শিক্ষালয়ে তাঁর সাহাবা ছাত্রগণ ধর্মীয় প্রকৃত শিক্ষা যেমন অর্জন করতেন, তেমনি সে যুগের উপযোগী সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞানও তাঁরা লাভ করতেন।

এ শিক্ষালয় থেকে যেমন তৈরি হয়েছিল ইবনু আব্বাস [রা]-এর মতো মুফাসসির, ইবনু মাসউদ [রা]-এর মতো ফকীহ, আবু হুরাইরা [রা]-এর মতো মুহাদ্দিস এবং এরকম আরো হাজার হাজার ব্যক্তিত্ব, তেমনি এ শিক্ষালয় থেকে তৈরি হতে দেখেছি বহু সফল সেনাপতি, সৈনিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ প্রমুখ।

রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রমের যে সিলেবাস ছিল, তা এতই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে, তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিতরা কখনো পরস্পর বিরোধিতায় লিপ্ত হত না, বরং তা ছিল একধারার শিক্ষা, পার্থিবতা ও পারলৌকিতার সমন্বয়ে গড় একমুখী শিক্ষা।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা দ্বিমুখী শিক্ষার অস্তিত্ব দেখতে বিভিন্নতায় আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় একদল গড়ে উঠছে নাস্তিকরূপে, আরেক দল ধর্মনিরপেক্ষ এবং সত্যিকার ধার্মিক মুসলিমরূপে গড়ে উঠছে খুবই কম। পারিবারিক শিক্ষার ছোঁয়ায় অনেকে হয়ত ইসলামী কিছু আকীদা ও নিয়ম-কানুন রপ্ত করেছেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষাক্রমের সর্বস্তরে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোও আজ আর শেখার উপায় নেই।

মাদরাসা শিক্ষায় যদিও সবাই ইসলামী হয়েই গড়ে ওঠার কথা, কিন্তু দেখা যায় এখানকার সিলেবাসে এমন কিছু রয়েছে যা সঠিক আকীদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আবার প্রয়োজনীয় এমন অনেক কিছুর ঘাটতি রয়েছে যা সিলেবাসভুক্ত হলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যেত। পাশাপাশি সাধারণ বিষয়গুলো এখানে ব্যাপকভাবে উন্নত করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারী এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানগত পার্থক্য

নবী [সা]-এর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী, বাস্তবায়নকারী ও শিক্ষক ছিলেন নবী [সা] স্বয়ং। একটি হাদীসে তিনি বলেছেন, "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" তিনি এমই শিক্ষক ছিলেন যিনি আল্লাহর রাসূল, যাঁর কাছে অহীর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ আসত অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে সরাসরি গাইড করতেন। চারিত্রিক সততায় তিনি ছিলেন চলন্ত কুরআন। তাঁকে দেখেই শেখা যেত অনেক অনেক কিছু, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার্থীদের শেখাতেন প্রয়োজনীয় আকীদা, আমল ও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নের পদ্ধতি। সর্বোপরি এ শিক্ষাক্রমের শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

অন্যদিকে আমাদের যারা শিক্ষকবৃন্দ তারা সাধারণ মানুষ, যাদের রয়েছে অনেক জ্ঞানের ঘাটতি ও গুণের অভাব। তদুপরি বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অনেকেরই আজ আর বিবেকের তাড়না নেই, হৃদয়ের প্রশস্ততা নেই, শিক্ষকতার দায়িত্ব যথার্থভাবে পালনের উন্নতবোধ নেই। রাসূল [সা]-এর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তাঁরই সহচরবৃন্দ

www.bjilibrary.com

সাহাবাগণ, যাঁরা এ উম্মতের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ, উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যাঁরা রাসূল [সা] থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ও ব্যবহারিক জীবনে মানবতার কল্যাণে তা বাস্তবায়ন করার জন্য ছিলেন সদা উন্মুখ। সেজন্য আল্লাহ তাঁদের প্রশংসায় বলেছেন,

"আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।" [সূরা আল-বাইয়েনা : ৮]

আর আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যারা ছাত্র তাদের কতজন আদর্শ শিক্ষার্থীর গুণে গুণান্বিত তা রীতিমত গবেষণা করেই বের করতে হবে। জ্ঞান অন্বেষণ, চারিত্রিক মাধুর্য ও নৈতিকতা অর্জন এবং ধর্মীয় আকীদা ও মূল্যবোধ লালন করা আজ তাদের অধিকাংশের শিক্ষা জীবনের মূল লক্ষ্য নয়, বরং পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হওয়া, সার্টিফিকেট লাভ করা ও ভাল চাকুরী করা তাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রম ও আমাদের বর্তমান শিক্ষাক্রমের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রের পার্থক্যগুলো অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যাবে যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও রাসূল [সা]-এর শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় সত্যিকার 'ইনসাফ কামিল' তৈরিতে মোটেই সফলকাম হতে পারেনি।

নিচে আমাদের শিক্ষাক্রমের ব্যর্থতার কারণগুলো চিহ্নিত করে রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রমের সাফল্যের কারণগুলো উল্লেখ করছি। আশা করি এতে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

আমাদের শিক্ষাক্রমের ব্যর্থতার কারণ

১. উম্মাহর পরিচয়বাহী শিক্ষাক্রমের সঠিক লক্ষ্য স্থির করার অভাব।

২. শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির কাল থাবা সম্প্রসারণ এবং কলুষিত রাজনীতি দ্বারা শিক্ষাকেও কলুষিত করার অপচেষ্টা। এর ফলে আমাদের শিক্ষা খাতে নিম্নবর্ণিত বিপর্যয় ঘটে গেছে :

   ক. শিক্ষাক্রমকে রাজনৈতিক নেতাদের Ideology অনুযায়ী ঢেলে সাজানো হয়েছে, যা উম্মাহের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পরিচয়ের প্রতিফলন বহন করে না।

   খ. জাতিকে সত্যিকারভাবে জ্ঞানসমৃদ্ধ, স্বাধীন ও বিবেকবান সত্তারূপে না গড়ে এক রকম অজ্ঞতার অন্ধকারে তাদেরকে ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে তারা পরাধীন মানসিকতা ছেড়ে স্বাধীন জাতিরূপে জেগে উঠতে না পারে।

   গ. দীন ও ইসলামের মাধ্যমে জাতির সকল মানুষের যে বিশাল উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হতে পারত, সে সম্পর্কে জাতিকে ভ্রান্ত করে ইসলামের বিরুদ্ধে শিক্ষিতদের ক্ষেপিয়ে তোলা এবং দীনকে অপাংক্তেয় করে তোলা হয়েছে।

৩. বিদেশী ঔপনিবেশিক দেশসমূহকে আমাদের শিক্ষাক্রমে হাত লাগানোর সুযোগ করে দেয়া এবং তাদের মানসিক সেবাদাস তৈরি করার মতো শিক্ষাক্রম তৈরি করা।

৪. নিছক বৈষয়িক কারণেই শুধু শিক্ষা অর্জন করা। ফলে শিক্ষা মানুষকে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশুতে পরিণত করছে।

www.bjilibrary.com

৫. মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আকীদাগত বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়।

৬. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

রাসূল [সা]-এর শিক্ষাক্রমের সাফল্যের কারণ

১. এ শিক্ষাক্রমের সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, যা ছিল মহান, শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণধর্মী।

২. শিক্ষা ছিল সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তা হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতে সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধন।

৩. শিক্ষকের নিষ্ঠা, ইখলাস ও জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি তাঁর বিনয় এবং শিক্ষা দানকে মহান আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করা।

৪. উম্মতের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়ের সাথে শিখন বিষয়সমূহ ও Contents-এর সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন।

৫. শিক্ষাক্রমের সাথে জড়িত সকলের সাংস্কৃতিক ও আকীদাগত অভিন্নতা।

৬. জ্ঞানসমৃদ্ধ স্বাধীন বিবেকবান সত্তা ও জাতিরূপে গড়ে তোলার নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনা।

পরিশেষে বলবো, রাসূল [সা]-এর শ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও চিরআধুনিক সফল শিক্ষাক্রম থেকে আমাদের শেখার ও নেয়ার অনেক কিছুই আছে। যদি আমরা তাঁর শিক্ষাক্রমকে সামনে রেখে আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজাতে পারি তাহলেই আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার সত্যিকার বিকাশ ঘটবে।■

www.bjilibrary.com

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!

আধুনিক প্রকাশনীর প্রকাশিত তাফহীমুল কোরআন (তাফসীর), হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও শিশু সাহিত্যসমূহ এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে আপনার প্রয়োজনীয় বইগুলো আজই সংগ্রহ করুন।

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড) – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তাফহীমুল কুরআন বিষয় নির্দেশিকা – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- মহিলা ফিক্হ (১-২ খণ্ড) – আল্লামা আতাইয়া খামীস
- পর্দা ও ইসলাম – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- স্বামী স্ত্রীর অধিকার – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- মহিলা সাহাবী - তালিবুল হাশেমী
- আদম সৃষ্টির হাকীকত – অধ্যাপক গোলাম আযম
- নবী জীবনের আদর্শ – অধ্যাপক গোলাম আযম
- যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ – অধ্যাপক গোলাম আযম
- দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা – অধ্যাপক গোলাম আযম
- কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের চার দফা কর্মসূচী – অধ্যাপক গোলাম আযম
- কুরআন বুঝা সহজ – অধ্যাপক গোলাম আযম
- আল্লাহর দরবারে ধারণা – অধ্যাপক গোলাম আযম
- ঈমানের দাবী – আব্বাস আলী খান
- দেশের বাইরে কিছুদিন – আব্বাস আলী খান
- ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব – আব্বাস আলী খান
- ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা – মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন – মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড) - সংকলিত
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড) - সংকলিত
- দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব – মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা - আবদুল করীম যায়দান
- ইসলাম ও জিহাদ - শহীদ হাসানুল বান্না
- ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী – খুররম মুরাদ
- বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলামের কর্মনীতি – শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায
- কালিমা তাইয়িবা – খলিলুর রহমান মুমিন
- দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য – আবদুল কাদের আওদাহ
- মুসলিম উম্মার সঠিক কর্মনীতি – আবদুল কাদের আওদাহ
- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ – মরিয়ম জামিলা
- পর্দা প্রগতির সোপান – অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
- ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেস্টো – মরিয়ম জামিলা
- মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য – মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- খোশ আমদেদ মাহে রমজান – খুররম মুরাদ
- রোজা ৭০টি মাসআলা – মোঃ সালেহ আল মুনাজ্জেদ
- ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি – খন্দকার আবুল খায়ের
- পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন – শামসুন্নাহার নিজামী
- দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) ও তাঁর চিন্তাধারা – জুলফিকার আহমদ কিসমতি

আধুনিক প্রকাশনী বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ

২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১৫১৯১	১০ আদর্শ পুস্তক বিপণী বায়তুল মোকাররম, ঢাকা। (মেহরাবের নীচে সোনালী ব্যাংকের সামনে)	৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭। ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২	কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

ক্ষুধা নিবারণ
হাসান আলীম

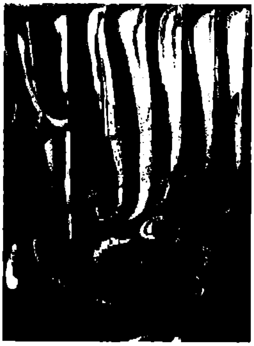

সেরা মানুষ তিনি। অন্য মানুষেরা তা জানে। এর চেয়েও বেশি জানেন তাঁর স্রষ্টা। মুহূর্তেই তাঁর জন্য হাজির হতে পারে খাদ্যদ্রব্য, ফল-ফলাদি। তিনি ইচ্ছে করলেই সব হয়। কিন্তু এ মুহূর্তে তা করছেন না। তার যে আরও অনুসারী রয়েছে এমন ক্ষুধার্ত। আরও ক্ষুধার্ত থাকবে তাঁর অনুপস্থিতিতে। তাই তিনি সাধারণের মতো ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করছেন।

কোনো অলৌকিকতা নয়। নয় কোনো বিশেষ ব্যবস্থা। ক্ষুধা লাঘবের জন্য কাজ করতে চান– বিনিময়ে খাদ্য জোগাড় করতে চান। কিন্তু কাজ চাইলেই কি সহজে পাওয়া যায়? দেশে দু:খ-দারিদ্র্যে লেগে আছে। একটা দুর্ভিক্ষের ছায়া সম্পাত চারদিকে। তাঁর হৃদয়ে কষ্টের শিশির জমছে। না জানি এমন দুর্ভিক্ষে তাঁর সাথীদের– প্রিয় কন্যার কি হচ্ছে? ক্ষুধার যন্ত্রণা তিনি যে আর সহ্য করতে পারছেন না! পেটের মধ্যে খরা সাইমুম– তীব্র ক্ষুধা কষ্টের হাওয়া! পেট কুঞ্চিত-ব্যথাক্লিষ্ট হয়ে পড়ছে। যন্ত্রণার ভার কিভাবে লাঘব করবেন? কয়েকটি ভারী পাথর নিলেন পবিত্র হাতে। পেটের সাথে মজবুত করে বেঁধে নিলেন। চাপা দিতে চাইছেন ক্ষুধার আগুন। কিন্তু মনের আগুন– দুশ্চিন্তার বহ্নিশিখা কি নির্বাপিত হবে?

www.bjilibrary.com

প্রিয় কন্যা– মা ফাতিমার কি অবস্থা!

ত্রস্ত হরিণের মতো ছুটলেন কন্যার বাসগৃহে। পিতাকে দেখে কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বললেন, আব্বাজান, আমি আজ তিনদিন পর্যন্ত অনাহারী। কিচ্ছু খাবার নেই।

কন্যার কথা শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। সান্ত্বনা দিতে বললেন, মা! এই দেখ আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে চারখানা পাথর বেঁধেছি!

কিন্তু তিনি একথা বলে স্বস্তি পেলেন না। প্রিয় কন্যার মুখে খাবার তুলে দিতে হবে। জামাতার কথা কিছু বললেন না তাঁকে। তাঁর কি দায়িত্ব নেই? না কি তিনিও ক্ষুধার্ত? তিনিও কর্মহীন ক্ষুধার্ত প্রহর গুণছেন!

তিনি ছুটলেন কিছু একটা কাজের সন্ধানে। খাবারের খোঁজে খোলা প্রান্তরের দিকে ছুটলেন তিনি। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন এক ইহুদী কূপ থেকে পানি তুলে উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তিনি তার কাছে গেলেন। বললেন, ভাই, তোমার কাছে কি কিছু কাজ আছে? কাজ করে আমি মজুরি পেতে চাই।

লোকটি বলল, তুমি কূপ থেকে পানি তুলে উটগুলোকে পান করাতে পার। বালতি প্রতি তিনটি করে খোরমা পাবে।

তিনি রাজি হলেন। বালতি ভরে পানি ওঠাতে লাগলেন। প্রথম বালতি পানি তুলে তিনটি খুরমা পেলেন। খুরমাগুলো প্রথমে খেলেন। কিছু পানিও পান করলেন। পরপর আট বালতি পানি তুললেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই বালতি দিয়ে পানি তুলতে গিলে রশিটি ছিঁড়ে গেল। কূপের তলদেশে পড়ে গেল বালতিটি। তিনি চিন্তিত হলেন। কি করবেন এখন?

লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে থাপ্পড় দিল। সে ভাবেনি লোকটি কে? সাধারণ শ্রমিকই মনে করে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে সে!

তিনি রাগান্বিত হলেন না। তাঁর হাত থেকেই তো লোকটির বালতিটি পড়ে গেল। এজন্য দায়ী তিনি। প্রতিবাদ করলেন না তিনি, বরং বালতিটি ফিরিয়ে দেয়ার চিন্তা করলেন। তিনি কূপের তীরে বসেই আল্লাহর নামে হাত বাড়িয়ে দিলেন সুগভীর কূপের তলদেশে। বালতিটি উদ্ধার করে ইহুদীকে ফিরিয়ে দিলেন।

এ অভাবিত দৃশ্য দেখে লোকটি অত্যন্ত অবাক হলো! বিচলিত ও চিন্তিত হলো। ইনি তো সাধারণ লোক নন! লোকটি তাকে চব্বিশটি খুরমা মজুরি দিল।

তিনি খুরমাগুলো নিয়ে প্রিয় কন্যার গৃহে গেলেন। লোকটি তাঁর পিছে পিছে হাঁটতে লাগল। ভয়ে, বিস্ময়ে বেদনায় তার হৃদয় রক্তাক্ত হলো। সে নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগল। কেন সে তাঁকে চড় দিল? সে তো ইচ্ছে করে বালতিটি কূপে ফেলেনি। রশি ছিঁড়ে বালতি নিচে পড়লে তাতে তাঁর কোন অপরাধ নেই, বরঞ্চ সে-ই বড় অপরাধ করেছে। নিজের প্রতি নিজের হাতের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা হলো!

কিছুক্ষণের মধ্যে তার হাতে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। বেশ ক'দিন অসহ্য যন্ত্রণার ভার বইছে সে। এখন এ হাত আর দেহে রাখা যাবে না। তীব্র ব্যথা আর পর্বতপ্রমাণ ভার ভর করেছে তার হাতে। কী করবে অসহ্য যন্ত্রণায়? অবশেষে নিজের হাতখানা নিজেই

www.bjilibrary.com

কেটে ফেলল। তাতেও ব্যথা কমেনি। তবে ক্ষোভ হয়ত কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। অপরাধবোধ তাকে আরও যন্ত্রণা দিচ্ছে। হাত কাটার যন্ত্রণার চেয়ে তার মনে এক তীব্র বুনো ঝড় বইছে, কেন এমন নিষ্ঠুর অন্যায় আচরণ সে করেছে? সিদ্ধান্ত নিল, তাঁর কাছেই সে ফিরে যাবে। অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে। অবশেষে সে ফাতিমার বাড়িতে গেল। অসাধারণ-অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী লোকটির সন্ধান পেল। তিনি যে ফাতিমার প্রিয় পিতা! তাঁর কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল, আপনাকে হাত দিয়ে আঘাত করে খুব অন্যায় করেছি। আমাকে মাফ করুন। এই দেখুন আমার হাতের কী অবস্থা! অসহ্য যন্ত্রণায় এই পাপিষ্ঠ হাত আমি নিজেই কেটে ফেলেছি।

লোকটির অবস্থা দেখে তিনি দু:খিত হলেন। তাকে কর্তিত হাত নিয়ে আসতে বললেন। কাটা হাতটি যথাস্থানে স্থাপন করে তিনি ফুঁ দিলেন। অমনি বিদ্যুৎ বেগে বিচ্ছিন্ন হাতটি জোড়া লেগে গেল! আগের মতো সুন্দর হয়ে গেল তার হাত। ইহুদীটি আরও আশ্চর্য হলো!

কে তিনি? হ্যাঁ, তিনি সত্যিই পয়গম্বর! মহানবী। মানুষের বন্ধু। জগতের বন্ধু। লোকটি মুহূর্তে পরিবর্তিত হল। ইসলাম গ্রহণ করল।

মহানবীর ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্ত হলো– লোকটির বিচ্ছিন্ন হাত অবিচ্ছিন্ন হলো– আর নিজেকে নিবৃত্ত করল দোযখের অগ্নিদাহন থেকে।

মহানবীর ক্ষুধা নিবারণের মধ্য দিয়ে, ইহুদী লোকটি অগ্নির প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করল।■

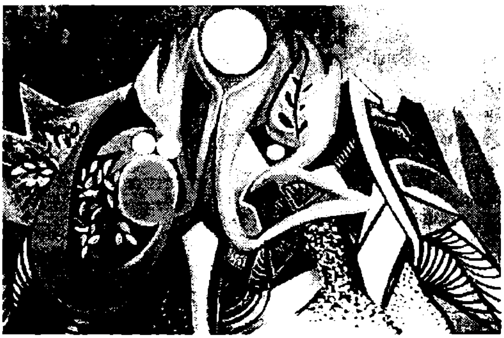

www.bjilibrary.com

আমাদের প্রকাশিত বইয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি

বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
❖ সহীহ মুসলিম (১-৮)	ইমাম মুসলিম (র)	১৭০০/-
❖ জামে আত-তিরমিযী (১-৬)	ইমাম তিরমিযী (র)	১৪৪০/-
❖ সুনানু আবী দাউদ (১-৪)	ইমাম আবূ দাউদ (র)	১২৫৫/-
❖ সুনান আন-নাসাঈ (১-৩)	ইমাম নাসাঈ (র)	৬৩০/-
❖ রিয়াদুস সালেহীন (১-৪)	ইমাম আন-নববী (র)	৬৫০/-
❖ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (১-৬)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	১০০০/-
❖ তাবি'ঈদের জীবনকথা (১-৩)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ	৪৮০/-
❖ মক্কা শরীফের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
❖ মদীনা শরীফের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	নিট-৬০/-
❖ আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৭০/-
❖ উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ কে এম নাজির আহমদ	নিট-২৫/-
❖ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন	এ কে এম নাজির আহমদ	৬০/-
❖ আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	১৬০/-
❖ আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	অনুবাদ : খোন্দকার রোকনুজ্জামান	৫০/-
❖ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত	জাবেদ মুহাম্মাদ	১২০/-
❖ Islamic Way of Life	Syed Abul A'la Maudoodi	net-35/-
❖ Islamic Ruling on Music and Singing	Abu Bilaal Mustafa al Kanadi	45/-
❖ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়	শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)	৭০/-
❖ কালজয়ী আদর্শ ইসলাম	সাইয়েদ কুতুব	নিট-২৫/-
❖ মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক শিক্ষা	অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান	২০০/-
❖ ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব	আব্বাস আলী খান	৮০/-
❖ শু'আবুল ঈমান	ঈমাম বাইহাকী	৬০/-
❖ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	৮০/-
❖ কবীরা গুনাহ	ইমাম আয্ যাহাবী (র)	৭৫/-
❖ সুদ: একটি অভিশাপ: পরিত্রাণের উপায়	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৩৫/-
❖ পর্দার বিধান	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী	নিট-৮/-
❖ ছাওম যাকাত ঈদুল আযহা	সংকলন	১২/-
❖ ইসলামী সংগঠন	এ কে এম নাজির আহমদ	৩৫/-
❖ ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি	এ কে এম নাজির আহমদ	নিট-৭/-
❖ আল্লাহর পরিচয়	এ কে এম নাজির আহমদ	১২/-
❖ আল্লাহ্র পরিচয় ও দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস	এ কে এম নাজির আহমদ	নিট-৬০/-
❖ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি	এ কে এম নাজির আহমদ	নিট-১৫/-
❖ ইলমুত্ তাফসির, ইলমুল হাদীস, ইলমুল ফিক্হ	সংকলন	৮০/-
❖ সুন্নাতু রাসুলিল্লাহ (সা)	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১১৫/-
❖ ইসরা, মিরাজ ও আল হিজাবের মর্মকথা	সংকলন	১২০/-
❖ ..আত্ তাবারী ও ..ইবনু কাসীর : জীবন ও কর্ম	ড. নজরুল ইসলাম খান আল মারুফ	৪০/-
❖ সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ [২০০৩-২০০৫]	সংকলিত	১৫০/-
❖ সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ [২০০৬]	সংকলিত	১১০/-
❖ সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ [২০০৭]	সংকলিত	১২০/-
❖ সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ [২০০৮]	সংকলিত	১৫০/-
❖ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	২০/-
❖ নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশারফ হোসেন	২০/-
❖ সফল জীবনের পরিচয়	এ কে এম নাজির আহমদ	নিট-৩৫/-

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (দোতলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬০৬৪৭,

www.bjilibrary.com

আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

একজন মানুষ ও রাসূল

ঈমানকে আন্তরিকভাবে ধারণ করার মাধ্যমে একজন মানুষ মুসলিম হিসেবে সমাজে বিবেচিত হয়। ঈমানের তত্ত্বগত দিক হচ্ছে ঈমানের বিষয়টি হৃদয়ে উপলব্ধি করা আর প্রায়োগিক দিক হচ্ছে ঈমানের ঘোষণা দেয়া এবং ঘোষণা অনুযায়ী জীবন পরিচালনায় সচেষ্ট থাকা। ঈমানের ঘোষণায় আমরা কী বলে থাকি?

"আশহাদু আল্ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি : আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহর আ'বদ ও রাসূল অর্থাৎ তিনি একজন মানুষ ও রাসূলও।

"আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের সাথে আমার পার্থক্য এতটুকুই যে, আমার প্রতি ওহী নাজিল হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে" [১৮:১১০]।

আল্লাহ এভাবে গোটা মানব জাতির কাছে মুহাম্মাদ [সা]-এর পরিচয় স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। আল্লাহ আরো বলছেন, "বল, পবিত্র মহান

www.bjilibrary.com

আমার প্রতিপালক। আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল [১৭:৯৩]। কোন অতিমানবীয় ধারণা থেকে আল্লাহ, তাঁর রাসূলকে [সা] মুক্ত রেখেছেন যাতে করে নিতান্ত সাধারণ মানুষও তাঁকে অনুসরণ করতে কোন অসুবিধা না হয়।

আ'বদ ও রাসূল

আল্লাহর কথাগুলো মানব জাতির কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে এবং নিজে তা নিষ্ঠার সাথে পালনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মুহাম্মাদ [সা] কার্যত আল্লাহর প্রকৃত আ'বদ-এর অনুসরণীয় প্রতীক হয়ে রইলেন। ঈমানের ঘোষণায় আমরা এই সহজ সত্যটুকুই উচ্চারণ করি– ...আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু।

আল্লাহর আইনের প্রতি তিনি ছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে অবিচলিত ও সংরক্ষণে অতন্দ্র প্রহরী। কখনই তিনি আল্লাহর আইনের ঊর্ধ্বে নিজকে মনে করেননি। আইনের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান মানুষ পৃথিবীর বুকে আর দ্বিতীয় জন পাওয়া যাবে না।

অসভ্য, খুনি, চোর, গুণ্ডা, বদমাশ, সন্ত্রাসী, জঙ্গী, দুর্নীতিবাজ, নেশাখোর, মদখোর, ব্যভিচারী, কালোবাজারী, যুদ্ধবাজ, সুদখোর, ঘুষখোর– এসব মানবতার দুশমনকে মানবতার বন্ধু বানাবার জন্য যে পরশ পাথর, ইসলামের সুমহান বাণী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদ [সা]-কে দিয়েছেন, তা আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে আল্লাহর রঙে রঙীন হয়ে এসব মানুষ মানবতার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন।

সুদখোর, মদখোর, নেশাখোর, ঘুষখোর, চাঁদাবাজ, মজুদদার, কালোবাজারী, ছিনতাইকারী, সন্ত্রাসী, নারী-নির্যাতনকারী সব মিলিয়ে আজ বাংলাদেশ যে দুর্বিষহ সংকটে খাবি খাচ্ছে, তা থেকে মুক্তির জন্য ইতোমধ্যে অনেক প্রায়োগিক পরীক্ষা করা হয়েছে 'অপারেশন ক্লিন হার্ট'-এর নামে। দুদক-এর 'দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া'র নামে হেলিকপ্টার ভ্রমণের মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ শেখ মজিবুর রহমান, স্বাধীনতাউত্তর আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি"– এই চোরের খনির বৃত্ত থেকে এখনও বাংলাদেশ বের হতে পারেনি। বের হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ প্রায়োগিক পরীক্ষাগুলো ছিল কিছু উচ্চাভিলাষীর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং আল্লাহর অবতীর্ণ জীবন বিধান আল কুরআন তথা আসমানী পরশ পাথরের দিকনির্দেশনাবিবর্জিত। ফলে চোরের খনি সোনার খনিতে পরিণত হয়নি, হবে না। সোনার খনিতে পরিণত করতে হলে অবশ্যই তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সা] দেখানো পথেই করতে হবে। অন্য কোন পথে সময়, শ্রম, মেধা, অর্থ নষ্ট হবে মাত্র।

উসওয়াতুন হাসানা : কালজয়ী আদর্শ

রাসূল [সা]-এর মধ্যে রয়েছে কালজয়ী উত্তম আদর্শ [৩৩:২১]। আর রাসূলকে আল্লাহ সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে [ভয় প্রদর্শনকারীরূপে] প্রেরণ করেছেন [৩৪:২৮]। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহর কথা অনুযায়ী ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ সব মহাদেশের মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে মুহাম্মাদ [সা]-কে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং

www.bjilibrary.com

ভাষা, বর্ণ, গোত্র অথবা সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতীয়তা মূল্যায়ন করার পরিবর্তে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ সব মহাদেশের মানুষের রাসূলের আদর্শের অনুসরণে অগ্রণী হওয়াই কুরআনের দাবি। অন্য যে কোন আদর্শের অনুসরণ মানব জাতির সংকটকে শুধু ঘনীভূতই করবে। মানুষের সুখ-শান্তি, দারিদ্র্যমুক্তি মুখের বুলি হয়েই থাকবে। সোনার হরিণ হয়েই থাকবে। আজকের ফ্রি সেক্সের ইউরোপ-আমেরিকার দিকে চোখ ফেরালেই দেখতে পাবেন ব্যভিচার, ধর্ষণ, সমকামিতা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। শত শত নয়, হাজার হাজার সোনার সংসার ছারখার হচ্ছে। ফ্রি সেক্স দর্শন, সংকটের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে বহু গুণে বহু রূপে কিন্তু সমাধান দিতে পারেনি। পারবে না। পাশ্চাত্যে নারীদের মর্যাদা বলতে যে কোন দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগিতাকে বোঝায়। আইনের ভাষায় নারী মর্যাদার বুলি, পাশ্চাত্য যত চিৎকার করে বলে, বাস্তবে সাধারণ নারীদেরকে মানবিক মর্যাদায় নয়, শুধু যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করাই হয়। ক্ষমতায়নের নামে সাধারণ নারীদেরকে যে জীবন-ধারায় পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত করে তুলেছে, তার মাঝে মনুষ্যত্বের চেয়ে পশুত্বই প্রধান। আর কখনো কখনো তা পশুর চেয়েও নিম্নস্তরের দৃষ্টান্তে সমুজ্জ্বল। স্বাধীনতা-ক্ষমতায়ন-অধিকার ইত্যাদির মোড়কে পাশ্চাত্যের এসব পাশবিকতা যদি ভাল লাগে তবে বুঝতে হবে আমরা যথার্থই বিকৃতির শিকার হয়েছি। ধ্বংসের পথকে বেছে নিয়েছি। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার অনিবার্য সঙ্গী লোভের বল্গাহীনতা মানুষকে অর্থের দাসে পরিণত করেছে। মানবিক অনুভূতি, সহমর্মিতা সবই সেখানে অর্থের দাস। সহানুভূতি-সহমর্মিতা এখানে শুধুই পণ্য। অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয়। তথাকথিত করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি মূলত আরো অধিক অর্থ সঞ্চয়ের/অর্থ আয়ের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনমাত্র। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা এক মানবিক মরীচিকার যান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। মানব সভ্যতায় মানবিক অবদান রাখার পরিবর্তে দু'টো বিশ্বযুদ্ধ আর পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়া পাশ্চাত্যের কাছে দেবার কিছু আর ছিল না। এখনও নেই, অথচ জাগতিক ও নৈতিক উভয় দিকে সবচেয়ে সফল মানুষ মুহাম্মাদ [সা]-এর আদর্শ থাকা সত্ত্বেও আমরা পাশ্চাত্যের মানবিক মরীচিকায় বারবার প্রতারিত হতে ভালোবাসি। ভালোবাসি আইএমএফ আর ওর্য়াল্ড ব্যাঙ্কের ফাঁদে নিজেকে বারবার ধরা দিতে। এক দুর্বোধ্য হীনমন্যতাবোধ আর আত্মসমর্পিত মানসিকতা আমাদেরকে বেষ্টন করে আছে যেন, অথচ মাইকেল এইচ হার্ট তার গবেষণালব্ধ "The 100, A ranking of the Most Influencial Persons in History"- বইয়ের ৩৩নং পৃষ্ঠায় বলেন, "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels". Michael H. Hart, The 100, A Ranking of The Most Influential Persons In History, pp-33.

জর্জ বার্নার্ড শ' বলেন,

www.bjilibrary.com

If any religion has the chance of ruling over England nay Europe, within the next hundred years, it can only be Islam. [Islam: what others say,pp221]

মহাত্মা গান্ধী বলেন,

Muhammad was a great Prophet. He was brave and feared no man but God alone. He was never found to say one thing and do another. He acted as he felt. [Islam: what others say pp, 96]

মহাত্মা গান্ধী আরো বলেন,

I have read Sir Abdullah Suhrawardy's collections of the sayings of the Prophet with much interest and profit. They are among the treasures of mankind, not merely Muslims. [Islam: what others say, pp 96]

মাইকেল এইচ হার্ট, জর্জ বার্নার্ড শ' কিংবা মহাত্মা গান্ধী মুহাম্মাদ [সা]-এর সাথে কোন বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত নন কিংবা অন্য কোনভাবে প্রভাবিতও নন। আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়া-আফ্রিকার এই তিন দিকপালের তিনটে উদ্ধৃতিই এতটুকু প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, মানব জাতির জন্য ইসলাম এক অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ জীবন বিধান। এমন একটি শ্রেষ্ঠ জীবন বিধান এবং তার বাস্তবায়নকারী অনুপম চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মাদ [সা]-এর আদর্শ থাকতেও কিভাবে আমরা মরণোত্তর নেতৃত্ব ও আদর্শ অনুসরণের নামে রাসূল [সা]-কে এড়িয়ে চলি তা ভাবলে দুঃখ হয়।

মরণোত্তর নেতৃত্ব ও ভালোবাসার শক্তি

মুহাম্মাদ [সা] একজন রাসূল মাত্র; তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি জাহিলিয়্যাতের দিকে ফিরে যাবে? [৩:১৪৪]। আল্লাহ মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করবার জন্য– কে কর্মে উত্তম [৬৭:২]? যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হত না, তাদেরকে বলুন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর [৩:১৬৮]।" এটাই চূড়ান্ত সত্য যে, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে [৩:১৮৫]। সফল-অসফল সকল নেতৃত্বকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসাই আমাদেরকে মরণোত্তর নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত করে। বর্তমান বিশ্ব মূলত মরণোত্তর নেতৃত্বের অনুপ্রেরণায় পরিচালিত। আমরা অনেকেই মরণোত্তর নেতৃত্বকে ভালোবাসি, দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের অবদানের জন্য। কিন্তু এই ভালোবাসা যেন রাসূলকে ছাড়িয়ে না যায়! কারণ সবার ওপরে ভালোবাসা পাবার অধিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সা]।

"আনাস [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে [সা] বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হই।" [বুখারী, মুসলিম]

ভালোবাসা হৃদয়ের ব্যাপার। জোরাজুরির ব্যাপার নয়। ভালোবাসা জোর করে আদায়

www.bjilibrary.com

করা যায় না। মন থেকে স্বতঃউৎসরিত হয় ভালোবাসা। Slavery ইস্যুতে আব্রাহাম লিংকনের প্রতি আমেরিকার জনগণের ভালোবাসা, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘোচানোর শ্রেণী সংগ্রামে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের ভালোবাসা, শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লেচ ওয়ালেচার প্রতি পোল্যান্ডের জনগণের ভালোবাসা, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মুসলিমদের অধিকার আদায়ে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতি ভারতের মুসলিম জনগণের ভালোবাসা, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসার দৃষ্টান্তগুলো ছিল অকৃত্রিম। যদিও পরবর্তী সময়ে এসব ভালোবাসার স্থায়িত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু রাসূল [সা]-এর প্রতি ভালোবাসা শুধু মরণোত্তর ভালোবাসা নয়, এ ভালোবাসা ঈমানের সাথে জড়িত। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে [সা] ভালোবাসা না বাসার সাথে ঈমানের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত। তাহলে ভালোবাসা কি আল্লাহ্পাক জোর করে আদায় করতে চান? নাকি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল [সা] কার্যতঃই এর প্রাপ্য? বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে রাসূল [সা] আল্লাহ্ কর্তৃক শুধু বিশেষ কোন জাতির জন্য নেতা বা রাসূল মনোনীত হননি, তিনি গোটা মানব জাতির জন্য রাসূল হিসেবে, নেতা হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না [৩৪:২৮]।" আল্লাহ্ আরো বলেন, "বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী [৭:১৫৮]।" সুখী-সমৃদ্ধ-শান্তিময় এক সমাজ গঠনের জন্যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল [সা]-এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান নাযিল করেছেন [যা আল্লাহ্ নাজিল না করলে আমরা আল্লাহকে বাধ্য করতে পারতাম না] এবং রাসূল [সা] গোটা মানব জাতির জন্য সে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মানবতার কল্যাণ সাধন করেছেন, আজ তার কোন জুড়ি নেই। মাইকেল এইচ হার্ট, মহাত্মা গান্ধী, জর্জ বার্নার্ড শ'-সহ অসংখ্য রাজনীতিবিদ-মনীষীর অকপট স্বীকারোক্তি তারই প্রতিধ্বনিমাত্র। গোটা মানব জাতির এই কল্যাণ ও সুখ-শান্তিকে যদি আন্তরিকভাবে অনুভব করা সম্ভব হয় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের [সা] জন্য হৃদয়ে ভালোবাসার নদী দু'কূল ছাপিয়েই প্রবাহিত হবে এবং মানবতার প্রতি এ অনন্য অবদানের জন্য জীবনোৎসর্গকারী এমন চিরন্তন ভালোবাসা পাবার সত্যিকার অধিকারীই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল [সা]– একথা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

সোনালী সমাজ

যে কোনো সমাজ বিনির্মাণে ভালোবাসা সবচেয়ে বড় উপাদান। ঘৃণা আর হিংসা-হানাহানি করে কোন শান্তির সমাজ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত একটিও দেখানো যাবে না। ভালোবাসার শক্তি অপরিমেয়। ভালোবাসা অফুরন্ত কল্যাণের উৎস। ভালোবাসা জীবনোৎসর্গকারী মহান ত্যাগের উদ্বুদ্ধকারী প্রেরণা। সমাজ

www.bjilibrary.com

বিনির্মাণে ইসলাম এই ভালোবাসার শক্তিকেই তার মূল উপকরণ হিসেবে বেছে নিয়েছে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আর অবিভাজ্যতার স্বচ্ছ ধারণা এবং রাসূল [সা]-কে সব ভালোবাসার উর্ধ্বে স্থান দিয়েই ইসলাম সোনালী সমাজ নির্মাণে মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যত বড় নেতাই আমরা হই না কেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে [সা] ভালোবাসার সোপানে পা দিয়েই কেবল মানবতার কল্যাণ করার ক্ষমতা আমরা দেখাতে পারবো। অন্যথায় জনগণের ভালোবাসা মুখ থুবড়ে পড়বে। ভালোবাসা ঘৃণায় পরিণত হবে। হিংসা-হানাহানির দংশনে দেশ-জাতি ক্ষতবিক্ষত হতে থাকবে। যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [সা]-এর ভালোবাসায় সাড়া দিয়ে মানবতার পথে ফিরে না আসি। সোনালী সমাজ বিনির্মাণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা আমাদের এ শতধাবিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র হাতিয়ার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি একান্ত ভালোবাসাই পারে মানবতার কল্যাণে এ জাতিকে ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি দিতে।

আবদুর রহমান বিন কারাদ [রা] থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল [সা] অযু করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁর অযুর পানি নিজেদের গায়ে মাখতে শুরু করেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল [সা] বললেন, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। নবী [সা] বললেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবেসে পরিতৃপ্ত হতে চায় অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা পেতে চায় তারা যেন ১. সত্য কথা বলে, ২. সঠিক অর্থে আমানতের হিফাজত করে এবং ৩. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে [মিশকাত] অর্থাৎ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে [সা] ভালোবাসার মানেই হলো সত্য কথা বলা, সঠিক অর্থে আমানতের হিফাজত করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা। প্রিয় পাঠক, ভালোবাসার এই তিনটে ফুল যদি এ জাতি গ্রহণ করতো তবে চোরের খনি অবশ্যই সোনার খনিতে পরিণত হত। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত অন্ধকার সমাজ সোনালী সমাজে পরিণত হত।■

www.bjilibrary.com

প্রাচ্যবিশেষজ্ঞগণের ডাহা মিথ্যাচার প্রেক্ষাপট : সীরাতে রাসূল [সা]

ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম

পাশ্চাত্যের অনেকেই প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাদেরকে Orientalist বা প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ বলা হয়। তারা প্রাচ্যের অনেক ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে লিখেছেন। তবে তারা প্রাচ্যের ইসলাম ধর্ম তথা আরবী, কুরআন, রাসূল [সা]-কে নিয়ে যতোবেশী গবেষণা করেছেন প্রাচ্যের অন্য কোন ধর্ম নিয়ে তেতো বেশী গবেষণা করেন নি। আমরা আজ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যমুখী। তাদের অনুকরণ আমাদের কাছে প্রশংসনীয়। আমাদের অনেকেরই ধারণা এ সকল পাশ্চাত্যের বিদ্বানদের দেয়া তথ্য ও তাদের গবেষণাই চূড়ান্ত সত্য। তারা ভুলের উর্ধ্বে। জ্ঞানের জগতে তারাই শ্রেষ্ঠ, এমন কি ইসলাম সম্বন্ধে তাদের গবেষণালব্ধ সকল তথ্যই সমালোচনার উর্ধ্বে। তাদের গবেষণার ফলাফল নির্ভুল। আমাদের অনেকের মনেই এ ধারণা আজ বদ্ধপরিকর। পক্ষান্তরে বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম, নবী, রাসূল, কুরআন, হাদীস প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ও লেখা প্রায় ক্ষেত্রেই পক্ষপাতদুষ্ট। তারা ইসলামবিদ্বেষী হওয়ার কারণে এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাদের অনেকেই রাসূল [সা]-এর জীবনী রচনায়ও অংশ নিয়েছেন। তিনি ছিলেন সৃষ্টির

www.bjilibrary.com

সেরা মানুষ। নৈতিকতা বোধে তিনি তুলনাহীন। সেই নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বকেও তারা নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হননি। রাসূল [সা] সম্পর্কে তারা আজগুবি কথাবার্তার প্রশ্রয় নিয়েছেন। মিথ্যা বক্তব্য ও মন্তব্য করেছেন। অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের এই সত্যদ্রোহী, বাস্তবমুখী চরিত্র উন্মোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার মাধ্যমে তাদের এই পক্ষপাতদুষ্ট, ভ্রান্ত মতামত খণ্ডন করা অতীব জরুরি।

পাশ্চাত্যে প্রাচ্যকেন্দ্রিক গবেষণার সূচনা

পাশ্চাত্য ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানত না, এমন কি সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দেও তাদের নিকট ইসলাম একটি মূর্তিপূজার ধর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল। এই শতাব্দীতে সেখানে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। নিজেদের প্রয়োজনেই সে সময় তারা ইসলামকে জানতে শুরু করেন। এই প্রেক্ষাপটেই তাদের মধ্য হতেই প্রাচ্যবিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব হয়। শুরু হয় অসংখ্য আরবি পুস্তকের অনুবাদ, বিশেষ করে আরবিতে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদ করাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। এই সকল ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আরপ নিউস [Arp], মারগুলিউস এডউর, পুকক [Pococke] ও হ্যাটিনজার [Hattinjer]। অনেকটা কাকতালীয়ভাবে এ সময়ে আরবি থেকে অনূদিত প্রায় সকল ইতিহাস গ্রন্থের লেখকরা ছিলেন খ্রিষ্টান। যেমন সায়ীদ বিন বতরীক [মৃ. ৯৩৯ খ্রি.], ইবনি আমীদ আল-মাক্কীন [১২৭৩ খ্রি.], আবুল ফরজ ইবনুল আরাবী আল-মালতী [১২৮২ খ্রি.]। তারা সকলেই ছিলেন আরবিভাষী খ্রিস্টান।

অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে ইসলাম, আরব, প্রাচ্য সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। ইসলামকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ সময় থেকেই তারা জানতে শুরু করেন। ইসলাম সম্পর্কে লেখাও প্রকাশিত হয় এ সময় থেকেই, এমন কি ১৮৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপে প্রত্যহ গড়ে একটি করে ইসলাম বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। ১৮০০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ইউরোপে ইসলাম বিষয়ে প্রায় ষাট হাজার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ইসলাম ও ইসলামী বিশ্ব নিয়ে গবেষণার জন্য শুধু আমেরিকাতে ৫০টির বেশী গবেষণাগার রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থান হতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রায় তিন শ' ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। বিগত একটা বছরে ইসলামকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে অসংখ্য কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছে প্রায় ত্রিশটি। অক্সফোর্ড সম্মেলন ছিল তন্মধ্যে অন্যতম। সেখানে প্রায় নয় শ' প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ একত্র হন। এর সবেরই উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমানদের থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জায়গা লাভ করা। মুসলমানদেরকে সকল ক্ষেত্রেই পদানত করে রাখার অভিনব কলাকৌশল উদ্ভাবন ছিল এদের অন্যতম লক্ষ্য।

পাশ্চাত্যে সীরাত চর্চা

পাশ্চাত্যে সীরাত চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এ সময়ে সীরাতে রাসূল [সা]-এর উল্লিখিত প্রায় সকল আরবি পুস্তক ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। সর্বপ্রথমে Reiske [১৭৭৪ খ্রি.] আবুল ফাদা' রচিত ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থ পাদটিকাসহ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয় সেই সময়েই। অস্ট্রীয়

www.bjilibrary.com

প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ Kremer [১৮২৮-১৮৮৯] ১৮৫৬ সালে মুহাম্মাদ বিন অকিদী [৭৪৭-৮২২]-এর কিতাবুল মাগাযী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৬০ সালে ইবনি হিশাম [৮২৮ খ্রি.] রচিত সীরাতে রাসূল, আলী নূরুদ্দীন সামহুদী [১৫০৬ খ্রি.] রচিত মদিনার ইতিহাস ও ইবনি কুতাইবা [৮২৮-৮৮৯ খ্রি.] রচিত তারিখুল মা'য়ারিফ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৬৪ সালে ড. G. Well সীরাতে ইবনি হিশামকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৭৭ সালে ফ্রান্সের অধ্যাপক Manet Edouard [১৮৩২-১৮৮৩] আলী বিন আল হুসাইন আল-মাসউদী [৯৫৬]-এর মুরুয-উয-যাহাব প্রকাশ করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে Wellhausen মুহাম্মদ ইবনে উমার আল-অকিদী [৭৪৭-৮২২]-এর কিতাবুল মাগাযী জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ সালে Houstasma আহমাদ বিন অদিহ আল-য়া'কুবী [৮৯৭ খ্রি.]-এর রচিত ইতিহাস গ্রন্থকে দু'খণ্ডে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। ১৮৭৯ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর সাধ্য সাধনার পরে J. Barth ও Moldcke [১৮৩৬-১৯৩০] মিলে আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তবারী [৯২৩] কর্তৃক রচিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ "তারীখুল উমাম অল মুলূক" গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইবনি সা'য়াদ মুহাম্মাদ আয-যুহরী [৮৪৫] কর্তৃক রচিত "কিতাবুত্-তবাকাতুল কুবরা" এক নজীরবিহীন গ্রন্থ। রাসূল [সা]-এর জীবনীর ওপর এত বিস্তৃতভাবে অন্য কোন গ্রন্থে আলোচনা হয়নি। জার্মানির অধ্যাপক Sachuu-এর নিরলস চেষ্টা ও তার সাথীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯০০ সাল থেকে এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড করে প্রকাশনা শুরু হয়।

এ সকল মূল গ্রন্থ অথবা অনুবাদ গ্রন্থ ইউরোপ ও আমেরিকাতে ইসলামের ইতিহাস, বিশেষ করে রাসূল [সা]-এর সীরাত চর্চার পথ উন্মুক্ত করে। তারা এ সকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এমন কি এগুলো থেকে প্রভাবিত হয়ে তারাও রাসূল [সা]-এর জীবনী লিখতে শুরু করেন। আস্তে আস্তে রাসূল [সা]-এর সীরাত নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়। তাদের কেউ কেউ মুহাম্মাদ [সা]-এর সীরাত লেখকদের তালিকাভুক্ত হওয়াকেও সৌভাগ্য মনে করতেন।

সীরাত চর্চায় ডাহা মিথ্যাচার

প্রাচ্যবিশেষজ্ঞদের মধ্যে যারা রাসূল [সা] সম্পর্কে কথা বলেছেন অথবা তার সীরাত বা জীবনী রচনা করেছেন দুই-একজন ছাড়া তাদের প্রায় সকলেই যে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। উদাহরণস্বরূপ রাসূল [সা]-এর জীবনের দু'টো একটি বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো। যেসব বিষয়ে তারা অসত্যের অবতারণা করেছেন, মিথ্যার প্রশ্রয় নিয়েছেন, এমন কি সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ হননি। সীরাতকেন্দ্রিক আলোচনায় তারা যেসব বিষয়ে ডাহা মিথ্যাচারের প্রশ্রয় নিয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে–

অহি ও রিসালাত : তাদের ভাষায় "আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মাদের নিকটে কোন অহি আসেনি।" এর অর্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত রাসূল বা নবী ছিলেন না। কুরআনও আল্লাহর বাণী নয়। সুতরাং ইসলামের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

"Mohammed at Makka" ও "Mohammed at Medina" গ্রন্থদ্বয়ের লেখক Montogomary Watt এ প্রসঙ্গে বলেন, "মুহাম্মাদের রাসূল হওয়া ও তাঁর নিকটে

www.bjilibrary.com

কুরআন অবতীর্ণ হওয়াটা স্বকল্পিত ধ্যান-ধারণা মাত্র। বাস্তবে অহি বলতে বাইরের কোন কিছু তাঁর নিকটে আসেনি, বরং তিনি রিসালাত ও অহি সম্পর্কে যা কল্পনা করতেন সেইটাকে রিসালাত ও অহি বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি রাসূল ছিলেন না। তাঁর কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয়নি।" তিনি অত্যন্ত চতুরতার সাথে রাসূল [সা]-এর হাদীসের ভাব-ভাষা ও কুরআনের ভাব-ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার কারণের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনিই বলেন, "দু'টোই মুহাম্মাদের রচিত। যা তিনি অবচেতন মনে রচনা করেছেন তাই কুরআন, আর যা' স্বাভাবিকভাবে রচনা করেছেন তাই হাদীস।

তিনি আসলে এই বক্তব্যে কুরআনের অলৌকিকত্বের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। কুরআন যে সর্বকালের, সকল যুগের, সবার জন্য মহাচ্যালেঞ্জ, সে সম্পর্কে হয়ত তিনি জেনেও না জানার ভান করেছেন অথবা না জেনে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন। নিরক্ষর মুহাম্মাদ [সা]-এর পক্ষে এই মহাচ্যালেঞ্জ নামক জীবন ব্যবস্থা প্রণয়নকে সম্ভব বলা, পাগলামী বা সত্যদ্রোহী বৈ কিছু নয়। দীর্ঘ চৌদ্দ শ' বছরেও এই চ্যালেঞ্জের মুকাবেলার দু:সাহস কেউ দেখায়নি, এইটুকুই যথেষ্ট যে, এটি মহান স্রষ্টারই বাণী। সেই শাশ্বত সত্যই উচ্চারিত হয়েছে কুরআনেই– "আল কুরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে, বরং এটি পূর্ববর্তী যা তাদের কাছে এসেছে তার সত্যতা স্বীকার করে ও তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে। এটা যে বিশ্বনিয়ন্তার পক্ষ থেকে আসা তাতে কোন সন্দেহ নেই।" [১০ : ৩৭]

অতি সম্প্রতিকালে প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ হাড্ডাড নামক এক অপরিচিত লেখকের দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি হচ্ছে– "Mohammed and the Qur'an" ও অপরটি হচ্ছে– "Jesus and the Qur'an"। এ বই দু'টিতে মুহাম্মাদ [সা]-এর অরাকাহ ইবন নাওফালের সাথে পনের বছরের সম্পর্ক প্রমাণের অপচেষ্টা চালান হয়েছে। লেখকের ভাষায় অরাকাহ মুহাম্মাদের সাথে খাদীজার বিবাহ দেন। এটি এই সম্পর্কের বাস্তব প্রমাণ। দীর্ঘ এই সম্পর্ক থাকার কারণেই মুহাম্মাদ [সা] খ্রিস্টান ধর্মগুরু অরাকার নিকট থেকে অহি প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং ইসলামে যে অহির কথা বলা হয় তার উৎসই হচ্ছে, অরাকা ইবনে নাওফাল। এখানে ঐতিহাসিক দিক থেকে সর্বস্বীকৃত তথ্যের বিপরীতকে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা উক্ত লেখকের পক্ষপাতিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত এটাই যে, হযরত খাদীজাহ [রা]-এর চাচা আমর ইবন আসাদ-ই খাদীজার সাথে রাসূল [সা]-এর বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং সেখানে অরাকাকে টেনে আনা ইতিহাসের স্বীকৃত সত্যকে আড়াল করার অপপ্রয়াস। ইসলামের অহির উৎস খ্রিস্টানরাই, তা প্রমাণের ব্যর্থ অপচেষ্টা।

তাদের কেউ কেউ মনে করেন, "মুহাম্মাদের কাছে প্রথম অহি এসেছিল অরাকাহ থেকে। দ্বিতীয় অহি এসেছিল হিরা গুহায়।" এখানে হিরা গুহায় আসা অহি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তার অস্পষ্ট স্বীকৃতি থাকলেও তা কিন্তু তারা স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা পেয়েছেন। তাদের আবার কেউ কেউ সত্যের এই অপলাপও করেছেন যে, মুহাম্মাদের অহি ইয়াহুদি ধর্মযাজক বুহায়রার কাছ থেকে প্রাপ্ত, এমন কি ইসলামের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলোই এই বুহায়রার অবদান– তারা এমন অবাস্তব ও মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করেননি। এভাবেই তারা মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।■

www.bjilibrary.com

কালবিভা ॥ সু জা উ দ্দি ন কা য় সা র

পবিত্র ঐশ্বর্যের এক পরম চিন্তন সে তো সীমাহীন।
অপার জ্ঞানজ্যোতি প্রজ্ঞা গাঁথে হৃদি সত্তায়
সুনিপুণ সৃষ্টি শোভন :

স্বপ্ন, সাহস, ইচ্ছে, ত্যাগে ও কর্মে ফোটে অন্তরাত্মায়
মগ্ন মহিমা। এ প্রাণ, এ মন, শুধু কল্যাণের কালবিভা দেখে
চিরসত্যময় নূরানী আলো ছায়া, মননে বাঁধে সাধনা।
তখন চৈতন্যে উন্মোচিত হতে থাকে বিবেকের যতো ধ্যান
এবং কত শত প্রার্থনা।

জন্ম এবং মৃত্যু চিরন্তন প্রথায়
আজ স্মরণে শুধু বাজে শাশ্বত ধ্বনি, নিগূঢ় প্রেম
আপ্লুত করে মর্মবাণী।
শক্তির অধীশ্বর হে আল্লাহর নূরনবী, মানবশ্রেষ্ঠ
বিশ্বজাহান ঘিরে অগণন আলোর সৃষ্টি সুধায়
নতজানু তামাম জীবকুল
তোমার কামনায় পানা চায় জীবন মরণ ভবিষ্যতে।

আমাকে টেনে নাও ততো গুনাহ মাফ করে
যতো আমি ভুল, পাপী আর নষ্ট
হে মহান আল্লাহ, ওহে রাসূলে খোদা [সা]
জীবনের এ মার্জনা তুমি কবুল কর।

www.bjilibrary.com

তোমাকে পাওয়ার পিপাসায় ॥ শ রী ফ আ ব দু ল গো ফ রা ন

আমি এক পিপাসার্ত পথিক!
জেগে আছি কূলহারা অতন্দ্র
প্রহরীর মতো দরিয়ার ওপারে
নোঙর ফেলে।

তন্দ্রায় ঢুলছে তারা ভরা রাত
দেহ জুড়ে অপার্থিব আলো
পৃথিবী জুড়ে যেন অলৌকিক
জোস্‌নার খেলা!

নি:শ্বাসে নিমগ্ন গোলাপের ঘ্রাণ
ভরে গেছে হৃদয়বাগান।
সারি সারি বিরহীর মিছিলে
সুরের অবগাহনে মুখরিত মহাপ্রান্তর।

আমার পরাণ সমুদ্রে দোল খায়
শীতল বাতাস
ফোঁটা ফোঁটা নোনা জলে
ভিজে যায় জায়নামাজ
বেলি ফুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে
তসবির দানা।

আমি তখন দু'হাত প্রসারিত করে
পড়ে থাকি দীর্ঘ সেজদায়
অপেক্ষার জাল ফেলে
তোমাকে পাওয়ার পিপাসায়।

www.bjilibrary.com

রাসূল আমার প্রিয় রাসূল ॥ আ ল তা ফ হো সা ই ন রা না

রাতের আঁধার দূর হয়ে যখন
ভোরের সূর্য উঠলো,
আলো ঝলমলে পৃথিবী তখন
গোলাপ হয়ে যেন ফুটলো!

ফুলের বাগানে হাজারো কলির
সুবাসিত ছড়ানো ফুল
খোদার 'পরে কেবল তোমারই গুণাবলী
রাসূল আমার প্রিয় রাসূল।

সারা জাহানের মুসলিম তরে
ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার মাঝে,
আকাশ ও জমিনে খোদার 'পরে
একটি নামই হৃদয়ে বাজে।

যার পরশে আঁধার দূরীভূত হলো
নতুন পথ পেলো মানবকুল,
পৃথিবীর আঁধার আলোকিত করে এলো
রাসূল আমার প্রিয় রাসূল ॥

www.bjilibrary.com

প্রার্থিত ॥ রে জা নু র র হ মা ন রে জা

সেদিনও সকাল হয়েছিলো,
আমিনার জানালায় রেখেছিলো সূর্য
অন্য আলো– গভীর অন্ধকারে যেনো
হাজারো জোনাকির ঝাঁক। বাতাসও অবাক!

মেঘেরা আকাশ ভুলে নেমে আসে নিচে,
বলে, নবী! চড়বে কি আমাদের দোলনায়?
তোমাকে দেখাবো আদমের পথ,
ঘাসের ডগায় প্রথম মানুষের পায়ের চিহ্ন।
নূহুর নৌকোর পালের বাতাসে খেলেছি কতো,
এতো বেশী বৃষ্টি হয়ে কখনও নামিনি আগে।
ছাদের মতো ছায়া হয়ে থেকেছি ইবরাহীমের,
বিছানো সেই ছায়ায় নিয়েছেন আশ্রয়,–
ইসহাক ইয়াকুব আর ইউসুফ।
আগুনের মোহ মূসাকে দেয় মাবুদের খোঁজ
দেখেছি তারপর ফেরাউন দিন গোণে রোজ
দাউদের দালান দেখাবো তোমাকে,
সিংহাসন, সোলাইমানের–
ইয়াহিয়ার নিভৃত গুহায় এখনও ধ্বনিত হয়
প্রভুর নাম, এখনও বয়ে চলে জর্ডান নদীতে
অভিসিঞ্চনের সেই পানি।

ঈসা আসেন জয়তুনের ছায়া-মাখা জেরুজালেমের পথে,
বলেন, 'আমার পরে আসবেন আহমাদ।... নিজে থেকে বলবেন না কিছু,
যা কিছু শুনবেন তা ছাড়া, –পৌঁছে দেবেন পরিপূর্ণ সত্যে মানবের।'

www.bjilibrary.com

নবী এলেন মরু-মক্কায়

আসাদ বিন হাফিজ

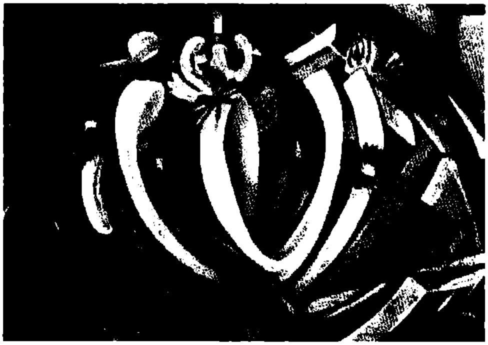

মক্কা। আরবের খুব নামকরা একটি শহরের নাম। শুধু আরব নয়, বিশ্ব ছড়িয়ে আছে এ শহরের সুনাম। এ সুনামের পেছনে রয়েছে একটি ঘরের অবদান। এ ঘর আল্লাহর ঘর। এ ঘরের নাম কাবা শরীফ। পৃথিবীর সবচেয়ে মহিমান্বিত ঘর এটি। আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। সে অনেক কাল আগের কথা। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ আজও এই ঘরকে মনে রেখেছে। আজও সারা দুনিয়ার মানুষ ছুটে যায় এ ঘরের কাছে। আজও সমান গুরুত্ব দিয়ে এ ঘর প্রদক্ষিণ বা তাওয়াফ করে। আজও পরম মমতায় স্মরণ করে তার সৃষ্টির কাহিনী। কাবা কেবল ঘর নয়; এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা বিশ্বের নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রতীক। এ ঘরকে ঘিরে আজও আবর্তিত হয় কোটি কোটি মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাই এ ঘর শুধু মক্কা শহর নয়, শুধু মরুময় আরব ভূমি নয়, সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাবান ঘর হিসেবে বিবেচিত।

কাবা ঘরকে কেন্দ্র করেই এ শহরের নাম হয়েছে মক্কা। পৃথিবীতে যেমন কাবাঘরের মতো মর্যাদাবান কোনো ঘর নেই, তেমনি মক্কা

www.bjilibrary.com

শহরের মতো কোনো শহরও নেই। এ ঘর ও একে কেন্দ্র করে এখানে শহর পত্তনের কাহিনী অনেক পুরনো। সে কাহিনী খুবই চমকপ্রদ! সে কাহিনী রহস্য উপন্যাসের মতোই মজাদার। কোন কল্পকাহিনী নয়, বরং বিস্ময়কর এক সত্য ঘটনার মধ্য দিয়ে এ কাহিনীর জন্ম। হাজার হাজার বছর ধরে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষের মুখে মুখে সেই কাহিনী জীবন্ত হয়ে আছে। আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনেও বর্ণনা করেছেন সেই গৌরবময় কাহিনী। ছোটবেলায় আমরা আব্বা-আম্মা ও দাদী-নানীর মুখে শুনেছি সে কাহিনী। বড় হয়ে বই এবং কুরআন ও হাদীস পড়ে আরো বিস্তারিত জেনেছি।

আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বসত ছিলো মিশর। 'সারা' নামে তাঁর একজন স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সন্তান ধারণে তিনি ছিলেন অক্ষম। দীর্ঘদিন সংসার করার পরও তাঁর কোনো সন্তান না হওয়ায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আবার বিয়ে করেন। নতুন স্ত্রীর নাম হাজেরা। তিনি নবীজিকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর নাম রাখেন ইসমাঈল।

সারা ছিলেন খুব প্রতাপশালী মহিলা। সতীনের ঘরে সন্তান হওয়ায় সারার মনে জাগে ঈর্ষা। শুরু হয় দুই সতীনে মনোমালিন্য ও ঝগড়া। ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, এতে শিশুর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এক অদ্ভুত হুকুম দেন। এ হুকুমের মাহাত্ম্য এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা ছিলো না। তিনি নবীজিকে হুকুম করেন শিশুপুত্রসহ বিবি হাজেরাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিতে।

আল্লাহর হুকুম তো আর অমান্য করা যায় না! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর প্রিয়তম স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কোথায় নির্বাসনে পাঠাবেন? এ নিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন চিন্তা করছিলেন তখন আল্লাহই এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি জিবরীল ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিলেন সফরের পথপ্রদর্শক হিসেবে।

শিশুপুত্র ইসমাঈল ও স্ত্রীকে নিয়ে সফরে বের হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলনে জিবরীল আমীন। পথে কোনো জনপদ দেখলেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জানতে চাইতেন, 'এখানেই কি আল্লাহ্ ওদেরকে নির্বাসন দিতে বলেছেন?' জবাবে জিবরীল বলতেন, 'না, আপনার গন্তব্যস্থল আরো সামনে।'

এভাবে অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে,অনেক বালিয়াড়ি মাড়িয়ে, অনেক জনপদ পেছনে ফেলে তাঁরা এসে পৌঁছুলেন মক্কায়। জিবরীল আলাইহিস সালাম এখানে থামলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কিছু বাবলা গাছ ও কাঁটাযুক্ত বন-জঙ্গল ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন জিবরীল ফেরেশতার দিকে। বললেন, 'এখানেই কি আল্লাহ্ ওদের নির্বাসন দিতে বলেছেন?' জিবরীল বললেন, 'হ্যাঁ।'

জনমানবহীন বিরান প্রান্তর। প্রিয়তমা স্ত্রী ও একমাত্র শিশুসন্তানকে এমন জায়গায় নির্বাসন দিতে যে কারোরই মন খারাপ হবে। কিন্তু নিজের পছন্দ-অপছন্দের চেয়ে

www.bjilibrary.com

একজন ঈমানদারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহর হুকুম। তাই আর কোনো প্রশ্ন না করে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাহনের পিঠ থেকে নিচে নেমে এলেন। এরপর সন্তানসহ স্ত্রীকেও সাহায্য করলেন বাহন থেকে নামতে। তিনি কাবাঘরের জন্য নির্ধারিত উঁচু টিলার মতো জায়গাটির পাশে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর বানালেন ওদের জন্য। তারপর ওঁদের নিয়ে গেলেন সেই ঘরে। ওদেরকে জনমানবহীন ওই প্রান্তরে একাকী ফেলে রেখে আবার তিনি মিশরে রওনা হয়ে গেলেন। ওঁদের জন্য রেখে গেলেন একটি থলেতে কিছু খেজুর আর একটি মশকে সামান্য পানি।

মা হাজেরা ছিলেন একজন ঈমানদার মহিলা। আল্লাহর হুকুমে শিশুপুত্রসহ তাঁকে নির্বাসনে পাঠানোর কথা শুনে তিনি মোটেই বিচলিত হলেন না। এ নিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে কোনো অনুযোগও করলেন না বরং সন্তুষ্ট মনেই মেনে নিয়েছিলেন এ হুকুম। কিন্তু জনমানবহীন ওই প্রান্তরে নিজের একমাত্র শিশুপুত্রসহ মা হাজেরাকে যখন প্রিয়তম স্বামী একাকী ফেলে রেখে মিশরে রওনা দিলেন, তখন আবেগে উথলে উঠলো তাঁর মন। এ কেমন বিরান প্রান্তর! এখানে নেই কোনো জনমানব। নেই কোনো পাখি বা পতঙ্গ। নেই কোনো প্রাণীর সন্ধান! প্রিয়তম স্বামী শুধু আমাকে নয়, তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রকে ফেলে রেখে রওনা হয়ে গেছেন মিশরের পথে।

মা হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাঈলকে কোলে নিয়ে একাকী বসে রইলেন সেই বিজন প্রান্তরে। সহসা তাঁর অন্তরে আবেগের তুফান উঠলো। এ তুফান বেদনার তুফান। এ তুফান কষ্ট ও হাহাকারের তুফান। এ হাহাকার স্বদেশ হারানোর হাহাকার। এ হাহাকার আপনজন ও আত্মীয় হারানোর হাহাকার। যে মানুষটিকে অবলম্বন করে নারীরা আপনজন ও আত্মীয় হারানোর বেদনা ভুলে যায় প্রিয়তম সেই স্বামী হারানোর শোকার্ত বেদনার হাহাকার। সবচেয়ে বড় কথা, এ হাহাকার মানুষের সমাজ ও সভ্যতা থেকে ছিটকে পড়ার কষ্টের হাহাকার। অপার নিঃসঙ্গতায় ডুবে যাওয়ার হাহাকার।

এক সময় এই বেদনা তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের গমন পথের দিকে। না, এখনো তিনি দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাননি। ওই, ওই তো তাঁকে দেখা যাচ্ছে!

আবেগের তুফান যেন তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে হযরত ইবরাহীমের রেখে যাওয়া পথ ধরে ছুটলেন তিনি। কান্নাজড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, 'হে ইবরাহীম, আপনি আমাদের এ কোথায় রেখে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোনো মানুষজন, না আছে খাদ্য, না আছে পানীয়। আপনি আমাদের এই বিজন প্রান্তরে রেখে কোথায় চলে যাচ্ছেন?' তিনি ছুটতে লাগলেন আর বারবার এ কথা বলে চিৎকার করতে লাগলেন। মরুভূমির বাতাসে এক অসহায় নারীর আর্ত চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হলো এক বিপন্না নারীর ক্রন্দন। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কানেও আঘাত হানলো বিবি হাজেরার এ আর্তনাদ। তাঁর চলার গতি শ্লথ হয়ে গেল। কিন্তু মানবিক আবেগ আল্লাহর হুকুম পালনের পথে অন্তরায় হতে

www.bjilibrary.com

পারে ভেবে তিনি বিবি হাজেরার দিকে ফিরেও তাকালেন না, এমন কি বারবার এ আর্তনাদ শোনার পরও তিনি এর কোনো জবাব দিলেন না।

ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত বিবি হাজেরা। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এমন ব্যবহারে তিনি আরো বেদনাবিধুর হলেন। তাঁর চলার শক্তি রহিত হয়ে গেল। তিনি অতিশয় ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন। তাঁর ক্ষত-বিক্ষত অন্তর থেকে এবার বেরিয়ে এলো নতুন প্রশ্ন। তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এখানেই আমাদের নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন?'

এবার মুখ খুললেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি বেদনামথিত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ।'

মা হাজেরা থমকে দাঁড়ালেন। একজন সাচ্চা ঈমানদারের মতোই বললেন, 'ঠিক আছে। তাহলে আপনি যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না।' এই বলে তিনি ফিরে চললেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালামও আর পেছনের দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন মিশরের দিকে।

এক সময় তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌছুলেন। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন স্ত্রী-পুত্র কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন, 'হে আমাদের রব, তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এমন এক উপত্যকায় আমি আমার সন্তান ও পরিবারকে রেখে যাচ্ছি, যেখানকার ভূমি কৃষির অনুপযোগী। হে রব, তাদেরকে এখানে এই উদ্দেশ্যেই রেখে যাচ্ছি, যেন তারা নামায কায়েম করে। অতএব, তুমি মানুষের মনকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও। প্রচুর ফলফলাদি দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও যাতে তারা তোমার নিয়ামতের শোকর গোজার হতে পারে।' [সূরা ইবরাহীম]

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চলে গেলে আবার আগের জায়গায় ফিরে এলেন মা হাজেরা। শুরু হলো নি:সঙ্গ জীবনের পথ চলা। তিনি ওই থলে থেকে একটি দু'টি খেজুর খান আর পিপাসা পেলে পান করেন মশক থেকে দু'এক ঢোক পানি। তারপর উদাস চোখে তাকিয়ে থাকেন বিবর্ণ প্রান্তরে। ভাবেন, এই পানি ও খেজুর ফুরিয়ে গেলে কি হবে? কি খেয়ে প্রাণ ধারণ করবো? কিভাবে বাঁচাবো এই শিশুসন্তানকে? অন্তহীন এসব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। আছে শুধু প্রশ্ন। আছে শুধুই দুশ্চিন্তা।

দিন কাটে, দিন যায়। একদিন ফুরিয়ে গেল থলের খেজুর। ফুরিয়ে গেল মশকের সামান্য পানিও। ক্ষুধায় কাতর হলেন তিনি। পিপাসায় অধীর হলেন। খাবার ও পানির অভাবে তাঁর বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। খাবার না পেয়ে কেঁদে উঠলেন শিশু ইসমাঈল। পিপাসায় ছটফট করতে লাগলেন। অসহায় মা করুণ চোখে তাকিয়ে দেখেন শিশুপুত্রের কষ্ট। দেখেন তার ছটফটানি। এক ঢোক পানি খেলেই যে বুকে দুধের নহর বইতো সে বুক এখন খা খা মরুভূমি। শিশুপুত্রের কষ্ট দেখে নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেলেন তিনি। পরম মমতায় আবারো পুত্রকে চেপে ধরলেন বুকে। কিন্তু তাতে ইসমাঈলের কান্না কিছুমাত্র কমলো না।

www.bjilibrary.com

পুত্রের এই কষ্ট ও কান্না মা হয়ে তিনি কেমন করে সইবেন? বিচলিত অন্তরে তিনি চারদিকে তাকালেন। কিন্তু কোথাও কোনো খাবার বা পানির সন্ধান নেই। হাহাকার করে উঠলো মায়ের বুক। দীর্ঘ অনাহারে তাঁর শরীর নেতিয়ে এসেছে। বুক ফেটে যাচ্ছে অসহ্য পিপাসায়। তারপরও তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেকে কুঁড়েঘরের ছায়ায় রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন অসহায় মা।

সামনে ধূসর মরুভূমি। পেছনে ক্ষুধাতুর শিশুর করুণ আর্তনাদ। দিশেহারা মায়ের বিভ্রান্ত চোখে অথৈ শূন্যতা। এক আঁজলা পানির জন্য কেঁদে উঠল তাঁর মন। চারদিকে তাকালেন একটু সাহায্যের আশায়। না, কেউ কোথাও নেই। তিনি তাকালেন কাছের সাফা পাহাড়ের দিকে। ভাবলেন, এই পাহাড়ের আড়ালে কি পানির কোনো উৎস থাকতে পারে না? আশায় বুক বেঁধে তিনি ছুটে গেলেন সাফা পাহাড়ের চূড়ায়। চারদিকে দৃষ্টি ফেলে আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখলেন। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই; নেই কোথাও এক ফোঁটা পানি।

তাড়াতাড়ি তিনি নেমে এলেন সাফা পাহাড় থেকে। এবার ছুটলেন অদূরের মারওয়া পাহাড়ের দিকে। মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ব্যাকুল চোখে তাকালেন চারদিকে। কিন্তু সর্বত্র শুধু নিরাশার আঁধার। মা হাজেরার সামনে তখন শুধু নিজের জীবন-মরণের প্রশ্নই নয়, সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিলো দুধের বাচ্চা ইসমাঈলের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। ব্যাকুল ও বেকারার হয়ে পাগলিনীর বেশে তিনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। একবার ছুটে যান সাফা পাহাড়ের চূড়ায়। নিরাশ হয়ে ছুটে নেমে আসেন সমতলে। কিন্তু শিশুপুত্রের করুণ চিৎকার তাঁকে কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেয় না। তিনি অস্থির চিত্তে ছুটে যান মারওয়ার দিকে। এভাবে দু'টি পাহাড়ে তিনি সাতবার ছোটাছুটি করলেন। সপ্তমবার এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে উঠছেন মা হাজেরা। তাঁর পায়ের গতি অত্যন্ত শ্লথ। পা আর ওঠে না। পায়ের নিচের তপ্ত পাথরে পা রাখা যায় না। পাথর তো নয়, যেন গনগনে আগুনের টুকরা! তবু তিনি পা টেনে টেনে পাহাড়ে উঠছেন। এমন সময় একটি আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। চেষ্টা করলেন আওয়াজটা কে কোত্থেকে করলো বুঝতে। এ সময় আবার আওয়াজ এলো। মনে হলো কেউ তাঁকে ডাকছে। তিনি বললেন, 'তোমার আওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছি। তোমার কাছে যদি সাহায্য করার মতো কিছু থাকে তো আমাকে সাহায্য করো।'

তিনি যেখানে তাঁর শিশু সন্তানটিকে রেখে গিয়েছিলেন, আওয়াজটি সেদিক থেকেই এসেছিল। পাহাড় থেকে নেমে তিনি এবার সেদিকেই ছুটলেন। দেখতে পেলেন, একজন ফেরেশতা পায়ের গোড়ালি বা তাঁর ডানা দিয়ে বালিতে আঘাত করছেন। তাতে বালির নিচ থেকে উপচে বেরিয়ে এলো পানির ফোয়ারা। মা হাজেরা ছুটে গেলেন সেখানে। তিনি বালি ও পাথর দিয়ে এর চারপাশে বাঁধ দিলেন। ফলে জায়গাটি কূপের রূপ ধারণ করলো। এটাই সেই জমজম কূপ, যার বিশুদ্ধ পানি আজো সারা দুনিয়ার মানুষ পরম মমতা ও ভক্তিসহকারে পান করে থাকে। এমন হাজী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যিনি হজ্জে গেছেন কিন্তু ফেরার পথে জমজমের পানি নিয়ে বাড়ি ফেরেননি। শুধু বিশুদ্ধ নয়, এ পানি বহু রোগের মহৌষধও বটে!

www.bjilibrary.com

হযরত ইবনে আব্বাস [রা] বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ইসমাঈলের মাকে রহম করুন! তিনি যদি জমজমকে ওইভাবে বাঁধ না দিয়ে ছেড়ে দিতেন তবে সেই পানি প্রবহমান ঝরনা হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিত।'

এ হাদীস থেকেই জানা যায়, তারপর বিবি হাজেরা সেই পানি পান করলেন। তাতে তাঁর বুক দুধে ভরে গেল। তিনি শিশু ইসমাঈলকে সেই দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে শোনালেন আল্লাহর পথের পথিকদের অমোঘ সান্ত্বনার বাণী, 'আপনি ধ্বংসের কোনো ভয় করবেন না। কেননা, এখানেই রয়েছে আল্লাহর ঘর। এ শিশু তাঁর বাপের সাথে মিলে এই ঘরটি পুন:নির্মাণ করবে। আল্লাহ তাঁর পরিজনকে কখনো ধ্বংস করেন না।'

এরপর এই পানি পান করেই মা হাজেরার দিন যাচ্ছিল। একদিন ইয়েমেনের একদল লোক মক্কার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, মক্কার ওপর কিছু পাখি দল বেঁধে চক্রাকারে ঘুরছে। তাঁদের একজন বললেন, 'নিশ্চয়ই এখানে পানি আছে, নইলে পাখিগুলো এভাবে একই জায়গায় ঘুরতো না।' অন্যজন বললেন, 'কিন্তু এখানে তো কোনো পানি থাকার কথা নয়! আমরা বহু কাল ধরেই এ পথে যাতায়াত করি। আমরা জানি, এখানে কোনো পানি নেই।' অন্যজন বললেন, 'আপনার কথাও ঠিক, উনার কথাও ঠিক। এখানে কোনো পানি নেই এটাই আমরা জানতাম। কিন্তু আজকে পাখিগুলো স্পষ্ট করেই বলছে, এখানে পানি আছে।'

তখন সেই কাফেলা সেখানে যাত্রা বিরতি করলো। তারপর সেখান থেকে দু'জন লোককে পাঠালেন মক্কায়। তাঁরা ওখানে গিয়ে পানি দেখে বিস্মিত হলেন এবং ফিরে এসে দলের সবাইকে জানালেন সে কথা। খবর শুনে সবাই সেদিকে রওনা হলেন।

বিবি হাজেরা তখন পানির কাছে বসা। ইয়েমেনের দলটি তাঁর কাছে গিয়ে বললো, 'আমরা যদি আপনার কাছে বসত করতে চাই তাহলে কি আপনি অনুমতি দেবেন?' তিনি দলটিকে ভালো করে দেখলেন। বললেন, 'অনুমতি দিতে পারি, তবে এ পানির উৎস নিজেদের দখলে রাখার অনুমতি তোমরা পাবে না।'

হযরত ইবনে আব্বাস [রা] বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মায়ের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। তিনিও মনে মনে চাচ্ছিলেন, এখানে মানুষের বসতি গড়ে উঠুক। ইয়েমেনের দলটি আসায় তাঁর সে আশা পূর্ণ হলো।'

ইয়েমেনের দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করলো। তারপর তাঁরা এ খবর পাঠালেন নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে। তারাও এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করলো। এভাবেই গড়ে উঠলো মক্কায় জনবসতি।

দিন গড়িয়ে চললো। বংশ বিস্তারের মধ্য দিয়ে বাড়তে লাগলো জনবসতির আকার। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সবার আদর, স্নেহ আর মমতায় বড় হতে লাগলেন। ওদের কাছ থেকে শিখলেন আরবী ভাষা। শৈশবের চপলতা মাড়িয়ে তিনি কৈশোরে পা রাখলেন। কি অমায়িক কিশোর! কী অমায়িক তাঁর আচার ব্যবহার! কী সুন্দর চেহারা

www.bjilibrary.com

সুরত! ইসমাঈলের দিকে তাকালে মানুষের হৃদয় প্রফুল্লতায় ভরে যায়। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সবাই তাঁকে ভালোবাসে। সবারই তিনি প্রিয়পাত্র। এ সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা আজো বিশ্বের ইতিহাসে বিস্ময় হয়ে আছে!

দিন যায়, দিন আসে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করে খাঁটি সোনা বানান। কখনো ভয় দিয়ে পরীক্ষা করেন। কখনো পরীক্ষা করেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দিয়ে। কখনো পরীক্ষা করেন লোভ দিয়ে, কখনো বা বিপদ-মুসিবত দিয়ে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওপর স্ত্রী-পুত্র নির্বাসনে পাঠানোর হুকুম ছিল তেমনি এক পরীক্ষা। এর আগেও তিনি নবী ইবরাহীমের পরীক্ষা নিয়েছেন। লেলিহান আগুনের শিখায় ঝাঁপ দিয়ে তিনি প্রমাণিত করেছেন, প্রকৃত মুমিন কখনো কোনো পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় না, বরং আগুনকে হুকুম করে আল্লাহকেই বলতে হয়, 'হে আগুন, আমার খলীলের জন্য শীতল হয়ে যাও।' লেলিহান শিখা তখন ঈমানদারের জন্য পুষ্পের উদ্যান হয়ে যায়। ইবরাহীম নবী, তাঁর তো পরীক্ষায় ফেল করার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং হাসিমুখে তিনি বরণ করে নেন সব বিপদ-মুসিবত। আল্লাহর হুকুমের একচুল নড়চড় করেন না। তারপরও মানুষ তো তিনি! নয়নের মণি একমাত্র শিশুপুত্র ইসমাঈল ও পতিব্রতা স্ত্রীকে নির্বাসনে দিয়ে মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে দিন কাটান নবী ইবরাহীম।

প্রতিদিনই তাঁর মনে পড়ে শিশুপুত্রের কথা। মনে পড়ে পতিব্রতা স্ত্রীর কথা। কিন্তু তাঁদের সাথে দেখা সাক্ষাতের কোনো হুকুম বা ইশারা আল্লাহর কাছ থেকে পান না তিনি। তাই তাঁদের কখনো দেখতেও যান না। অনেক দিন পরের কথা। ইসমাঈল তখন টগবগে কিশোর। এক রাতে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রিয় জিনিস কুরবানী দিতে বলেছেন আর তিনি সেই হুকুম পেয়ে তাঁর কলিজার টুকরা সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী দিচ্ছেন।

নবীদের স্বপ্নও এক রকম অহী। বুঝলেন, আবারও আল্লাহ তাঁর পরীক্ষা নিতে চান। তিনি এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মক্কা রওনা হলেন। অনেক পথ মাড়িয়ে অবশেষে তিনি মক্কা পৌঁছুলেন। বহুদিন পর পিতা-পুত্র মিলন ঘটলো। ছেলের চেহারা দেখে পিতার চোখ জুড়িয়ে গেল। পিতার স্নেহ কী জিনিস এই প্রথম অনুভব করার সুযোগ পেলেন ছেলে। পিতার মনে পড়ে গেল, একদিন এই ছেলের জন্যই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে একটি সন্তান দান করুন।' পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এর জবাবে বলেন, *'সুতরাং তাঁকে আমি এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।'*

একদিন পিতা তাঁকে নির্জনে নিয়ে গেলেন। আল্লাহর হুকুমের কথা জানালেন ছেলেকে। বললেন, 'হে আমার প্রিয় সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি?'

পুণ্যবান ছেলে জবাব দিলো, 'আব্বা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'

কী বিস্ময়কর ঘটনা! আল্লাহর হুকুমে পিতা পুত্রকে নিজ হাতে যবাই করতে উদ্যত

www.bjilibrary.com

হয়েছেন। পুত্রও সানন্দে ছুরির নিচে গলা পেতে দিতে রাজি হয়ে গেছেন। পুত্রের মুখ দেখে বাপের হাত যেন স্নেহ-মমতায় কেঁপে না ওঠে সেজন্য পুত্রকে তিনি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। ছেলে বললো, 'আব্বা, আপনি আমাকে শক্ত করে বেঁধে নিন যাতে আমি ছটফট করতে না পারি। আর আপনার পরনের কাপড় সামলে নিন যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। আপনার কাপড়ে আমার রক্তের ছিটা লাগলে আমার সওয়াব কমে যেতে পারে। তাছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা বেশি পেরেশান হবেন। আর আব্বা, আপনার ছুরিটা ভালো করে ধার দিয়ে নিন যাতে তাড়াতাড়ি আমার গলা কাটতে পারেন এবং আমার প্রাণবায়ু দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার।' ইসমাঈল আরো বললেন, 'আর আমার মায়ের কাছে আমার সালাম বলবেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য আমার জামা-কাপড় নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যাবেন।'

ছেলের মুখে এমন কথা শুনে বাপের মনে কেমন তোলপাড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য পিতা-পুত্র উভয়েই প্রস্তুত। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। তারপর অশ্রুমাখা চোখে ছেলেকে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। পিতা ইবরাহীম হাতের ছুরি ছেলের গলায় চালানোর জন্য ওপরে তুললেন, এমন সময় আল্লাহ আওয়াজ দিয়ে বললেন, 'হে ইবরাহীম, তুমি তোমার স্বপ্ন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছো। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো। এখন আর ইসমাঈলকে যবেহ করার প্রয়োজন নেই।' তারপর জিবরীল ফেরেশতা একটি দুম্বা বা ভেড়া নিয়ে সেখানে হাজির হলেন এবং আল্লাহর হুকুমে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈলের পরিবর্তে তা কুরবানী করলেন। সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আজো দুনিয়ার মুসলমানরা পশু কুরবানীর মাধ্যমে নতুন করে আল্লাহপ্রেমের শপথ নেয় এবং ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর করে তোলে নিজেদের জীবন। আল্লাহর হুকুম পালনের এমন অপূর্ব নিষ্ঠাই তো একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় পরিচয়!

এ ঘটনার পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আবার মিশরে ফিরে যান। এরপর গত হয়ে যায় বহুদিন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন। মা হাজেরা ইতোমধ্যে বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। একদিন তিনি ইয়েমেনী এক কন্যার সাথে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিয়ের অল্পদিন পরেই মারা গেলেন তিনি।

অনেকদিন হয়ে গেল নির্বাসিত স্ত্রী-পুত্রকে দেখার আর কোনো হুকুম পাননি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তাই নিজে থেকেও কোনো উদ্যোগ নেননি। ইসমাঈলের বিয়ের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়ে তিনি আবার রওনা হলেন মক্কা। ওখানে পৌঁছে জানতে পারেন ইতোমধ্যে বিবি হাজেরা ইন্তিকাল করেছেন। ছেলের সাথে দেখা করার জন্য গেলেন ছেলের কুটিরে। কিন্তু ছেলে তখন ঘরে ছিলেন না, তাই তাঁর সাথে ছেলের দেখা হলো না। তিনি পুত্রবধূর কাছে নিজের পরিচয় গোপন করে জানতে চাইলেন, 'ইসমাঈল কোথায়?' পুত্রবধূ জানালো, 'তিনি রোজগারের উদ্দেশে বাইরে গেছেন।' এবার তিনি পুত্রবধূর কাছ থেকে তাদের সংসারের খবরাদি নিলেন। জানতে চাইলেন,

www.bjilibrary.com

'তোমাদের দিনকাল কেমন চলছে?' পুত্রবধূ জানালো, 'তাদের খুব দুর্দিন চলছে। সংসারে ভীষণ টানাটানি। খুবই কষ্টে দিন যাচ্ছে তাদের।' ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেন, 'তোমার স্বামী এলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠ পাল্টে ফেলে।'

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ঘরে ফিরে এলেন। কেন যেন তাঁর মনে হলো পিতা এসেছিলেন। বললেন, 'তোমার কাছে কি কেউ এসেছিল'? স্ত্রী বলল, 'হ্যাঁ, একজন বুড়ো লোক এসেছিলেন।' স্ত্রী বুড়ো লোকটির আকৃতির বর্ণনা দিয়ে বলল, 'তিনি আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর বলেছি। তিনি আমাকে আমাদের সংসারের খবর জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলেছি, আমরা খুব দু:খ-কষ্ট ও অভাবে আছি।' ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জানতে চাইলেন, 'তিনি কি তোমাকে কোনো অসিয়ত করে গেছেন'? জবাবে স্ত্রী বলল, 'হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং বলি, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলে ফেলেন।'

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, 'উনিই আমার আব্বা। ওই কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে তালাক দিয়ে দিই। সুতরাং তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও।' এই বলে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাকে তালাক দিয়ে দিলেন।

এরপর তিনি ওই বংশেরই আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। অনেকদিন পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আবার আল্লাহর হুকুমে তাদের দেখতে এলেন। এবারও ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে তিনি বাড়িতে পেলেন না। আগের মতোই এই স্ত্রীর কাছেও তিনি ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী জানালেন, 'রুটিরুজির কাজে তিনি বাইরে আছেন।'

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেমন আছো?' পুত্রবধূ খুশী ভরা কণ্ঠে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি, সুখে আছি।' ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার কাছে জানতে চাইলেন, 'তোমাদের প্রধান খাবার কি'? পুত্রবধূ বললেন, 'গোশত।' তিনি বললেন, 'তোমাদের পানীয় কি?' জবাবে স্ত্রী বললেন, 'পানি।' এ কথা শুনে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, তাদের গোশত ও পানিতে তুমি বরকত দান করো।' ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আলাপ শেষে পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমার স্বামী ঘরে ফিরে এলে তাকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখে। বলবে, এটা আমার হুকুম।'

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বাড়ি ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী তাকে জানালেন, 'একজন সুন্দর চেহারার বুড়ো মানুষ আজ বাড়িতে এসেছিলেন।' স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করে বললেন, 'তিনি আপনার সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে আপনার কুশল জানিয়েছি। এরপর তিনি আমাদের সংসার কেমন চলছে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি, আমরা বেশ সুখ-শান্তিতে আছি।'

www.bjilibrary.com

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জানতে চাইলেন, 'তিনি কি তোমার কাছে আমার জন্য কোন হুকুম রেখে গেছেন?' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন।' ইসমাঈল আলাইহিস সালাম খুশী হলেন। বললেন, 'উনি ছিলেন আমার পিতা আর তুমি হলে আমার ঘরের চৌকাঠ। তিনি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।'

এ ঘটনার কিছুদিন পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আবারও আল্লাহর হুকুমে মক্কা এলেন। এসে দেখেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম জমজমের পাশে একটি গাছের নিচে বসে নিজের তীর মেরামত করছেন। পিতাকে দেখেই ইসমাঈল আলাইহিস সালাম উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত পিতার দিকে এগিয়ে গেলেন। বহুদিন পর পিতা-পুত্রের আবার দেখা হলো। আবেগে তাঁরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছেলেকে বললেন, 'হে ইসমাঈল, আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন।' 'ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সানন্দে বললেন, 'আপনার রব আপনাকে যা আদেশ করেছেন, আপনি তা করে ফেলুন।' ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, 'কিন্তু তাতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?' 'অবশ্যই করবো', বললেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, 'কি সাহায্য দরকার আপনার?' ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে এখানে, এর চারপাশ ঘেরাও করে একটি ঘর তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

এরপর পিতা-পুত্র মিলে কাবাঘরের দেয়াল ওঠাতে শুরু করলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পাথর এগিয়ে দিতেন আর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম গাঁথুনি দিতেন। যখন দেয়াল বেশ উঁচু হয়ে গেল তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম 'মাকামে ইবরাহীম' নামক বিখ্যাত পাথরটি পিতাকে দিলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ইমারত তৈরি করতে লাগলেন। তাঁরা উভয়ে কাজ করছিলেন আর আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের কাছ থেকে এসব গ্রহণ ও কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি বেশি শোনেন ও জানেন।' এভাবে ক্রমাগত তাঁরা কাজ করে চললেন আর দোয়া পড়তে লাগলেন, *'হে আমাদের প্রভু, আমাদের এই পরিশ্রমটুকু কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি বেশি শোনেন ও জানেন।'* এভাবেই মক্কায় গড়ে উঠলো কাবাশরীফ নামক সেই পবিত্র ঘর।

কাবাঘর নির্মাণের এ কাহিনী দুনিয়া জোড়া আজ মশহুর। আল্লাহ প্রথম মানবীকে দুনিয়ায় পাঠানোর পর এই মক্কা বা এর আশেপাশে তাঁদের প্রথম পুনর্মিলন ঘটিয়েছিলেন। ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ অনেক গবেষণার পর বলেছেন, এ কাবা ও মক্কা শহরটি আল্লাহর আরশের সরাসরি নিচে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করে স্থির করেছেন, এ মক্কাই হচ্ছে দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল।

আল্লাহ যুগে যুগে বহু দেশে বহু নবী পাঠিয়েছেন। তাঁদের দেখানো পথে চলে ধন্য করেছে মানুষ তাদের জীবন। পৃথিবীর পথ পরিক্রমায় মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নতি করতে করতে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলো, যখন বিভিন্ন দেশে আর আলাদা করে

www.bjilibrary.com

নবী পাঠানোর দরকার নেই। তাই আল্লাহ তাঁর শেষ নবী প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁকে পাঠালেন সেই মহিমান্বিত মক্কা নগরীতে যেখান থেকে মানব সভ্যতা যাত্রা শুরু করেছিল, যেখানে আজো রয়েছে সেই পবিত্র আবে জমজম, যেখানে আজো রয়েছে সেই মহিমান্বিত কাবাশরীফ, যাকে বলা হয় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল, যার ওপরে রয়েছে সরাসরি আল্লাহর আরশ, সেই কাবা ও মক্কার মর্যাদার কোনো তুলনা হয় না।

এখানেই সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এলেন দুনিয়ায়। এলেন মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে পিতা আবদুল্লাহর ঔরসে মা আমিনার কোল আলো করে। এই নবীর নাম মুহাম্মাদ [সা]। আবার তাঁকে আহমদ নামেও ডাকা হয়। মুহাম্মাদ বা আহমদ উভয় শব্দের অর্থই প্রশংসিত। তাই তাঁর নাম শুনলেই পড়তে হয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি নবীদের নেতা। তিনি খাতামুন নাবিয়িন বা শেষ নবী। তিনি মানবতার বন্ধু। আল্লাহর ভাষায় তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' মানে সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য তিনি রহমতস্বরূপ। তাঁকে না বানালে আল্লাহ এ বিশ্বের কিছুই বানাতেন না। তিনি কেবল মানুষ ও মানবতার বন্ধুই নন, তিনি আল্লাহরও বন্ধু। কোরআনে তাঁকে আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব বলা হয়েছে। এই হাবীব শব্দের অর্থ হলো বন্ধু। আল্লাহর এই বন্ধু আল্লাহর কাছ থেকে মানুষের জন্য নিয়ে এসেছেন শ্রেষ্ঠতম উপহার। এ উপহারের নাম ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে মানুষের জীবন চলার সবচেয়ে সুন্দর সঠিক বিধান। কুরআনের ভাষায় সিরাতুল মুস্তাকীম মানে সবচেয়ে সহজ সরল জীবন চলার পথ। যারা এ পথে চলে তাদের জীবনে নেমে আসে শান্তি। অনন্ত ও অপার শান্তি। এ পথে চললে মানুষের দুনিয়ার জীবন হয় শান্তিময়। শান্তিময় হয় তাদের আখেরাতের জীবন। তাই তো বলা হয়, ইসলাম মানেই শান্তি! এই শান্তির বারতা নিয়ে পৃথিবীর মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের পথ দেখানোর জন্য নবী এলেন আরবে। এলেন নবী মরু-মক্কায়।■

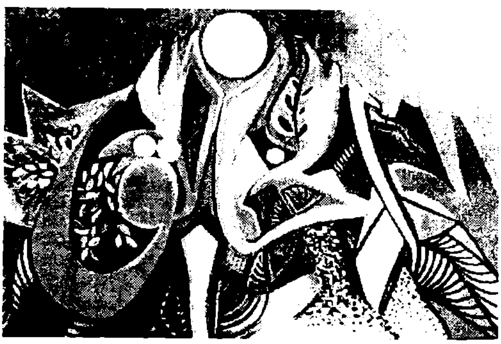

www.bjilibrary.com

ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রোলিভার এন্ড জেনারেল হসপিটাল

24 HOurs

গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ও লিভার ইমার্জেন্সী সার্ভিস

(সার্বক্ষণিক পরিপাকতন্ত্র ও যকৃতের জরুরী চিকিৎসা সেবা)

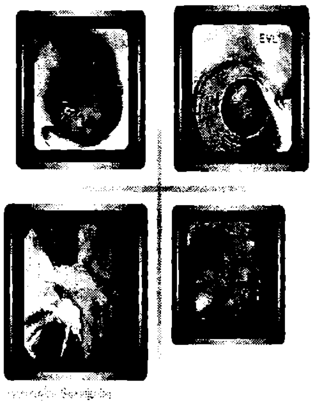

- পরিপাকতন্ত্রের যে কোন ধরণের রক্তক্ষরণ
  রক্তবমি, কালো পায়খানা বা
  পায়ুপথে রক্তক্ষরণ
- হঠাৎ লিভার নষ্ট হয়ে যাওয়া
- অগ্ন্যাশয়ের তীব্র প্রদাহ
- অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন
- খাদ্যনালীর অবস্ট্রাকশন
- খাদ্যনালী ছিদ্র হয়ে যাওয়া
- অ্যাপেন্ডিক্সের তীব্র প্রদাহ

ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রোলিভার এন্ড জেনারেল হসপিটাল

২৫/আই গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
(ধানমন্ডি ৭ নং রোডের পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে)
ফোন: ৮৬২১৬১২, ৮৬১১৯০৬
মোবাইল : ০১৭১৩-০৩৩০২৬

www.bjilibrary.com

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নবী মুহাম্মাদ [সা]

নাসির হেলাল

"আবহমানকাল থেকেই নারী অবহেলিত, নির্যাতিতা, উপেক্ষিতা ও বঞ্চিতা। বর্তমান যুগের তথাকথিত নারীমুক্তির প্রবক্তাদের সংগ্রাম সত্ত্বেও সে করুণ দুর্দশার তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে নারীকে সঠিক বা সুষ্ঠু কোন মর্যাদা প্রদান করা হয়নি এমন কি ইসলামের আবির্ভাবের পরেও অমুসলিম দেশসমূহে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করার জন্য নারী জাতিকে সহ্য করতে হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দু:সহ লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও অবমাননা। আজ 'Women's Liberation' বা নারীমুক্তির প্রবক্তা হিসেবে আমরা কেট মিলে [Kate Millet], জার্মেন গ্রীয়ার [Germaine Greer] বা অ্যান নূরাকীনের [Anne Nurakin] নাম উচ্চারণ করি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি মেরী উলস্টন, অ্যানী বেসান্ত (Annie Besant), প্যাঙ্গহার্স্ট, মারগারেট স্যাঙ্গার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহীয়সী মহিলাদের বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দান করেন, সত্যিকার

www.bjilibrary.com

অর্থে নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির যিনি প্রবক্তা, তিনি হচ্ছেন একজন পুরুষ– সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান, আহমদ মুজ্‌তবা মুহাম্মাদ মোস্তফা [সা]। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি প্রথম মহাপুরুষ যিনি নারী জাতিকে বস্তুতপক্ষে প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছেন।" [ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪২৪ হিজরী, ইফাবা, পৃ. ৩৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষার জন্য, সৃষ্টি জগতকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্ট মখলুকাতকে তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, "আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। [সূরা যারিয়াত : ৪৯] এ বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন, "পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ ও ওরা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককেই সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।" [সূরা ইয়াসীন : ৩৬]

নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে সুখী-সমৃদ্ধ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। পৃথিবীতে যা কিছু ভাল, কল্যাণকর তা এই নারী-পুরুষের চেষ্টার ফসল। যে কারণে নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।" [সূরা আন নিসা : ১]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে; পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।" [সূরা হুজরাত : ১৩]

প্রাচীনকালে নারী জাতির অবস্থান

প্রাচীনকাল থেকেই নারী জাতি অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, শারীরিকভাবে শক্তিশালী পুরুষ জাতি নানাভাবে নারী জাতিকে নিগৃহীত করেছে। সে সময় নারীকে বলা হত 'বিষাক্ত বোলতা' [A Poisonous warp], 'শয়তানের অঙ্গ' [She is the organ of the devil] 'দংশনের নিমিত্ত সদা-প্রস্তুত বৃশ্চিক' [A scorpion ever ready to sting]। বিশ্ববরেণ্য ধর্মযাজক সেন্ট পল, সেন্ট অ্যান্টনী, সেন্ট বার্নার্ড প্রমুখেরা নারী জাতির ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। তাদের মতে "নারী যখন আদি পাপের উৎস মানুষের জন্মগত পাপের কারণ, তখন সকল ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা ও ঘৃণা নারীরই প্রাপ্য।" টারটুলিয়ান [Turtulian] নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরা কি জান না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই একজন Eve [মা-হাওয়া]? তোমাদের নারী জাতির ওপর ঈশ্বরের দণ্ডাদেশ আজও বলবৎ রয়েছে, সেই

www.bjilibrary.com

পাপপ্রবণতাও নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তোমরা নরকের দ্বারস্বরূপ ও নিষিদ্ধ বৃক্ষ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ অমান্যকারিণী এবং ঐশ্বরিক বিধানের লঙ্ঘনকারিণী।"

"গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস পড়লে জানা যায়, সেখানে নারীদেরকে বেচাকেনার সামগ্রী মনে করা হত। ইয়াহুদী, ইউরোপ ও রোমান সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তাদের সমাজে মেয়েদের দাসী বা সেবিকা ছাড়া কিছুই ভাবা হত না। গ্রীক সভ্যতা যদিও বিশ্বনন্দিত, তথাপি সে সভ্যতার পেছনেও লুকানো ছিল অন্ধকার দিক। তৎকালীন গ্রীক সমাজে নারীদের 'পান্ডেয়া' বলে অবহেলার চোখে দেখা হত। 'পান্ডেয়া' বলতে তারা দু:খ-কষ্টের কাল্পনিক দৈত্য বলে ধরে নিত। তাদের পর্দার অন্তরালে রেখে যাবতীয় সাংসারিক কাজ করানো হত। সমাজের কামনা-বাসনার সামগ্রী বলে তাদের ধরে নেয়া হত। রোম সভ্যতা পর্যালোচনা করলে আরো একটা বিচিত্র তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম দিকে সমাজে নারীদের স্বাভাবিক মর্যাদা দেয়া হলেও পরবর্তীতে দেখা যায় যে, আধুনিকতার প্লাবনে ভেসে যাওয়া সমাজ নারীকে তার স্বাধীনতা দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। ফলে নারী হয়ে যায় বেপরোয়া। স্বামীর সংখ্যাধিক্যের মধ্য দিয়ে নিজেদের বয়স যাচাই শুরু হয়, এমন কি প্রতিযোগিতায় তাদের নামিয়ে দিয়ে কৌতুক উপভোগ করে পুরুষ সমাজ। ইউরোপের 'মুক্ত চিন্তা' সর্বজনবিদিত হলেও নারীদের বেলায় তাদের দৃষ্টি ছিল অস্বচ্ছ। নারী জাতি ছিল তাদের সমাজে অস্পৃশ্য ও সব পাপের মূল। তারা নারীকে শয়তানের 'মৃত্যুকল' বলে মনে করত। ফলে নারীদের অভিশপ্ত জন্মই শুধু পুরুষের সেবা করার জন্য বলে ধরে নেয়া হত। তারা সমাজের সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকত।" [সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হিজরী, ইফাবা, পৃ. ১৩৮]

প্রাচীন হিন্দু সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ– ঋষি মনুর মতে "নারীকে দিবা-রাত্রি অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিতা ও লম্পট। তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।"

অন্যদিকে অধ্যাপক ইন্দ্র মনে করেন, "নারীর ন্যায় এত পাপ পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্জলিত অগ্নিস্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এ সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট। নারীদের ভালবাসা পুরুষের উচিত নয়।" [অধ্যাপক ইন্দ্র, স্ট্যাটাস অব ওম্যান ইন মহাভারত, পৃ. ১৬]

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী নারী হল পাপ কর্মের উৎস, তারা অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্রী। হিন্দুরা কন্যার জন্য দুহিতা (গাভী দোহনকারিণী) এবং স্ত্রীর জন্য পত্নী (বাঁদী) শব্দ ব্যবহার করে। তাদের মতে চিতায় আত্মবিসর্জনকারিণী প্রকৃত সতী।

প্রাচীন চীনারা মনে করত "নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মতো নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।" চীনাদের ধর্মগ্রন্থে নারীকে 'দুঃখের প্রস্রবণ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নারীদের ব্যাপারে বৌদ্ধদের কি ধারণা ছিল তা ঐতিহাসিক ওয়েস্টারমার্কের এ মন্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়, "বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের জন্য প্রলোভনের

www.bjilibrary.com

যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।" [ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪২৪ হিজরী, ইফাবা, পৃ. ৪০]

পেছনে দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় সৃষ্টির আদি থেকে না হলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীরা নানাভাবে, নানা কায়দায় নিগৃহীত, নির্যাতিত, ধর্ষিত হয়ে আসছে। মোসাম্মৎ নূরুন্নাহার তার 'নারী মুক্তির অগ্রদূত মোহাম্মদ [সা]' শিরোনামের লেখায় বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন–

* মেয়েদের আদৌ কোন আত্মা আছে কিনা– এই বিষয়ে সন্দিহান ছিল ইউরোপ, এমন কি তারা নারীদের শাস্তি দানের জন্য ইংল্যান্ডে এক পার্লামেন্ট গঠন করে।
* গ্রীস সভ্যতায় সর্বপ্রকার অত্যাচারের পাশাপাশি তারা তাদের দেবতার কাছে অনুশোচনা করতো, একই সূর্যের নীচে পুরুষের সাথে নারীকে কেন দেয়া হলো?
* নারীর চেয়ে দুনিয়ায় আর কোন নিকৃষ্ট বস্তু নেই– এই ছিল খ্যাতনামা সক্রেটিসের বক্তব্য।
* গ্রীকদের মতে, সাপে দংশন করলে বা আগুনে পুড়লে চিকিৎসা সম্ভব– কিন্তু নারীর অনিষ্টের চিকিৎসা সম্ভব নয়।
* তৎকালে ইরানে স্ত্রী ও বোনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।
* ভারতের সতীদাহ প্রথা আজো মানুষকে কাঁপিয়ে তোলে। চীনের অবস্থা দর্শন করে জনৈকা মহিলা বলেছিলেন, নারীর মতো দুর্ভাগ্য ও মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছুই নেই। ছেলেরা দরজায় দাঁড়ায় যেন দেবতা!
* গ্রীস চিন্তাবিদ তে মোস্তিন বলেন, "আমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে বেশ্যালয়ে যাই এবং সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।

রাসূল [সা]-এর জন্মের সময় ও আগে আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। তারা নারীদেরকে ভোগের সামগ্রী মনে করতো। উপরন্তু কোন বংশে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সেই বংশটাকে পর্যন্ত অভিশপ্ত মনে করা হত। যে কারণে অনেক সময় কন্যা সন্তানকে জীবিত পুঁতে ফেলা হত। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জন খুবই স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এছাড়াও উপপত্নী গ্রহণ ছিল মামুলী বিষয়, এমন কি পিতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীদেরকে ছেলেরা উত্তরাধিকারসূত্রে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিত। মোটকথা জাহেলী যুগে মহিলারা ছিল পুরুষের ভোগ লিপ্সার সামগ্রী। সাথে সাথে আরবীয়রা নারীদেরকে শয়তান ও কুচক্রী বলে মনে করতো। একজন কবি লিখেছেন, "নারী– সে তো শয়তান, আমরা তার চক্রান্ত হতে পানাহ চাই।"

রাসূল [সা] নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে অবদান রেখেছেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করা কঠিন। তার মূল্যায়ন করা তো আরও কষ্টসাধ্য ব্যাপার! তবে সমসাময়িক সময়ে এর ফল যে খুব শুভ হয়েছিল তা হযরত উমর [রা]-এর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন, "জাহিলী যুগে মক্কা মুকাররমায় আমরা নারীদেরকে অতি তুচ্ছ মনে করতাম, মদীনায়

www.bjilibrary.com

তাদের মর্যাদা ছিল। কিন্তু ইসলামের অভ্যুদয়ে এবং তাদের সম্পর্কে আল-কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলে তাহাদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সঠিক উপলব্ধি হয়।" [সহীহ আল বুখারী, আন নিকাহ্ পরিচ্ছেদ ৮৩, ৩ : ৪৪৩-৪৪৪]

আধুনিক যুগ বা বর্তমান যুগ : বর্তমানে নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার। তারা পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আর এটা করতে গিয়ে তারা তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিকতায় গা ভাসিয়ে নিজেদেরকে আরও সস্তা পণ্যে পরিণত করে ফেলছে। বর্তমান বিশ্বে নারীদের অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে–

১. ইটালীতে প্রতি তিন ঘণ্টায় ১ জন মেয়ে তার সতীত্ব হারাচ্ছে– যার প্রতিবাদে প্রথম দিনই ২০০০ নারী রাস্তায় নামে।

২. ফ্রান্সে প্রতি রাতে ১০ হাজার নারী ৪০ হাজার পুরুষকে যৌন লালসার সাহচর্য দিয়ে থাকে এবং দিতে বাধ্য হয়।

৩. ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ বছরের কম বয়সে মেয়েদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৬৮০ জন জারজ সন্তানের মা হচ্ছে।

৪. আমেরিকায় ৫ লাখেরও বেশী মেয়ে শুধু বেশ্যা হিসেবে জীবন কাটায়। এরা ১৫/১৬ বছর বয়সে বেশ্যা বাড়ি যায় এবং ৩০/৩৫ বছর বয়সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে জীবন কাটায়।

Review of Reviews [একাদশ খণ্ড]-এ উল্লেখ করা হয় যে, জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইটালীতে প্রতি বছর ৫৬১২ জন নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। 'মিডেল স্টেট' এই ধ্বংসের কারণ উল্লেখ করার জন্য তদন্ত শুরু করে এবং যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে বলা হয়, আমেরিকার নারী সমাজ আধুনিক শিক্ষার নির্মম শিকার হয়ে পড়েছে। এই হলো আধুনিকতার স্বরূপ! আজ পর্যন্ত পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই, ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হয়ে নারী কত নির্মমতার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে! এখানে উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬০ ভাগ স্ত্রী খুন হয় তার স্বামীর হাতে।

উক্ত সমীক্ষায় একথা স্পষ্ট যে, ইসলাম-পূর্ব যুগের জাহিলী সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন যেভাবে নারীকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তার চেয়ে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা। [সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪১৯ হিজরী, জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, পৃ. ১৭৯-৮০]

সপ্তম শতাব্দিতে রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অব দ্য ওয়াইজ-এর এক অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, 'নারীর কোন আত্মা নেই' [Woman has no soul],

কিন্তু ইসলাম উল্লিখিত সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা বাতিল করে দিয়ে নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও মায়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাসূল [সা] বলেন, "বিশ্বে বহু মূল্যবান সম্পদ রয়েছে, কিন্তু

www.bjilibrary.com

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্মপরায়ণা স্ত্রী।" অন্যত্র রাসূল [সা] বলেন, "তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।"

নারীও পুরুষের মতো মানুষ : ইসলাম নারীকে পুরুষের পরিপূরক মনে করে। ইরশাদ হচ্ছে, "এবং নারীদেরও তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের পুরুষদের।" [সূরা বাকারা : ২২৮]

পরকালীন বিচারের সময় আল্লাহ নারী ও পুরুষকে একই দৃষ্টিতে দেখবেন। তাদের কৃতকর্মের ফয়সালা সেদিন করা হবে এবং সে অনুযায়ীই সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ধারিত হবে। আল্লাহ বলেন, "মুমিন পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয় আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" [সূরা নিসা : ১২৪]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, "আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ পুরুষ অথবা নারীর সৎ কর্ম বিফল করি না, তোমরা একে অপরের অংশ।" [সূরা আলে ইমরান : ১৯৫]

নারী যে পুরুষেরই পরিপূরক, শুভাকাঙ্ক্ষী, সহযোগী তা রাসূল [সা]-এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন, "নারী জাতিও পুরুষের ন্যায় সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ। উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে সৃষ্টি করা হয়নি, তেমনি ময়লার ন্যায় সমাজ থেকে ফেলে দেয়ার জন্যও নয়। নারী ও পুরুষ হচ্ছে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঠিক দেহ ও আত্মার মতো। এদের মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ভর করছে সভ্যতার বিকাশ, উৎকর্ষ, অগ্রগতি, সুন্দর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আকাঙ্ক্ষিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য।"

নারী-পুরুষের উৎপত্তিগত উৎস যে এক অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে মূল্যায়নগত কোন পার্থক্য নেই সে কথা মহান রাব্বুল আলামীন স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করেছেন, "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি– অত:পর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি।" [সূরা হুজরাত : ১৩]

জ্ঞান অর্জনের বিষয়েও নারী-পুরুষের মধ্যে ইসলাম কোন পার্থক্য করে না। এ বিষয়ে রাসূল [সা] বলেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম [নারী-পুরুষ]-এর ওপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।" মহিলা সাহাবীগণ রাসূল [সা]-এর বক্তৃতা ও শিক্ষার মজলিসে যোগদান করতেন কিন্তু পুরুষদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাঁদের অসুবিধা হলে তাঁরা তাঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করার আবেদন করেন। তাঁদের এ আবেদন মঞ্জুর হয়। রাসূল [সা] কখনও কখনও পৃথকভাবে মহিলাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতেন। [আল বুখারী, অধ্যায় ৩, পরিচ্ছেদ ৩২, ১খ., ৩৭]।

রাসূল [সা] ও সাহাবীদের যুগে মহিলারা নামায ও ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশে মসজিদে, এমন কি ঈদের জামায়াতে অংশগ্রহণ করতেন। অবশ্য মহিলাদের জন্য জামায়াতের সর্বশেষ কাতারে পৃথকভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ রয়েছে। [মিসকাতুল-মাসাবীহ, ১খ., ৩৪]

মহিলা সাহাবী, এমন কি অনেক অমুসলিম মহিলাও নানা প্রয়োজনে সরাসরি রাসূল [সা]-এর দরবারে হাজির হতেন, তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করতেন,

www.bjilibrary.com

এমন কি স্বামীদের অসদাচরণ সম্পর্কেও অভিযোগ করতেন এবং তিনি এসব অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীদের সতর্ক করতেন। [আবু দাউদ, ২খ., পৃ. ৩৩০]

কোন একদিন মহিলা সাহাবাগণ রাসূল [সা]-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করে বললেন, "আপনি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আমরা নারীরা পুরুষদের মতোই আপনার ওপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আমাদের পর্দা করতে হয়, গৃহের তত্ত্বাবধান এবং শিশুদের লালন-পালন করতে হয়। পক্ষান্তরে পুরুষ জামায়াতে সালাত আদায়, জানাযা ও জিহাদে অংশগ্রহণের কারণে আমাদের অপেক্ষা অধিক পুণ্যের অধিকারী। জবাবে রাসূল [সা] বলেন, মহিলাদের জন্য স্বামীর সেবা-যত্ন করা, তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করা ঐ সকল কাজ-কর্ম থেকে অধিক পুণ্যবহ। [উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৩৯৮-৩৯৯]

সহীহ হাদীস সূত্রেই জানা যায়, রাসূল [সা] অসুস্থ নারীদের দেখ-ভাল করার জন্য যেতেন, খোঁজ-খবর নিতেন, সান্ত্বনা দান করতেন। কখনও কখনও স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ উপহারও দিতেন। উম্মু খালিদকে রাসূল [সা] উপহারস্বরূপ একটি চাদর প্রদান করেন। [ইবন সাদ, আত-তাবাকাত, ৮খ., পৃ. ২৩৪]

কন্যা হিসেবে : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইয়ামে জাহিলয়াতের যুগে নারী জাতির অবস্থা এতটাই খারাপ পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতামাতা তো নিন্দিত হতই, সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বংশ বা গোত্রকেও ধিক্কার কুড়াতে হত যে কারণে জীবিত কন্যা সন্তানকে কবর দেয়া হত। তখনকার ঐ অবস্থা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে লোক সমাজ থেকে নিজেকে লুকোয়। সে ভাবে, হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান, তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট! [সূরা নাহল : ৫৮-৫৯]

এ আয়াতে কন্যা সন্তানের জন্মকে সুসংবাদ বলা হয়েছে। সাথে সাথে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে অসন্তুষ্ট হওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "কোন লোকের যখন কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের সেখানে পাঠান। তারা এসে বলে, পরিবারের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! তারপর তারা বাহু দিয়ে কন্যা সন্তানটিকে জড়িয়ে ধরে এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। তারা বলে, এক অবলা থেকে আর এক অবলা বেরিয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি তার রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হবে সে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য লাভ করবে।"

যে মায়ের গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্ম নেয় সেই মাকে হাদীস শরীফে পুণ্যময়ী বলা হয়েছে, "যে স্ত্রীলোকের গর্ভ থেকে প্রথম কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে পুণ্যময়ী।"

অবশ্য আল্লাহর কাছে পুত্র-কন্যা সমান। ইরশাদ হচ্ছে, "আসমানসমূহ ও পৃথিবীর

www.bjilibrary.com

সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। [সূরা শূরা : ৪৯]

কন্যা বা বোনকে লালন-পালন করা, তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, উপযুক্ত বয়সে সৎ পাত্রে বিয়ে দেয়া অতি পুণ্যের কাজ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল [সা] বলেন : যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগ্নিকে লালন-পালন করে, তাদেরকে সুশিক্ষা দান করে এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে, তারপর বয়:প্রাপ্ত হলে সৎ পাত্রে ন্যস্ত করার মাধ্যমে তাকে স্বাবলম্বী করে দেয় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, দু'টো থাকলে? তিনি বললেন : দু'টোর ক্ষেত্রেও। আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন : একটি থাকলে? তিনি বললেন : একটির ক্ষেত্রেও। [মিশকাত শরীফ]

রাসূল [সা] কন্যার পিতার উদ্দেশে বলেছেন, "কন্যা তার জন্য লজ্জাজনক নয়, বরং কন্যা সন্তান প্রতিপালন তার জন্য জাহান্নামের পথে বাধা এবং জান্নাত লাভের উসিলা হতে পারে।"

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূল [সা] বলেন, "কারো যদি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় আর তাকে যদি সে পুঁতে না ফেলে, তাকে যদি অপমানিত না করে এবং তাকে উপেক্ষা করে যদি পুত্র সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।" [আবূ দাউদ]

রাসূল [সা] ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কন্যাদেরকে ও কন্যার কন্যা অর্থাৎ নাতনীদের খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমাকে তিনি এতই আদর করতেন যে, ফাতিমা [রা] যখনই আগমন করতেন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতেন এবং আনন্দ প্রকাশ করতেন।

রাসূল [সা] বলতেন, "ফাতিমা [রা] আমার কলিজার টুকরা, তাঁর দু:খ দেখলে আমি কষ্ট অনুভব করি।" [মুসলিম, আল-জামিউস্ সাহীহ, ৭খ., পৃ. ১৪১]।

রাসূল [সা] যখন নামাযে সিজদায় যেতেন তখন নাতনী হযরত উমামা [রা] বিনত যয়নাব [রা] তাঁর পিঠে উঠে বসতেন, যখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, তখন তাঁকে কোলে উঠিয়ে নিতেন। [মিশকাতুল মাসাবীহ, ১খ., পৃ. ৩১২]

স্বাধীন মতামত : ইসলামে নারীকে এতটাই মর্যাদা দেয়া হয়েছে যে, সে পুরুষের মতোই তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা রাখে। বিয়ের ক্ষেত্রে তার মতামতই অগ্রগণ্য। পাত্র নির্বাচনের অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে। তার অমতে পিতা-মাতা বা অভিভাবক জোরপূর্বক অপছন্দনীয় পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে পারবে না। যদি নাবালিকা অবস্থায় পিতা-মাতা বিয়ে দেয় এবং সাবালিকা হওয়ার পর সে যদি ঐ পাত্রকে পছন্দ না করে তবে ঐ বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। এ বিষয়ে একটি ঘটনা হলো– হযরত খানসা বিনতে সিয়াম [রা]-এর [আনসারী মহিলা, যিনি সধবা ছিলেন] পিতা তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁকে বিয়ে দিলে উক্ত মহিলা রাসূল [সা]-এর সমীপে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

www.bjilibrary.com

করেন। তখন রাসূল [সা] এই মহিলাকে উপরিউক্ত বিয়ে বাতিল করার অধিকার প্রদান করেন। [মিশকাত, ২খ., পৃ. ১৭০, হাদীস ৩১৩৬]

বহু বিবাহ : প্রাচীনকাল থেকেই বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। দেখা যায় পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। জাহিলিয়াত যুগে পুরুষ যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারতো, সাথে সাথে ব্যাপকহারে উপপত্নী গ্রহণ করার প্রচলন ছিল। তারা ইচ্ছে হলেই বিয়ে করতো, আবার যখন ইচ্ছে তাকে তালাকও দিত। মোটকথা নারীরা হয়ে উঠেছিল পণ্যসামগ্রীর মতো। ইসলামের শরীয়তী বিধান এসে এর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলো। একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হলেও তা কিছু শর্ত আরোপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করা হলো। একইভাবে তালাকের ব্যাপারেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলো। বিয়ের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের ঘোষণা হলো, "তোমাদের পছন্দমত বিবাহ করবে দুই তিন অথবা চার নারীকে। আর যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে।" [সূরা আন নিসা : ৩]

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রয়োজনবোধে একাধিক বিয়ে করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে। তা যদি না পারা যায় অথবা সে বিষয়ে অর্থাৎ সুবিচার করার ক্ষেত্রে আশঙ্কা জাগে তবে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি নেই। একজনকে নিয়েই খুশী থাকতে বলা হয়েছে।

আসলে ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত বিধান হওয়ার কারণেই একাধিক বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেছে। মানবিক ও শারীরিক প্রয়োজনে কোন কোন সময় একাধিক বিয়ের প্রয়োজন হতে পারে, তাই সামর্থ্যানুযায়ী সুবিচার করতে পারবে এমন আস্থা থাকলেই কেবল তা সম্পন্ন হতে পারে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ভাল দিক হলো– এর ফলে সমাজের অনেক অসহায় নারী আইনগত সমর্থন পেয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান। অনেক সময় নানা কারণে, বিশেষ করে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেড়ে যায় তখন একাধিক বিবাহ জরুরি হয়ে পড়ে। বর্তমানে কাশ্মীরে ও ফিলিস্তিনে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে বিয়ে নিয়ন্ত্রণের ফলে বা যে কোন কারণে অবিবাহিতা মেয়ের সংখ্যা সমাজে বেড়ে গেলে অন্যায়, অশ্লীলতা, ব্যভিচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে পড়ে। এজন্য নিয়ন্ত্রিত একাধিক বিবাহ কল্যাণই বয়ে আনে।

পুন:বিবাহ : ইসলামে পুন:বিবাহের অধিকার নারীদেরকে দেয়া হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীদের ওপর পূর্ব স্বামী বা তার আত্মীয়-স্বজনের কোন অধিকার নেই। তারা নির্দ্বিধায় দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে সে স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকার অধিকাংশ দেশগুলোতে নারীদের পুন:বিবাহের অনুমতি নেই। অন্যদিকে হিন্দু নারীদের তো এক্ষেত্রে পুন:বিবাহের অধিকারই দেয়া হয়নি।

স্ত্রী হিসেবে নারী : পুরুষ-নারী মিলেই গড়ে তোলে সংসার। একে অপরে সুখে-দু:খে তারা এগিয়ে আসে। ফলে দাম্পত্য জীবন মধুময় হয়। রাসূল [সা] বলেন, "তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও তাদের তেমনি

www.bjilibrary.com

অধিকার আছে।" [তিরমিযী] তিনি আরও বলেন, "তোমরা যা খাবে, তোমরা যা পরবে, তোমাদের স্ত্রীদেরকেও তা খেতে পরতে দেবে।" [আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজা]

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" [সূরা বাকারা : ১৮৭]।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষের।" [সূরা বাকারা : ২২৮]

রাসূল [সা] তো স্ত্রীকে স্বামীর সংসারের রাণী বা সম্রাজ্ঞী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, "স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী হচ্ছে তার গৃহের সম্রাজ্ঞী।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করুক। তাই তিনি নারী-পুরুষের সৃষ্টির রহস্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, "তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং [আল্লাহ] তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা রূম : ২১]

রাসূল [সা] স্ত্রীর সার্টিফিকেটের ওপর স্বামীর ভাল-মন্দ নির্ভর করে বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম মানুষ তারা যারা নিজ স্ত্রীর দৃষ্টিতে উত্তম বলে গণ্য।" তিনি আরও বলেন, "তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।" [জামে আত তিরমিযী, ইমাম নববী, রিয়াদুস সালেহীন, পৃ. ২৮৩]

ইসলাম নারীকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। অন্তত এ আয়াতে কারিমা থেকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়, "যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।" [সূরা নূর : ৪]

পবিত্র কুরআনে আর একটি বিষয়ে নারীকে উচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। আর তা হলো– কোন স্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি কোন স্বামী ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে কিন্তু কোন সাক্ষী না থাকে তবে ঐ স্ত্রীলোকটির বক্তব্যের ওপরই নির্ভর করে তার ফয়সালা। ইরশাদ হচ্ছে, "যারা স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ব্যতীত কোন সাক্ষী নেই... স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলে তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।" [সূলা নূর : ৬, ৮, ৯]

স্বামীর গৃহে স্ত্রী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। স্ত্রী সেখানে শাসক। ইরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের সবাই এক একজন শাসক [রাঈ] এবং প্রত্যেকেরই তার নিয়ন্ত্রণাধীনদের [রায়ত] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমীর [রাজা] হচ্ছে দেশের শাসক আর পুরুষ হচ্ছে পরিবারের শাসক। নারী হচ্ছে তার স্বামী ও সন্তানদের শাসক। সুতরাং তোমরা

www.bjilibrary.com

প্রত্যেকেই শাসনকর্তা এবং প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে [বিচার দিনে] তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনদের সম্পর্কে।" [বুখারী শরীফ]

দাসীদের সাথে আচরণ : রাসূল [সা] সব সময়ই দাস-দাসী মুক্ত করার জন্য সাহাবাদের [রা] উৎসাহ দিতেন, বিশেষ করে দাসীদের ব্যাপারে যদি কেউ সহৃদয়তার সাথে কাজের নির্দেশ দেয়, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহানুভূতির সাথে দেখে, শাস্তি না দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়, শেষমেষ যদি তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে তবে তাকে দ্বিগুণ পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি। দাসীরা যদি সন্তানের মা হয় তবে সে ঐ পরিবারের একজন বলে গণ্য হবে বলে বিধান দিয়েছেন। সামান্য একজন দাসীকেও এমনিভাবে সামাজিক মর্যাদা দান করেছে ইসলাম। অন্যদিকে গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে দাস-দাসী মুক্ত করার শর্ত পর্যন্ত দেয়া হয়েছে।

রাসূল [সা] নিজে দাসীদের আযাদ করে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন। মুক্ত দাসীরা একজন জন্মগত আযাদ মহিলার মতোই সম-অধিকার ভোগ করত। রাসূল [সা] তাঁর আযাদকৃত দাসী উম্মু আয়মানকে, 'হে আম্মা!' বলে সম্বোধন করতেন এবং তাঁকে দেখলে তিনি তাঁর পরিবারের একজন বলে পরিচয় দিতেন। উম্মু আয়মান-এর কাজে রাসূল [সা] এতটাই খুশী ছিলেন যে, তিনি তাঁর ব্যাপারে বলতেন, "যারা জান্নাতের কোন নারীকে দেখতে চায়, তারা যেন উম্মু আয়মানকে দেখে তিনি [সা] তাঁর সাথে অনেক সময় রহস্য করতেন।" [ইবন সাদ, আত-তাবাকাত, ৮খ., পৃ. ২২৩-২২৪]

রাসূল [সা] বারীরা [রা] নামের এক দাসীকে আযাদ করেন। এ সময় তিনি ঐ দাসীর দাসত্বকালীন বিয়ে রদ করার অধিকার প্রদান করেন। ফলে বারীরা [রা] প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে আলাদা জীবন যাপন শুরু করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁকে প্রকৃতপক্ষেই খুব ভালোবাসত। এক বর্ণনামতে এ ছাড়াছাড়ির পর তাঁর স্বামী মদিনার অলিতে গলিতে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াত। ফলে রাসূল [সা]-এর মনে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়, যে কারণে তিনি বারীরা [রা]-কে তাঁর স্বামীর গৃহে ফিরে যেতে বলেন। এ আদেশ পাওয়ার পর বারীরা [রা] বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আপনার নির্দেশ?" তিনি বললেন, "আমি শুধু সুপারিশ করছি।" এর উত্তরে হযরত বারীরা [রা] বলেন, "পুনরায় তাকে গ্রহণের কোন প্রয়োজন আমার নেই।" [আল-বুখারী, আস-সাহীহ্, ৭খ., পৃ. ৬১]

তালাক : রাসূল [সা] বলেন, "আল্লাহর কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণাই ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হচ্ছে তালাক।"

নানা কারণে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ আসতে পারে। কোন কারণে যদি তা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, কোন অবস্থাতেই আর এক সাথে বসবাস সম্ভব না হয় তখন ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়। অবশ্য খ্রিস্টীয় ইউরোপে ধর্ম ও আইনে কোন অবস্থায়ই বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি ছিল না। হিন্দু ধর্মেও এ অনুমতি নেই। কিন্তু ইসলাম বাস্তবতার নিরিখে তা অনুমোদন করেছে। ইরশাদ হচ্ছে, "তাদের [স্বামী-স্ত্রীর] উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার [স্বামীর] পরিবার হতে

www.bjilibrary.com

একজন এবং তার [স্ত্রীর] পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে, তারা উভয়েই নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।" [সূরা আন নিসা : ৩৫]

এ সূরারই অন্য আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি তাদেরকে [স্ত্রীদেরকে] অপছন্দ করো তবে এমনটা হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছো।" [সূরা নিসা : ১৯]

এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, জাহিলিয়াতের যুগেও তালাক-এর ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তা অনিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছে করলেই অর্থাৎ কারণে অকারণে পুরুষরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিত। ইসলামী আইন প্রবর্তনের পর তা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, এমন কি মুসলমানদের মধ্যে তা বিরল ঘটনায় পরিণত হয়।

মা হিসেবে নারী : ইসলামে মা হিসেবে নারীকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমের ২:৮২, ১৭:২৩-২৪, ২৯:৮ ও ৩১:১৪-১৫ আয়াতে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমরা জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, "হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" [সূরা বনী ইসরাইল : ২৩-২৪]

অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন, "আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দু'বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।" [সূরা লুকমান : ১৪]

একজন সাহাবী রাসূল [সা]-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, কার খিদমত করা আমার কর্তব্য? রাসূল [সা] উত্তরে বললেন, "তোমার মাতার। সাহাবী আবার বললেন, তারপর? রাসূল [সা] বললেন, তোমার মাতার। সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর? রাসূল [সা] বললেন, তোমার মাতার। সাহাবী আবার বললেন, তারপর? রাসূল [সা] বললেন, তোমার পিতার এবং তারপর পর্যায়ক্রমে তোমার আত্মীয়স্বজনের।" [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ]

একজন তরুণ সাহাবী রাসূল [সা]-এর দরবারে এসে জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা আছেন? সাহাবী বললেন, জি, হ্যাঁ। রাসূল [সা] বললেন, যাও, গিয়ে মায়ের খিদমত কর। নিশ্চয় তোমার মায়ের পদতলেই তোমার জান্নাত।" [আহমদ, নাসাঈ, বায়হাকী]

নারীর শিক্ষা : প্রাচীনকালে নারীরা সর্বপ্রকার শিক্ষা অর্জন থেকে বঞ্চিত ছিল, অথচ শিক্ষা

www.bjilibrary.com

মানুষকে সুন্দর, মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন করে গড়ে তোলে যে কারণে আমরা বলে থাকি, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।' এ শিক্ষা থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ মানব জাতির অর্ধাংশ নারীকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রাখা হয়। মানবতার ধর্ম ইসলামের আগমনের ফলে এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে নারী জাতি শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মানবতার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদ [সা] ঘোষণা করলেন, "জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।" ফলে জ্ঞান অর্জনের রুদ্ধদ্বার খুলে গেল।

রাসূল [সা] মহিলাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য মসজিদে আগমনের অনুমতি প্রদান করেন। এছাড়া মহিলা সাহাবীগণের যখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হত, তখন তাঁরা অবাধে রাসূল [সা]-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং তাঁর [সা] কাছ থেকে অথবা তাঁর মহিয়সী স্ত্রীদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমাধান লাভ করতেন। এ সম্পর্কে আনসারী মহিলাগণ অগ্রণী ছিলেন। হযরত আয়েশা [রা] বলেন : মহিলাদের মধ্যে আনসারী মহিলাগণ উত্তম, তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে লজ্জাশীলতা প্রতিবন্ধক হত না। [মুসলিম, আস-সাহীহ্, ১ম খ., পৃ. ১৮০]

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর শিক্ষা সম্পর্কীয় বৈঠকসমূহে মহিলাগণ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে উপস্থিত থাকতেন। হযরত খাওলা বিনতে কায়স [রা] বলেন : জুমুআর দিন হযরত [সা]-এর খুতবা আমি সর্বশেষ কাতারে বসে শুনতাম [আল ইসাবা, ৪খ., পৃ. ২৮৬] এবং যখন তিনি [সা] অনুভব করতেন যে, মহিলাগণ তাঁর ভাষণ বুঝতে পারছে না অথবা তাঁর বাণী সেই পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না, তখন তিনি সেই বক্তব্য পুনরুল্লেখ করতেন। [বুখারী] মহিলাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁদের জন্য তিনি পৃথক দিনও নির্দিষ্ট করে দিলেন, কোন কোন সময় রাসূল [সা] তাঁর পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধিকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করতেন। হযরত উম্মু আতিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূল [সা] যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি আনসারী মহিলাগণকে এক ঘরে একত্র করে আমাদের কাছে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব [রা]-কে উপদেশ দানের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত উমর [রা] দরজায় এসে সালাম করতেন এবং বলতেন, আমি হুযূর [সা]-এর দূত হিসেবে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। নবী করীম [সা] উভয় ঈদে যুবতী ও ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদগাহে উপস্থিত হতে অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু ঋতুবতী মহিলাগণ সালাতে অংশ নিতেন না। মহিলাদের জন্য সালাতুল জুমআ ফরয নয় এবং তাদেরকে জানাযার পেছনে চলতে নিষেধ করা হয়েছে। [আবু দাউদ] রাসূল [সা] পিতা-মাতা ও স্বামীদেরকে এ নির্দেশ দান করেছেন যে, তারা তাদের কন্যা ও স্ত্রীদেরকে ধর্মের নির্দেশাবলী শিক্ষা দেবে। নবী করীম [সা] নারী সমাজকে চিন্তাধারা ও কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হবার জন্য বিভিন্নভাবে প্রেরণা দান করেন এবং নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা দানের ব্যবস্থাকারীকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করেন। [বুখারী] তিনি বলেন, স্ত্রীর দেন মোহর দানের পরিবর্তে স্ত্রীকে আল কুরআনের কতিপয় সূরা শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। [বুখারী, ৩খ., পৃ. ৪২৪]

সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারেও রাসূল [সা]-এর নজর ছিল। তিনি শিফা বিনতে আবদুল্লাহ [রা]-কে বলেন, "তুমি হযরত হাফসা [রা]-কে যেভাবে লেখা শিক্ষা দিয়েছ, একইভাবে

www.bjilibrary.com

তাকে কীট দংশনের যন্ত্রণা নিরাময়ের দু'আও শিক্ষা দাও।" [আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪খ., পৃ.১৫]

রাসূল [সা] শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার ফলে খুব কম সময়ের মধ্যে বহু মহিলা সাহাবী নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী হন।

ফিক্হশাস্ত্রে হযরত আয়েশা [রা]-এর পাণ্ডিত্য এমন পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, তাঁকে মুজতাহিদ সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হত।

"হযরত আসমা বিনত সাকান এমন উত্তম বক্তা ছিলেন যে, একবার হুযূর [সা] স্বয়ং তাঁর বিশুদ্ধ ভাষায় অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতার প্রশংসা করেন। তাফসীরশাস্ত্রে হযরত আসমা বিনত উমায়স-এর খ্যাতি ছিল। চিকিৎসার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা [রা] ব্যতীত রাফীদা আসলামিয়্যা [রা], উম্মু মুতা [রা], উম্মু কাবশা [রা], উম্মু আতিয়্যা [রা], রাবী [রা] বিনত মুআওয়ায-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এক বর্ণনানুসারে রাফীদা [রা]-এর তাঁবুতে অস্ত্রপচারের যন্ত্রাদি থাকত; এই তাঁবু মসজিদে নববীর সন্নিকটে ছিল। বহু মহিলা সাহাবীর ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। সাহাবিয়্যাদের এ দলটি কবিতাকে তাঁদের আবেগ ও মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে আরওয়া বিনত আবদিল মুত্তালিব, তাঁর বোন উমামা, হিন্দ বিনত হারিস, সু'দা, মায়মুনা [রা] প্রমুখ কাব্য রচনায় অধিক খ্যাত ছিলেন। হযরত খানসা বিনত আমর আস-সুলিয়া উচ্চ স্তরের কবি ছিলেন।" [হযরত রাসূলে করীম [সা] জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৪৭২]

কর্মক্ষেত্রে নারী : নারী জন্মগতভাবে শারীরিক গঠনের কারণে পুরুষ থেকে ভিন্ন অর্থাৎ নারী পুরুষের তুলনায় শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে এক দুর্বল বা নরম স্বভাবের যে কারণে ইসলাম নারীকে বাসাবাড়ির দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সন্তান-সন্ততি লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়েছে যে কারণে পুরুষের ওপর সংসারের সকল প্রকার অর্থনৈতিক দায়িত্বভার বর্তিয়েছে। তাই বলে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও কর্মের অধিকার হরণ করা হয়নি। প্রয়োজনবোধে নারী যে কোন সময় শালীনতা বজায় রেখে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, বাজারসদাই যে কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।

"একটি বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর যুগে নারীগণ কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারুকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। মদীনা মুনাওয়ারায়ও কতিপয় আনসারী মহিলার পেশা ছিল কৃষিকার্য।" [আল-বুখারী, আস-সাহীহ্, ৭খ., পৃ. ৪৫]

কতিপয় মহিলা সাহাবী ব্যবসা কার্যেও সম্পৃক্ত ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা [রা]-এর ব্যবসা বিভিন্ন অঞ্চলে যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কায়লা, উম্মু আনসার [রা], হযরত আসমা বিন্ত মাখ্রাবা, খাওলা, মুলায়কা [রা] প্রমুখ আতরের ব্যবসা করতেন। [ইবনে আসাদ, আত-তাবাকাত, ৮ খ, পৃ. ৩০০-৩০১] মহিলা সাহাবীগণ বিভিন্ন শিল্প কর্মেও পারদর্শিণী ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা [রা] সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি চামড়া পাকাকরণের পদ্ধতি জানতেন। [উসদুল গাবা, ৫ খ., পৃ. ৪৪] হযরত যায়নাব [রা] বিভিন্ন হস্তশিল্প কর্মে অভিজ্ঞা ছিলেন। [উসদুল গাবা, ৪ খ., পৃ. ৪৬৫] অপর

www.bjilibrary.com

একজন মহিলা সাহাবী হযরত রায়তা [রা] বিন্‌ত আব্‌দিল্লাহ্‌ও হস্তশিল্পে পারদর্শিণী ছিলেন। [ইব্‌ন সাদ, আত্‌-তাবাকাত, ৮ খ., পৃ. ২৯০]

ইসলাম প্রচারে নারী : ইসলাম প্রচারে নারীর অবদানের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম কবুল করেন তিনি একজন নারী হযরত খাদীজা [রা]। ইসলামের জন্য যিনি প্রথম জীবন দান করেছেন অর্থাৎ শহীদ হয়েছে তিনিও একজন নারী হযরত সুমাইয়া [রা]।

রাসূল [সা]-এর নবুওয়াতী যিন্দেগীর সব থেকে বিস্ময়কর ঘটনা মিরাজ সম্বন্ধে প্রথম যিনি জানতে পেরেছিলেন তিনিও একজন নারী– হযরত উম্মে হানী [রা]। রাসূল [সা] যাঁর কোলে মাথা রেখে ইন্তিকাল করেন তিনি একজন নারী হযরত আয়েশা [রা]। রাসূল পারিবারিক জীবনের একান্ত গোপন ও খুঁটিনাটি বিষয় যিনি উম্মাহকে অবহিত করেছেন তিনি একজন নারী– হযরত আয়েশা [রা]। কুরআনের পাণ্ডুলিপি যাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল তিনি একজন নারী হযরত হাফসা বিন্‌ত ওমর [রা]। এমনি অসংখ্য ঘটনায় অসংখ্য নারীর কথা উল্লেখ করা যায় যাঁরা ইসলামের জন্য নানাভাবে অবদান রেখেছেন।

জিহাদে নারী : যদিও ইসলাম নারীদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র হিসেবে তার নিজ গৃহকেই গুরুত্ব দিয়েছে, তবুও প্রয়োজনে জিহাদের মতো কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে।

"উহুদের যুদ্ধে কাফিররা যখন ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে এবং রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সঙ্গে কেবল কতিপয় জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন, তখন এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে হযরত উম্মু উমায়া বিনত কাব আন-নাজ্জারিয়া [রা] হযরত [সা]-এর নিকট পৌছেন এবং সাহসের সাথে মুকাবিলা করতে থাকেন। শত্রুরা যখনই রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন হযরত উম্মু উমারা [রা] তাদেরকে তীর ও তলোয়ারের সাহায্যে প্রতিরোধ করছিলেন। এভাবে শত্রুপক্ষের আঘাত প্রতিহত করায় চেষ্টার এক পর্যায়ে তিনি নিজেই গুরুতরভাবে আহত হন। নবী করীম [সা] সেই সংকটজনক মুহূর্তে তাঁর এমন সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রশংসা করেন। [ইবন হিশাম, আস-সীরাত, ২ খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭]। খন্দকের যুদ্ধে সাফিয়া [রা] বিনত আবদুল মুত্তালিব পাথরের আঘাতে এক ইহুদীকে হত্যা করে দুর্গে অবস্থানরত মুসলিম মহিলাদের রক্ষা করেন। তিনি বর্শা দিয়ে উহুদ যুদ্ধে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করছিলেন বলেও বর্ণনা রয়েছে।" [ইবন হিশাম, সীরাত, ৩ খণ্ড, পৃ. ২৩৯]

উম্মু সুলায়মা [রা] কে খোলা তলোয়ার নিয়ে শত্রু নিধনের জন্য হুনায়নের যুদ্ধের ময়দানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে।

এছাড়া বহু মহিলা সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের পানি পান করানো, চিকিৎসা সেবা দেয়া ইত্যাদি কাজে নানা সময়ে অংশ নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে উম্মু সালামা [রা], কাইবা [রা] বিনত সাদ, রাবী [রা], আয়েশা [রা], উম্মু সলীত [রা], ফাতিমা [রা], হামনা বিনত জাহ্‌শা [রা], উম্মু জিয়াদ [রা]-এর মত বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী রয়েছেন।

www.bjilibrary.com

পর্দা প্রথা : শালীন, সংযত ও পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য তাকিদ দেয় ইসলাম। আর এজন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই কিছু নিয়ম মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। যেমন মহিলাদের জন্য পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদেরকে, আপনার কন্যাগণকে ও বিশ্বাসিগণের স্ত্রীদের বলে দিন যে, তারা যেন নিজেদের ওপর স্ব স্ব আবরণী সুবিন্যস্ত করে। এটা এজন্য সমীচীন যে, এতে তারা [সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে] পরিচিত হবে এবং অনন্তর তারা অত্যাচারিত হবে না এবং আল্লাহ বড় করুণাময়।" [সূরা আহযাব : ৫৯]

অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে নারীদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, "মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তাছাড়া তাদের আচরণ প্রদর্শন না করে; তাদের স্ত্রীরা বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।" [সূরা নূর : ৩১]

পর্দা শুধু নারীর জন্য প্রযোজ্য নয় পুরুষেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, "বিশ্বাসী পুরুষদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টি নত করুক এবং গুপ্ত স্থানগুলো রক্ষা করুক, এটাই তাদের জন্য উত্তম।" [সূরা নূর : ৩০]

উক্ত আয়াতে কারীমা ৩টি থেকে বোঝা যায়, নারীদের পর্দা চোখের চাহনি ও আবরণে, আর পুরুষের পর্দা চোখের চাহনিতে।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, পর্দার বিধান শুধু ইসলাম প্রবর্তন করেছে এমন নয়। ইসলাম আগমনের আগেও অন্য পন্থায় পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল এবং সেটি ছিল উচ্চবিত্ত ও সম্মানী পরিবারগুলোতে। "অনেক আগেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে শাসক পরিবারের সদস্যরা ও অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদেরকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সব সময়ই পর্দা করত। মহিলা ও পুরুষ সকলেই পর্দা করে নিজেদেরকে জনসাধারণের চোখের আড়ালে রাখত। হযরত ইবরাহীম [আ]-এর আমলেও পর্দা প্রথাকে সমর্থন করা হত। গ্রীক ও রোমক আইনেও এ প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করা হত। পারস্য ও মিসরের প্রাচীন রাজা-বাদশাহরা এ প্রথাকে কঠোরভাবে মেনে চলত। চীন ও কোরিয়াতেও এ প্রথা চালু ছিল। কিছুকাল আগেও ইংল্যান্ডের মহিলারা বর্তমানের চেয়ে অধিকতর অন্তরীণ জীবন যাপন করত। [সীরাত স্মরণিকা ১৪১৬ হিজরী, পৃ. ১২৯]

প্রাচীন হিন্দু সমাজের পর্দানশীন নারীদের ব্যাপারে 'অসূর্যমাশ্যা' শব্দটি ব্যবহার করা হত যার অর্থ সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখেনি এমন অর্থাৎ যিনি পরপুরুষ তো দূরের কথা, সূর্যের মুখও দেখেনি।

অতএব, একথা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, পর্দা প্রথা কোন অন্তরীণ প্রথা নয়, বরং একথা স্পষ্ট যে, পর্দা প্রথা নারীর মর্যাদাকে আরও উচ্চকিত করার জন্যই দেয়া হয়েছে। রাসূল [সা]-এর যুগে ও পরবর্তীকালেও দেখা যায়, পর্দানশীন মহিলারা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, এমন কি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম কখনই

www.bjilibrary.com

নারীদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে চায় না, বরং প্রয়োজনমত শালীনতার মধ্যে থেকে সকল ভাল কাজ করার অনুমতি দিয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার : সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে অর্থনৈতিক অবস্থানটা মজবুত হতে হয়। অন্যান্য সমাজে ও ধর্মে মেয়েদেরকে যেখানে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছে বা স্বীকার করতে চায়নি সেখানে বৈষয়িক অবস্থা কি হতে পারে তা তো বোঝাই যায়। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীর জন্য পিতা, স্বামী, সন্তান ও নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ধার্য করেছে। ইরশাদ হচ্ছে, "পুরুষদের জন্য সেই ধন-সম্পদে অংশ রয়েছে যা বাপ-মা আর আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন, অল্প হোক আর বেশী হোক এবং এই অংশ আল্লাহর নির্ধারিত।" [সূরা আন নিসা : ৭]

এছাড়াও নারীরা স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর পেয়ে থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে, "এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।" [সূরা নিসা : ৪]

এভাবে নারী যদি অঢেল সম্পদ ও অর্থবিত্তের মালিক হয়ও, তবু তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। নারীর অধিকারে আসা সম্পদ-বিত্ত-বৈভবে স্বামী, পিতা বা ভাই কারো অধিকার নেই। ঐ সম্পদ-অর্থবিত্ত একান্তভাবে ঐ নারীর। রাসূল [সা] তাঁর প্রচারিত ইসলামী বিধান দিয়ে নারীকে এ মর্যাদা ও সম্মানের উচ্চাসনে সমাসীন করেছে।

রাসূলুল্লাহ [সা] প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থা নারী জাতিকে সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছিল। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক এ সমাজে নারীরা তাদের সকল অধিকার ভোগ করেছিল, এমন কি খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও নারীরা তাদের অধিকার পূর্ণভাবে ভোগ করেছিল। আজকেও যদি আবার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা হয় তাহলে নারী অধিকার আন্দোলনের প্রচেষ্টা ছাড়াই নারী জাতি তাদের পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা পুনরায় ফিরে পাবে বলে বিশ্বাস করি।■

গ্রন্থপঞ্জী

১. ইবনে ইসহাক- সীরাতে রাসূলুল্লাহ [সা], শহীদ আখন্দ অনূদিত, নবধারা প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, নভেম্বর ২০০৩।

২. ইবনে হিশাম- সীরাতে ইবনে হিশাম, আকরাম ফারুক অনূদিত, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা। দশম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২।

৩. ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতূম, খাদিজা আখতার রেজায়ী অনূদিত, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ৬ষ্ঠ সংস্করণ এপ্রিল ২০০২।

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ- হযরত রাসূলে করীম [সা] জীবন ও শিক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯৭।

৫. সীরাত স্মরণিক ১৪১৬ হিজরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬. সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪১৯ হিজরী, জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ।

৭. ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪২১ হিজরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৮. ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪২৪ হিজরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

www.bjilibrary.com

প্রশংসিত

নাজিব ওয়াদুদ

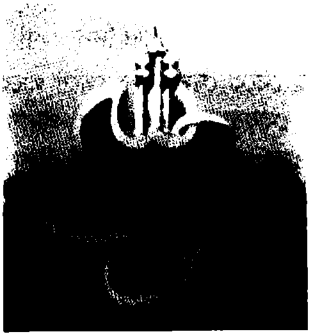

ওরা চলেছিলো উত্তরে– মক্কার একটি ব্যবসায়ী কাফেলা। গরমে, ক্লান্তিতে বেহুঁশপ্রায় অবস্থা। উট আর ঘোড়াগুলোও দুর্বল হয়ে পড়েছে, যেন পা আর চলে না!

যেদিকে চোখ যায় কেবল ধু ধু বালু আর বালু, কখনো উঁচু– এতোটাই উঁচু যে, দেখে মনে হয় টিলা, বালুর পাহাড়, আবার কখনো ঢালু– ঢালু হতে হতে কোথাও কোথাও তা অগভীর পুকুরের মতো, কিন্তু তলায় পানির বদলে শুধুই বালু, খচখচে বালু। আরবের এই মরুভূমির আকাশ ঘোলাটে শাদা, সূর্যটা মাথার ওপর ধিকিধিকি জ্বলছে, তার তাপ এতোটাই তীব্র ও অসহনীয় মনে হয় যেন নিচে মাথার এক হাত ওপরে নেমে এসেছে সেটা! মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে বালুর ঝড় ওঠে। তখন হাঁটু গেড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা গুঁজে দিতে হয় বালুর মধ্যে।

হঠাৎ একটা ছোট-খাট মরূদ্যান ওদের চোখে পড়লো। মরূদ্যান মানে কিছু গাছপালা, তার মানে ছায়া, আর সবচেয়ে বড়ো কথা পানি, হ্যাঁ, পানি। পানির অপর নাম জীবন তা এই মরুভূমির লোকদের চেয়ে কে আর বেশি বোঝে? ওরা ছুটে চললো মরূদ্যানের দিকে।

www.bjilibrary.com

শুধু মরূদ্যান নয় এটা। বেশ কিছু লোকেরও বসবাস এখানে। লোকগুলো ভালো। ওদের বিশ্রাম করতে বাধা দিলো না। পিপাসা মিটিয়ে নিজেরা পানি পান করলো কাফেলার সবাই, ওদের উট আর ঘোড়াগুলোকেও পানি খাইয়ে তাজা করে তুললো। বিদায়ের মুহূর্তে কথায় কথায় ওরা জানতে পারলো সেখানে এক দরবেশ বাস করেন। তিনি হযরত ঈসার ঐশী গ্রন্থ ইঞ্জিলের অনুসারী। হযরত মূসার তাওরাত সম্পর্কেও অনেক জানেন তিনি। এ কথা শুনে কারো কারো কৌতূহল জাগলো। দরবেশরা জ্ঞানের আধার। সৎ পরামর্শ পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে। সুযোগ যখন এসেছে দেখা করা যাক না তার সঙ্গে। যদি কিছু উপদেশ পাওয়া যায় মন্দ কী! সবাই রাজি না হলেও কয়েকজন এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না।

দরবেশ বটে! চেহারায় সংযমের মালিন্য, কিন্তু ওর মধ্য থেকেই ভেসে উঠেছে এক রকম সৌম্য, উজ্জ্বল আভা। প্রত্যয়দীপ্ত চোখ, হাস্যময় মুখ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে এসেছ তোমরা?'

ওদের মধ্য থেকে একজন বললো, 'আমাদের বাড়ি মক্কায়।'

–'আহ! কী সৌভাগ্য তোমাদের!' ওদের সৌভাগ্যে নিজেকেও যেন সৌভাগ্যবান মনে করলেন তিনি, তৃপ্তিতে চোখ বুজলেন।

মক্কার লোকেরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কিছু বুঝতে পারছে না ওরা।

চোখ খুললেন দরবেশ, তাকালেন আগন্তুকদের দিকে। ওদের অজ্ঞতায় তিনি অবাক হলেন না। বললেন, 'আল্লাহ শিগগিরই একজন নবী পাঠাবেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তোমাদেরই মাঝে।'

নবী মানে আল্লাহর মনোনীত মানুষ, আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া তাঁর কাজ। মানুষকে অকল্যাণের পথ থেকে কল্যাণের দিকে, ধ্বংস থেকে উন্নতির দিকে, দোযখ থেকে বেহেশতের দিকে পথ দেখানো তাঁর দায়িত্ব। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বকে খতম করে সকলকে আল্লাহর আইনের অধীনে এনে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি মানুষকে সংগঠিত করেন। এসব কথা তারা জানে, তারা অনেক শুনেছে। দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ওদের কেউ কেউ আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাঁকে আমরা চিনবো কী করে?'

–'তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ। তিনি তোমাদের এক নতুন জীবনের সন্ধান দেবেন। সেই জীবন যাপন করলে দুনিয়াতে মিলবে শান্তি, আখেরাতে পাবে মুক্তি।'

ওরা মক্কায় ফিরে এসে দরবেশের এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা গল্প শোনালো। কেউ তা বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। কবে সে মুহাম্মাদের জন্ম হবে, কার ঘরে, কার গর্ভে, কে জানে! কালক্রমে লোকজন ভুলেই গেলো সে কথা।

দুই.

বেশ কিছু কাল পর। বিষণ্ন মনে বসে আছেন আমিনা। মক্কার কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রের প্রধান আবদুল মুত্তালিবের পুত্রবধূ তিনি। ভাবছিলেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা।

www.bjilibrary.com

বিয়ের মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী মারা যাবেন সে কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন! স্বামী আব্দুল্লাহ শুধু যে তাঁরই প্রিয়জন ছিলেন তা-ই নয়, মক্কার সকলের কাছেই তিনি ছিলেন আদর ও সম্মানের পাত্র। ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন তিনি। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইয়াসরিব [মদীনা] শহরে পৌঁছে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আমিনা ভাবছিলেন, এখন তাঁর গর্ভে প্রিয় শিশু বেড়ে উঠছে। এতিম হয়েই সে জন্ম নেবে এই পৃথিবীর বুকে। এতো বড়ো দু:খ তিনি সইবেন কী করে! এসব সাত-পাঁচ ভাবনার মাঝে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো তার পেটের মধ্যে থেকে যেন এক রাশ আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। ইদানীং অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নও দেখছেন তিনি। কোনটা যে স্বপ্ন আর কোনটা যে বাস্তব তাও যেন গুলিয়ে যাচ্ছে! একদিন যেন তিনি শুনলেন, স্বপ্নের ভেতরে কেউ তাকে বলছে, 'তোমার একটি পুত্র সন্তান হবে। তার নাম হবে মুহাম্মাদ।' এসব অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার তাঁকে অবাক করে, কিন্তু তিনি কাউকে বলেন না।

কিছুদিন আগে হস্তীযুদ্ধ হয়ে গেছে। এ তো যুদ্ধ নয়, আল্লাহর কেরামতি। আল্লাহর ঘর কা'বা ধ্বংস করতে এসেছিলো আফ্রিকার আবিসিনিয়ার বাদশা আবরাহা। সে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেলো। সে এক অদ্ভুত কাহিনী, রূপকথাকেও হার মানায়।

দুর্ধর্ষ বাদশা ছিল আবরাহা। একবার সে ইয়েমেন দখল করে নিলো। সে দেখলো প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে গোটা আরব জাহান থেকে লোকেরা মক্কায় যায়।

–'কী ব্যাপার? চারদিক থেকে এতো সব লোক মক্কায় যায় কেন? কী আছে সেখানে?' বাদশা জানতে চাইলো।

খোঁজ নিয়ে তার সভাসদরা জানালো, মক্কায় একটা ঘর আছে, তার নাম কা'বা। সেটা আল্লাহর ঘর। নবী ইবরাহীম আর তাঁর ছেলে নবী ইস্‌মাঈল এই ঘর তৈরি করেছেন। সেই থেকে গোটা আরব জাহানের লোকেরা পুণ্য লাভের আশায় তীর্থ করতে যায় সেখানে।

এ কথা শুনে আবরাহার খুব রাগ হলো। তার নিজের শহরের তুলনায় মক্কা লোকেদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাবে এ তার সহ্য হলো না। সে সোনা, রূপা, মূল্যবান মার্বেল পাথর দিয়ে একটা উপাসনালয় বানালো। তারপর রাজ্যময় ঘোষণা করে দিলো– এখন থেকে আর মক্কায় নয়, এখানে আসবে তীর্থ করতে।

কিন্তু কেউ শুনলো না তার কথা।

ভীষণ ক্ষেপে গেলো আবরাহা। সভাসদদের ডেকে বললো, 'বোঝা যাচ্ছে কা'বা অটুট থাকা পর্যন্ত আমার এখানে আসবে না কেউ।'

এক বাক্যে ঘাড় নেড়ে সায় যোগালো সভাসদরা, 'ঠিক বটে। কা'বা থাকতে এখানে কেউ আসবে না তা বোঝা গিয়েছে।'

–'তাহলে ধ্বংস করো কা'বা ঘর, গুঁড়িয়ে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও।'

সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো। বিশাল হস্তীবাহিনী নিয়ে আবরাহা রওনা করলো মক্কা অভিমুখে।

www.bjilibrary.com

আবরাহার অভিযানের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলো মক্কার লোকেরা। তারা যোদ্ধা জাতি হলে কী হবে এ রকম বিশাল বাহিনীর সামনে তারা দাঁড়াবে কী করে! তাছাড়া আবরাহার সঙ্গে রয়েছে বিশাল হস্তীবাহিনী। হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হয়েই তারা মারা যাবে। তারা ছুটলো তাদের প্রধান আব্দুল মুত্তালিবের কাছে। হস্তীবাহিনী মক্কার অদূরে পৌছুলে আব্দুল মুত্তালিব গেলেন বাদশার কাছে।

–'কী চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ, দম্ভভরা প্রশ্ন আবরাহার।

আবদুল মুত্তালিবের এক পাল উট মাঠে চরছিলো আবরাহার লোকেরা সেগুলো ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। সে কথা বাদশাকে জানালেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমার উট আমি ফেরত চাই।'

এ কথা শুনে আবরাহা ভীষণ অবাক হলো। সে বললো, 'আমি এসেছি কা'বা ধ্বংস করতে, যাকে তোমরা, তোমাদের পূর্বপুরুষরা পবিত্র মনে করো, তার কথা না বলে তুমি কিনা বলছো কিছু উটের কথা!'

আবদুল মুত্তালিব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'দেখ, এই উটগুলো আমার, আর এই কা'বার মালিক হলেন আল্লাহ, তাঁর ঘর তিনিই রক্ষা করবেন। তুমি আমার উট আমাকে ফেরত দাও।' বাড়ি ফিরে তিনি লোকজনকে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বললেন।

পরদিন সকালে আবরাহা তার বাহিনীকে মক্কা আক্রমণের নির্দেশ দিলো। কিন্তু তার হাতির দল হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, কিছুতেই সামনে এগোয় না। অন্য যে কোনো দিকে তারা ঠিকই যায়, কিন্তু মক্কার দিকে এক পা-ও তোলে না। পিটিয়েও হাতিগুলোকে মক্কার দিকে নেয়া সম্ভব হলো না। তারপর কোত্থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট আবাবিল পাখি ছুটে এলো, তাদের ঠোঁটে পাথরের টুকরা। সেই পাথর তারা ছুঁড়ে মারতে লাগলো আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর। এমনিতেই হাতির আচরণে তারা হত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো, পাখির পাথর-আক্রমণে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। যারা বাঁচলো তারা যেদিকে পারলো পালিয়ে গেলো। এভাবে আল্লাহ কা'বা ঘরকে রক্ষা করলেন।

৫৭০ সালে এই ঘটনা ঘটে। সেই বছরই স্বামীকে হারালেন আমিনা। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মন খারাপ হলেও তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, গর্ভ ধারণ করা সত্ত্বেও তাঁর শরীর যথেষ্ট সবল ও সতেজ, কী এক শক্তি যেন তিনি তাঁর ভেতরে অনুভব করেন, তাতে পুলকিতও হন তিনি। তাঁর এই অনুভবের কথা, অদ্ভুত সব স্বপ্নের কথা তিনি কাউকে বলতে পারেন না।

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার। ইয়াসরিবে [মদীনা] এক ইহুদী ধর্মবেত্তা আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখে অভিভূত হলেন। এর আগে এটিকে কখনো দেখেননি তিনি। নক্ষত্রটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণের পর তিনি নিশ্চিত হলেন, ধর্মগ্রন্থে যে মহামানবের শুভাগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এ তারই ইঙ্গিত। তাওরাত তাদের ধর্মগ্রন্থ। তিনি লোকদের ডেকে নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবীর জন্ম হয়েছে।'

www.bjilibrary.com

ওই একই দিন কা'বা শরীফের পাশ দিয়ে এক ইহুদী ধর্মবেত্তা যাচ্ছিলেন। সেখানে বসে গল্প-গুজব করছিলো কুরাইশ নেতারা। তিনি তাদেরকে বললেন, 'একটু আগে কি কোনো শিশুর জন্ম হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনিই আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবী।'

সারা আরব জুড়ে এরকম অবাক করা সব কাণ্ড ঘটলো সেদিন, যেদিন আমিনা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। আবদুল মুত্তালিবের কাছে খবর গেলো, তাঁর প্রিয় পুত্রবধূর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে এক পুত্রধন। কিছুদিন আগে ইহধাম ত্যাগ করা তাঁর প্রিয়তম পুত্র আবদুল্লাহর বংশধর। তিনি তখন কা'বা ঘরে বসে ছিলেন। পৌত্রের জন্মের খবরে ভীষণ খুশি হলেন তিনি। তৎক্ষণাত ভাবতে লাগলেন কী নাম রাখা যায়! একের পর এক নানান নাম তাঁর সামনে আসে, কিন্তু পছন্দ হয় না। এভাবে ছয়দিন পেরিয়ে গেলো। সপ্তম দিনে, কা'বা ঘরে শুয়ে ছিলেন আবদুল মুত্তালিব, স্বপ্নে দেখলেন, তাঁকে বলা হচ্ছে শিশুটির নাম হলো মুহাম্মাদ। জেগে উঠে ভারি আশ্চর্য হলেন তিনি! যে রকম নাম রাখতে তারা অভ্যস্ত এ নাম তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর অর্থ হলো 'প্রশংসিত', মানে সবাই যার প্রশংসা করে। চমৎকার নাম! পছন্দ হলো তাঁর। এ নাম রাখায় আমিনাও খুব খুশি হলেন। তিনিও যে স্বপ্নে অনেক আগে থেকেই এই নামটাই শুনে আসছেন!

কুরাইশরা ভারি অবাক হলো! এ আবার কী ধরনের নাম! আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'চমৎকার নাম! আমি চাই দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্ আর দুনিয়ার তাবৎ লোকের প্রশংসার পাত্র হোক আমার প্রিয় বংশধর।'

তা-ই হয়েছে, আবদুল মুত্তালিবের এই প্রত্যাশা সর্বাংশে পূরণ হয়েছে। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে, আল্লাহর জীবন বিধান মানুষকে শিক্ষা দিয়ে ও তা প্রতিষ্ঠিত করে, ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির পথ দেখিয়ে তিনি সবার প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন, ফেরেশতারা তাঁর নামে দরুদ পড়ে। দুনিয়ার সকল মুসলমান অহরহ তাঁর নামে দরূদ পাঠ করে, তাঁর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যেসব অমুসলমান তাঁর সম্পর্কে জানে, তারাও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে। সত্যিই তিনি 'প্রশংসিত', যথার্থই তিনি মুহাম্মাদ।■

www.bjilibrary.com

মক্কায় আন্তঃধর্ম সংলাপ : ইসলামী রেনেসাঁর মাইলফলক

সাইফুল্লাহ মানছুর

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ, যাকে আরবীতে রাবেতায়ে আলম আল ইসলামী বলা হয়, এর কার্যক্রম সম্পর্কে আগে থেকে আমার কিছুটা ধারণা ছিলো। শহীদ বাদশাহ ফয়সালের হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রায় অর্ধ শত বছরের এই সংস্থাটি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে যে ব্যাপক অবদান রেখে যাচ্ছে তা অনেকেরই জানা। রাবেতার আন্তঃধর্ম সংলাপের ওপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে সে খবর জানা থাকলেও সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ আসবে তা ভাবিনি। আল্লাহর মেহেরবানীতে সুযোগটা এসে গেল যখন রাবেতা এই সম্মেলনে প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলো। তাদের উদ্দেশ্য সম্মেলনের খবর সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া। দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ প্রিন্ট মিডিয়া থেকে আর আমি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে দাওয়াত পাই। সম্মেলন শুরু হয় ৪ জুন, ২০০৮। আমরা ২ জুন সৌদি এয়ারলাইন্সে যাত্রা করি। একই বিমানে আরো ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা এ কে এম ইউসুফ, রাবেতার বাংলাদেশ প্রতিনিধি মীর কাসেম আলী, চট্টগ্রামের মাওলানা সুলতান যাউফ নদভী ও ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ।

www.bjilibrary.com

জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে রাবেতার স্টাফ সরাসরি আমাদেরকে মক্কায় নিয়ে গেল। কাবা শরীফের লাগোয়া হিলটন হোটেলে উঠলাম। সম্পূর্ণ হোটেলটিই মেহমানদের জন্য ভাড়া করা ছিলো। ফজরের নামায শেষেই ওমরা করে নিলাম। হোটেলে ফিরে দেখি একটি চিঠি রুমে দেয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে সকাল সাড়ে ৯টায় রাবেতার হেড কোয়ার্টারে সাংবাদিক সম্মেলন হবে। রাবেতার হেড কোয়ার্টারে পৌঁছুতেই রাবেতায় কর্মরত বাংলাদেশী ভাই জাকির হোসেন আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

যথাসময়ে শুরু হলো সাংবাদিক সম্মেলন। রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল ড. আব্দুলাহ বিন আবদুল মোহসেন আল তুর্কী সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে জঘন্য অপপ্রচার চলছে তা থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা এবং ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা। সাংবাদিক সম্মেলনের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একটি মিউজিয়ামে যার নাম দেয়া হয়েছে Exhibition of the two Holy Mosques, Architectrue. মক্কা শরীফের এই মিউজিয়ামটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সর্বসাধারণের জন্য এখানে প্রবেশ উন্মুক্ত না হলেও রাজকীয় মেহমানদের মাঝে মাঝে এখানে নেয়ার ঐতিহ্য আছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের এই মিউজিয়ামে প্রবেশের সুযোগ দেয়া ছিলো আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। আমি প্রাণভরে ভিডিও চিত্র ধারণ করলাম প্রাচীন সব নিদর্শনের। সেখানে হাজার বছর পূর্বের মক্কা-মদীনার যে স্মৃতি চিত্র দেখলাম তা এখন পর্যন্ত অন্য কোন মিডিয়ায় দেখার সুযোগ হয়নি। মক্কা-মদীনার ওপর নির্মিত ডকুমেন্টারীর পর ঐ মিউজিয়াম আমাকে আরেকটি ডকুমেন্টারীর তথ্য-উপাত্ত উপহার দিলো। এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। সম্মেলন শুরুর আগের দিন রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল ড. তুর্কীর একটা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নিলাম। তিনি জানালেন রাবেতার পরিকল্পনার কথা। তাছাড়া রাবেতার ডাইরেক্টর জেনারেল অব মিডিয়া এন্ড রিলেশন্স ড. হাসান ইবনে আলী আল আহ্‌দালের সাক্ষাৎকারও নিলাম। তিনিও বললেন, এই সম্মেলন এখানেই শেষ নয়, পরবর্তীতেও এর ধারাবাহিকতা থাকবে। তিনি অনেক আশার বাণী শোনালেন। জানালেন রাবেতা মুসলিম উম্মাহর জন্য আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

৪ জুন সকালেই হোটেল থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো মক্কা শরীফের পাশেই রাজকীয় প্যালেসে। আমরা বসলাম মিডিয়া সেন্টারে। দুপুর ১টায় প্রোগ্রাম শুরুর পূর্বেই মূল হলে পৌঁছুলাম। অল্প সময় পরই হলে প্রবেশ করলেন সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ। হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাঁর পাশে আছেন ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানী। আমরা আর কি খবর পৌঁছাবো তাদের কাছে? তার আগেই এ ম্যাসেজ পৌঁছে গেছে তাদের কাছে যারা মুসলমানদের জন্য ভীত। যারা মুসলমানদের মাঝে বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চায়। মনে হলো যারা এক মুসলামানকে অন্য মুসলমানের রক্ত ঝরানোয় উৎসাহ যোগায় তাদের জন্য দিনটি বড় দুঃখের। বাদশাহ আব্দুল্লাহ সম্মেলনে যখন বললেন, "মুসলমানের শত্রুরা আজ হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর মুকাবেলায় আমাদের যৌক্তিক আলোচনা

www.bjilibrary.com

শুরু করতে হবে", তখন তাঁর বাচনভঙ্গি আর বডিল্যাংগুয়েজ দেখে মনে হলো হারামাইন শরীফের খাদেম হিসেবে তিনি এই কাজটি শুরু করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করছেন। ১৬১টি দেশের প্রতিনিধিদের ডেকে এই বিশাল আয়োজনের মহৎ দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠলো।

ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানী বললেন, "আমি সারা জীবন ইসলামের ওপর পড়াশুনা করেছি। আমি বলতে চাই শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই শিয়া ও সুন্নীরা একমত পোষণ করে। কেন তাহলে আমরা মাত্র ৫ ভাগ নিয়ে শত্রুদেরকে ধ্বংসাত্মক খেলা খেলতে দেবো?" সাথে সাথে পুরো হলে করতালির শব্দে ভরে উঠলো। মনে হলো সম্মেলনের উদ্দেশ্য শুরুতেই সফল হয়ে গেল! ৩ দিনের বিভিন্ন অধিবেশনের ৪টি ওয়ার্কিং সেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সৌদি আরবের শূরা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট সালেহ আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ, ইরানের একাডেমী ফর ইসলামিক স্কুলস অব থট-এর সেক্রেটারী জেনারেল শেখ মোহাম্মদ আলী তাসঘেরী, বসনিয়া-হার্জেগোভিনার হেড অব ওলামা ও মুফতি ড. মোস্তফা ইব্রাহিম সেরিক ও সুদানের মুনাজ্জামাত আল দাওয়া আল ইসলামিয়ার চেয়ারম্যান ফিল্ড মার্শাল (অব.) সিওয়ার আল জাহাব।

এছাড়াও সম্মেলনে যারা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়ার্ল্ড ইসলামিক কাউন্সিল ফর দাওয়া এন্ড রিলিফের সেক্রেটারী জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ বিন ওমর নাসিফ, লেবানিজ পপুলার কনফারেন্সের রিলিজিয়ার্স অ্যাফেয়ার্স বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. আসাদ আল-সামারানি, সৌদি আরবের আল কাছিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ আল জাকী, জর্দানের প্রধান বিচারপতি ড. আহমদ মুহাম্মদ হুলাইল, ইন্ডিয়ান ইসলামিক ফিকাহ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ বদর আল হাসান গাসমি, স্প্রিচুয়াল ইসলামিক সামিট লেবাননের সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ আল সামাক, মিশরের রিলিজিয়ার্স ডায়লগ কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান শেখ কাউজি আল জাফজাফ, ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান সাইন্সের ডাইরেক্টর ড. আহমদ আল হাদি জাবআলাহ, কাতার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মাহমুদ আহমেদ গাজী, তুরস্কের ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক সাইন্স-এর প্রেসিডেন্ট ড. আলী ওযেক প্রমুখ। বিভিন্ন সেশনেই অংশ গ্রহণকারীদের মতামত নেয়া হলো। তারা খোলামেলা কথা বললেন, বিশেষত আরব দুনিয়ার জনপ্রিয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব ড. ইউসুফ আল কারযাভীর বক্তব্য ছিলো খুবই প্রাণবন্ত! এই প্রথম কারযাভীর বক্তব্য সরাসরি শোনার সৌভাগ্য হলো। পুরো বক্তব্যটাই ভিডিওতে ধারণ করলাম। বিরতির পর আরব মিডিয়াগুলো তার সাক্ষাৎকার নিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আমিও সুযোগ মতো সাক্ষাৎকার নিলাম। তাকে জানালাম আমি তার বইয়ের একজন ভক্ত পাঠক। এও বললাম, বাংলা ভাষায় তার বই অনূদিত হয়েছে। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধার আরেকটি কারণ হলো তিনি মাওলানা মওদূদী (রহ)-এর নামাযে জানাযা পড়িয়েছেন। আমার ধারণা ছিলো বার্ধক্য হয়তো তাকে পেয়ে গেছে। কিন্তু তার তেজোদীপ্ত বক্তব্য ও উজ্জীবিত ব্যবহারে সবার মতো আমাকেও মুগ্ধ করলো। সত্তর-উর্ধ্ব ড. তুর্কীকেও দেখলাম একইভাবে উজ্জীবিত। সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে বয়োবৃদ্ধ কারো কারো চোখে

www.bjilibrary.com

তন্দ্রা আসলেও ড. তুর্কীকে একবারও তন্দ্রাচ্ছন্ন বা ক্লান্ত মনে হয়নি। মনে হলো কর্মস্পৃহা আর বড় স্বপ্নই মানুষকে সুস্থ রাখে।

সম্মেলনের ফাঁকে ফাঁকে সময়টা কাজে লাগানোর চেষ্টা করতাম। সবার থাকার জায়গা একই হোটেলে হওয়ায় খাওয়ার সময়গুলোতেও সাক্ষাতের সুযোগ মিলতো। এরই ফাঁকে পাকিস্তানের জামায়াতের আমীর কাজী হোসাইন আহমদের কাছ থেকে জেনে নিলাম সে দেশের খবরাখবর।

আজাদ জম্মু ও কাশ্মীরের আমীর সরদার ইজাজ আফজাল খান। খুররম জাহ মুরাদের এক নিকটাত্মীয়ের মতো আমার চেহারার মিল রয়েছে বলে তিনি জানালেন। আমরা অনেক আপন হয়ে গেলাম! নেপালে মাকাজে জমিয়তে আহলে হাদীসের প্রেসিডেন্ট সে দেশে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে দাওয়াত দিলেন। মরিতাসের রাবেতার ডাইরেক্টর ডা. সিদ্দিক মাওডার বোকাসের সাথে সেখানকার মুসলমানদের নিয়ে কথা হলো। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী বর্তমানে ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসকারী ড. আবদুল মান্নান ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় পূর্বের। ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধি হয়ে তিনি এসেছেন দেখে ভালো লাগল। তিনি জানালেন ফিনল্যান্ডে ইসলাম কিভাবে বিকশিত হচ্ছে। কথা হলো তাইওয়ান থেকে আগত এক ভাইয়ের সাথে। জানালেন মাত্র ১% মুসলমান আছে তাইওয়ানে। সেখানেও তারা ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতি আমার বাড়তি আগ্রহ থাকায় বিভিন্ন দেশের মিডিয়া সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বললাম বেশী। Peace TV থেকে এসেছেন প্রতিষ্ঠানটির রিসার্চ এক্সিকিউটিভ নিসার নাদিয়াওয়ালা। আমাদের মধ্যে নিবিড় সখ্য গড়ে উঠলো। তিনি আমাকে পিচ টিভিতে যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। আমি ডা. জাকির নায়েককে বাংলাদেশে আনা প্রসংগে বলতেই বললেন, "দেখো আমরা ভারতের মতো একটা দেশে থেকে ইসলামের জন্য কাজ করেছি। ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যে জাকির নায়েক বক্তব্য দিলে সমস্যা নেই। কিন্তু বাংলাদেশ-পাকিস্তান– এসব প্রতিবেশী দেশে যাওয়া আমাদের সরকার পছন্দ করবে না। তাই এ মুহূর্তে তাকে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।" বাংলাদেশ থেকে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও ডা. জাকির কেন আসেননি তার যৌক্তিক কারণ বুঝতে পারলাম। তুর্কীর ডেইলী নিউজ পেপারের ফরেন এডিটর হাই রিতিন তুরান বাংলাদেশের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখালেন। জানালেন একবার তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মরহুম মুহাম্মদ ইউনুছের কথা তিনি স্মরণ করলেন।

পাকিস্তানের ডেইলি টাইমসের সাংবাদিক সাজ্জাদ মালিক আর আজ টিভির শওকত পিরাচাহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা জানতে চাইলেন। এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত হাসি দিয়ে বললেন, "পাকিস্তানে যা হয়েছে বাংলাদেশেও তা হচ্ছে। কোন লাভ হয় না। শেষে জনগণের শক্তির কাছে সব মতলববাজদের পতন ঘটে।"

৬ তারিখ সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারীদের মদীনায় নেয়ার কর্মসূচী ছিলো। আমাদের যাত্রার তারিখ হলো ৮ জুন। মাঝে ৭ তারিখ তায়েফ যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। মক্কার

www.bjilibrary.com

আব্দুল জব্বার ভাইকে অনুরোধ করায় তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন। বরাবরের মতো মেহমানদারীতে দক্ষ আব্দুল বাকী ভাই হোটেলে এসে নিয়ে গেলেন। এই প্রথম তায়েফ যাওয়া। সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে কয়েক হাজার ফিট ওপরে তায়েফ। তাই ঠাণ্ডা। তায়েফের ভায়েরা দেখালেন কোথায় রাসূলকে [সা] পাথর মারা হয়েছিলো, কোথায় তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন। দেখালেন হযরত আলীর [রা] হাতে তায়েফ জয়ের স্মৃতিচিহ্ন মসজিদসহ অনেক কিছু। সেখান থেকে গেলাম তায়েফের সর্বোচ্চ এলাকা হিসেবে পরিচিত সাফায়। এখানে মুষলধারে শিলাবৃষ্টি দেখলাম। মক্কা থেকে মাত্র ১০০ কি.মি. দূরে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহাওয়া আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্যকেই প্রকাশ করছে! তায়েফের সব স্মৃতিচিহ্নই ভিডিওতে ধরে রাখলাম। সাথে তায়েফবাসীদেরও সাক্ষাৎকার নিলাম।

৮ তারিখ সৌদি রয়েল গার্ডের বিশেষ বিমানে করে আমাদের মদীনায় নেয়া হলো। আমরা গ্রুপে ছিলাম ৩০ জন। রওজা মুবারকের পাশেই আমাদের বসার ব্যবস্থা হলো। আছর, মাগরিব, এশার নামায সেখানেই আদায় করলাম। আমি রওজা মুবারকে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, দীনি ভাই, দেশ ও মুসলিম উম্মাহসহ সবার জন্যই দোয়া করলাম।

রাতেই জেদ্দা হয়ে মক্কায় ফিরে আসি। পরের দিন ৯ তারিখ জেদ্দা এসে আমার ভগ্নিপতি মামুন আযামীর বাসায় উঠি। মনটা তখন হাহাকার করছে। আমার মেজো বোন উম্মে সালমা মুন্নী ক্যান্সারে মারা যাওয়ায় মনটা ভালো ছিলো না। মক্কা শরীফের চত্বরের যে যে অংশে মুন্নী আপা আমাকে নিয়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলেছিল সেই জায়গায় বসেই তার জন্য দোয়া করলাম। ভগ্নিপতি মামুন আযামীর আমার প্রতি তার টান, বোন হারানোয় আরো বেশী অনুভব করলাম। জেদ্দায় কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ নিলাম। সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থা সবাইকে জানালেন। বললেন দেশের জন্য দোয়া করতে। প্রবাসীরা বাংলাদেশের ব্যাপারে কতটা উদ্বিগ্ন তা সেখানে না গেলে জানতাম না। তারা সেখানে তাদের দুরবস্থার কথা জানালেন। বললেন মিডিয়ায় ভারতীয় লবি অব্যাহতভাবে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। সরকারী উদ্যোগও আশানুরূপ না হওয়ায় বাংলাদেশীদের হয়রানি কমছে না। মাঝে জেদ্দা রেডিওর বাংলা বিভাগ আমার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করল। সেখানেও দেশের অবস্থা, রাবেতার সম্মেলন ও বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রসঙ্গটি তুলে ধরলাম।

দেখতে দেখতে ১২টি দিন চলে গেলো। একটা আবেগ নিয়ে দেশে ফিরলাম, বিশেষত রাবেতার সম্মেলন এক বড় দায়িত্বানুভূতির কথা মনে করিয়ে দিলো। মনে হলো পবিত্র কাবা শরীফের পাশ থেকে এক ধরনের শপথ নিয়ে ফিরলেন বিশ্বের ১৬১টি দেশের শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ। নতুন শতাব্দিতে ইসলামী রেনেসাঁর মাইলফলক হতে পারে এই সম্মেলন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করুন!■

www.bjilibrary.com

আর্তমানবতার সেবায় মসজিদ কাউন্সিল

মসজিদ কাউন্সিল একটি সমাজসেবামূলক
দ্বিনী প্রতিষ্ঠান।
মসজিদ ভিত্তিক সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে
মসজিদ কাউন্সিল
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

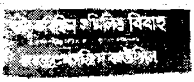

এক নজরে মসজিদ কাউন্সিল

- মসজিদ ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
- ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প
- ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
- যাকাত ভিত্তিক সমন্বিত আদর্শ গ্রাম প্রকল্প
- চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম (ইয়াতিম, প্রতিবন্ধী, পরিত্যক্ত ও ঠিকানাবিহীন শিশু প্রতিপালন ও পুনর্বাসন)
- সুদমুক্ত আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প
- এলমে দ্বীন শিক্ষা ও দাওয়া প্রকল্প
- ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প
- এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প
- আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহযোগীতামূলক উন্নয়ন প্রকল্প
- ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক
- নারী ও শিশু অধিকার বাস্তবায়ন প্রকল্প
- মাদক বিরোধী প্রচারণা
- সন্ত্রাস বিরোধী প্রচারণা

আপনার যাকাত, সাদাকাহ্ সহ যে কোন ধরনের দান মসজিদ কাউন্সিলের এ সকল সেবামূলক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের ব্যাংক হিসাব নং MSA-02102625 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, উত্তরা শাখা, ঢাকা।

যোগাযোগ

মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এডভান্সমেন্ট
বাড়ি ০৮ (২য় এবং ৩য় তলা), রোড ৩৩, সেক্টর ৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৮-০২-৮৯৫৪৩০৫, ০১৭১৭-৬৪২৭৯৫ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৯২২০০৮
Web : www.masjidcouncilbd.org, www.zakatguide.org
E-mail : macca@dhaka.net

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবী, তোমাকেই বড় প্রয়োজন ॥ আ বু তা হে র বে লা ল

আজাজিলের ডানায় ভর করে ঐ ক্ষুধার্ত বাঘিনীর চোখ
আকাশ ছুঁয়েছে দেখ। বিপন্ন আকাশের নীল-সৌর বলয়
বিচ্যুত পূর্ণিমা চাঁদ, ধূসরিত ম্রিয়মাণ জোস্না আলয়
ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে নিরাভরণ সূর্যের আলোক।

বন্য শ্বাপদের নিঃশ্বাসে উচ্ছন্ন প্রায় সবুজাভ মানচিত্র
নিকষ কষ্টে কষ্টে নিরেট পাথর হলো যত যাপিত দিন
পাপিয়ার দু'চোখ ফেটে রক্ত ঝরে অবিরাম-বিরতিহীন
নিরুদ্দেশ বনবাসে প্রিয়জন, নির্বাক যত সুহৃদ মিত্র।

ম্যানহোলে পচে গলে ভেসে চলে কফিনহীন শবের সারি
অনল দহনে পোড়ে মাথার মগজ হাড় গোড় মাংস পেশী
মৃত্তিকার গভীরে গলাগলি পড়ে রয় স্বজন প্রতিবেশি
তটিনীর তীরে তীরে জাগে পাখির কূজন বেদনা সঞ্চারী।

অদৃশ্য মঞ্চে চলে স্বাধীনতা বিকানোর প্রাণান্ত আয়োজন—
এই দুর্যোগে-সংকটে প্রিয় নবী, তোমাকেই বড় প্রয়োজন।

স্বপ্ন-সম্ভাবনার চাঁদ ॥ আ ল হা ফি জ

মানুষের বানানো সে হাবিয়া দোজখ
সুখবরে নিভে যায়, বয়ে যায় শীতল বাতাস
আকাশের বাগিচায় তারা তারা ফুল ফোটে আর
খুশি মনে গান গায় দিলখোলা পাখি

আমিনা জননী হয়– সে খবরে সুবাসের ছড়াছড়ি আজ
আকাশে বাতাসে যেনো রঙছবি খুশির আমেজ
মানুষের ভেতরেও ঢেউ ওঠে পুরোনো কাহিনী ভেজা
কোকিলের সুরেলা গলায়। জঙধরা নানা রঙ
ভূতেরাও তড়পায় পেছনের দরোজা ছায়ায়
পালায় সদলবলে জানারঙ ছলছুতো অজুহাত ফেলে।

www.bjilibrary.com

হাঁফ ছেড়ে বেঁচে ওঠে মানবতা বোধ
মানুষেরা খুঁজে পায় জীবনের রোদ
অবশেষে শান্তির পায়রারা সাদা রঙ ঘুড়ি
তুমুল তৃপ্তি নিয়ে ওড়ে নীল আকাশে তখন।
বাতাসে বাতাসে ওড়ে খুশির সুবাস
দিকে দিকে ওড়ে যেনো রঙধনু খোদার বেলুন।

মানুষের ঘরে ঘরে ফুল ফোটে স্বপ্নসমান
মানুষের ঘরে ঘরে চাঁদ ওঠে সম্ভাবনার
মানুষ মানুষ হয়, সীমার মানুষের মতো
মানুষ মানুষ হয় তাঁর ছোঁয়া ভোরের মতো

মহান নেতা ॥ সা মু য়ে ল ম ল্লি ক

নেতাদের নেতা যিনি কোন সে লিডার
শ্রমিকেরা ভুলে গেলো ক্ষুধা অনাহার
গোলামেরা ফিরে পেলো মানবাধিকার
নির্যাতিতা নারী পেলো ন্যায়ের বিচার।

থেমে গেলো শোষকের দেহের কাঁপন
পুঁজিবাদ জাতীয়তা সেক্যুলারবাদ
মানবরচিত বাদ হলো বরবাদ।

শাসকের সেরা যিনি আদর্শ শাসক
সেনাপতি বিচারক ত্রাসের নাশক
কোন সে মানুষ যিনি আদর্শ মডেল
ব্যথিতের বন্ধু যিনি দয়াল অঢেল
পৃথিবীর সেরা যিনি নিষ্কলুষ ফুল
নির্দ্বিধায় বলে ওঠো রাসূল, রাসূল!

www.bjilibrary.com

হে রাসূল ॥ মৃ ধা আ লা উ দ্দি ন

বুশকে জুতা মারার জন্য জাইদির তিন বছরের জেল–
শুনেই বন্ধ হয়ে গেলো আমার দক্ষিণের জানালা
বুকটা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেলো তপ্তখরায় ফাটা
কৃষকের ধানি জমির মতো...

পিলখানার ট্রাজেডি কাঁপে ফেলে রাখা অবশিষ্ট চায়ের
মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায় অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য
ডোমঘরে পড়ে থাকে সেনা নওজোয়ানের লাশ–
এ দৃশ্য দেখলেই আমাদের সামনের নদীটা শুষ্ক
হয়ে যায় মরা পদ্মার মতো; বুকটা ফেটে চৌচির
হয় যেনো তপ্তখরায় ফাটা একখানি কৃষকের
ধানি জমি...

বসুন্ধরা গ্রুপের করপোরেট অফিসের আগুনকে
যখন বলা হলো নাশকতা অথবা বিরাশি বছরের
গোলাপজান বিবিরা বিধবা ভাতা পেলো না,
তখন আমাদের বড্ড কষ্ট হলো—মনে হলো
মাথার উপর থেকে সূর্যটা নিভে গেলো।
আর কাছে, খুব কাছে চলে এলো ব্লাকহোল
বা কোয়াসার, নির্দিষ্ট জাহান্নাম।

অতএব, হে রাসুল! ঠাণ্ডা করো আমাদের এই
পৃথিবী তোমার আবহায়াতের দ্বারা– এই
অস্থির উর্বর ভূমিরাজ্যে পুনর্বার ঢেলে দাও
তোমার রহমতের বারি যা সয়লাব হয়ে
গ্যাছে মানুষ ও অমানুষে।

হে রাসূল!...

www.bjilibrary.com

মুহাম্মদ ও ছোট শিশু ॥ আ ফ সা র নি জা ম

ঈদগা'র ময়দানে ছোট শিশু পাতে হাত
তার নাকি কেউ নেই কাটে একা দিন রাত
দুখে তার কলিজাটা ফেটে হয় একাকার
ফেটে যায় কলিজাটা রেখে যায় রেখা তার
তাই একা বসে কাঁদে ঈদগা'র এক কোণে
কেউ যদি ভালোবেসে কাছে টানে একমনে
চলে যাবে তার কাছে সব দুখ ব্যথা ভুলে
এই আশা বারবার ছোট এই বুকে দুলে।

জগতের নেতা তিনি ঈদগাহে হেঁটে যান
ঈদগাহে এক কোণে ছোট এক শিশু পান
ছোট এই শিশু ছেলে কেঁদে কেঁদে বলে এই–
ভালোবাসা চুমু দিতে তার প্রিয় কেউ নেই
নেতা তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে
তার দুখ-ব্যথাগুলো নিজ ব্যথা দিয়ে বুনে
শিশুটির ভেজা চোখ চুমু দিয়ে মুছে দিলো
ভালোবাসা দেবে বলে নিজ ঘরে তুলে নিলো।

শিশুটিকে কোলে তুলে ঘরে এসে দেন হাঁক
কোলে সে এক শিশু দেখে বিবি তার নির্বাক
বিবি তারে ডেকে বলে এই শিশু বলো কার
তাকে যদি দাও তবে চাই না তো কিছু আর
নেতা হেসে বলে, বিবি এই নাও উপহার
ভালোবাসা দিয়ে তুমি মুছে দাও দুখ তার।

ঈদগাহে আনন্দ করেছে যে আঞ্জাম
সেই নেতা কে ছিলেন জানো নাকি তাঁর নাম
তাঁর নাম মুহাম্মদ আমাদের নবী যিনি
বিবি ছিলেন আয়েশা জগতের মাতা তিনি।

www.bjilibrary.com

অযুত শব্দের উপমা ॥ ম ন সু র আ জি জ

অযুত শব্দের উপমা যদি তোমার নামে জুড়ে দিই
তবুও নিযুত শব্দ রবে প্রতীক্ষায় অধির
লক্ষ তারার জ্যোতি যদি জড়ো করি তোমার পাশে
সব কিছু ক্ষীণ হবে তোমারই রূপের কাছে।

পৃথিবীর সব ফুল বেটে যদি বের করি তার নির্যাস
তোমার গন্ধ শুঁকে লজ্জায় ফুলগুলো মুখ ঢাকে পাপড়িতে
মধুময় বাণী শুনে বাগ্মীপুরুষ
পিপাসিত হয়ে যায় মুগ্ধ বধির।

পাপদগ্ধ হৃদয়ে যদিও বা গেঁথে যায় তোমার সবক
পুণ্যে হাসে হৃদয়ের গোলাপ বাগান
প্রশান্তি খেলা করে আঁধার মনে
যদি এই মন পায় তোমার পরশ।

শান্তির প্রয়োজনে দূর হবে দুঃখ ও গ্লানি
অশান্ত পৃথিবীতে আজ শুধু প্রয়োজন তোমার বাণী।

স্বপ্নশালায় আমার ক্যানভাস ॥ আ হ ম দ বা সি র

ফেলে আসা অতীতের হাজার হাজার
সভ্যতার এ কঙ্কালসার অস্তিত্বের ভার
বইবার, দায় বলো কার?
একটাই ক্যানভাস আমার
          স্বপ্নশালার
          আশ্চর্য অহংকার!
যেখানে এ হৃদয়ের সবগুলো বর্ণ আার
                    সবটুকু রং আর
সবখানি ভালোবাসা ঢেলেও যে হায়
ফোটাতে পারি না আমার
                    স্বপ্ন-সারাৎসার।

অবিশ্রান্ত তবু এঁকে যাই ছবি
দাঁড়ায় যেখানে এসে স্তব্ধবাক
জগতের যতো মহৎ মহান সব
                    শিল্পী ও কবি
আমার এ ক্যানভাসের নাম
                    মদীনাতুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.bjilibrary.com

দুলে উঠি, হেসে উঠি ॥ রে দ ও য়া নু ল হ ক

তোমাকে স্মরণ করতেই বুকের ভেতরটা
একেবারে ফুরফুরে সতেজ হয়ে যায়
যেনো অনেক দিন পর বৃষ্টির দেখা পেলো চাষী
যেনো প্রচণ্ড ক্ষুধার পর এক মুঠো খাবার পেলো
কোনো ভিক্ষুক
যেনো দু'টি অন্ধ চোখ হঠাৎ দৃষ্টি ফিরে পেয়ে
নাচতে নাচতে দেখতে লাগলো পৃথিবীর রূপ...

তোমাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাই রাজ্য হারাবার দুঃখ
হৃদয়ের সব অসুখ-বিসুখ, হাড়ের পচন
আমার কুইনাইন মুখ ভরে ওঠে বেহেশতি শরাবে
আর আমি হয়ে উঠি সুস্থ-সবল এক চঞ্চলা চড়ুই...

তোমাকে স্মরণ করতেই সুবাসিত হয় ঘর
ঘরের আসবাবপত্র, মেঝে–সব কিছু অন্য রকম
পবিত্রতায় ভরে ওঠে
যেনো আমার মুখমণ্ডলের উপর কেউ বিছিয়ে দিলো গোলাপের নদী...

তোমাকে স্মরণ করতেই আনন্দ আর ধরে রাখতে পারি না
যেনো এইমাত্র মৃতপ্রায় একটি পাখি ফিরে পেলো বাঁচার আশ্বাস
যেনো আকাশ হতে গড়াতে গড়াতে দু'টি সোনালি নক্ষত্র
টুপ করে ঝরে পড়লো আমারই ক্লান্ত হাতে
যেনো এইমাত্র ছাড়া পেলো অন্যায়ভাবে যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া কোনো নিরপরাধ মানুষ...

তোমাকে স্মরণ করতেই আমি আপাদমস্তক দুলে উঠি
দুলে উঠি
          হেসে উঠি
নিষ্পাপ শিশুর মতো।

www.bjilibrary.com

ফেরা ॥ সা ই ফু ল্লা হ্ খা লি দ

সালাম বিনিময় হতেই হাত বাড়িয়ে প্রশ্ন ঠোঁটে
চেনা চেনা লাগে
দেখা হলো কি অনেক দিন বাদে?

হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল রাসূলের এই পথে।

কিন্তু!

প্রশ্ন নয়কো সাথী
ঠকে ঠকে শিখেছি অনেক
পথ হারালে দাঁড়িয়ে ক্ষণেক ফিরতে হয়
ফিরতে হয় শেকড়ের কাছে
নিতে হয় ফের
রাসূলের সীরাত থেকে পথের দিশা
কি হবে আর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেঁচে থেকে
তুষ্ট হওয়ার কি আছে আর
সাম্রাজ্যবাদীদের বিষে?

ওদের তো সবই মিছে
অন্যের হৃৎপিণ্ড বুলেটে গেঁথে ওরা
বিশ্বব্যাপী প্রেমের সুধা ঢালে
বাকপটুতায় নেই ওদের ত্রুটি
অথচ খাবার বিলানোর ছলে
কফিনে ভরে তাজা লাশ আর রুটি।

বন্ধু, আমার মুহূর্তগুলো এখন অন্যরকম কাটে
রক্ত আবার তারুণ্যের তাপে ফোটে
আমার অশরীরী আমি যেন
ফিরছি আবার হুনাইনের মাঠে!

www.bjilibrary.com

শান্তির দূত ॥ জা লা ল খা ন ই উ সু ফী

আলোড়ন ওঠে যার সত্যের সাড়াতে—
দুই ভাগ হলো চাঁদ যাঁর হাত নাড়াতে
একে একে সবগুলো আসমান পেরিয়ে
বোররাখ চড়ে যিনি এসেছেন বেরিয়ে।

সত্যের সেরা পাঠ কালেমা যে পড়ালেন,
আল্লা'র সাথে যিনি পরিচয় করালেন
পৃথিবীর আঁধারকে করেছেন তিনি দূর
প্রচলন করেছেন আযানের মিঠা সুর।

অসুস্থ সমাজকে করেছেন সুস্থ
তিনি এক আল্লা'র সব সেরা দোস্ত
তাঁর প্রতি মুসলিম রাখে খুব আস্থা
তিনি আর কেউ নন মুক্তির রাস্তা।

আমাদের নবী তিনি কুরআন পেয়েছেন
দিকে দিকে কোরানের গুণগান গেয়েছেন
প্রশংসা করেছেন আল্লাহ নিজে যাঁর
আমি তাঁর গুণগান করি বলো কি যে আর!

ছিল তাঁর সব কাজে অঢেল হিম্মত—
আমরা রাসূলের ভাগ্যবান উম্মত।

www.bjilibrary.com

আলোর বৃত্ত ॥ মোঃ দি দা রু ল আ ল ম

নবী-রাসূল ওলী আল্লাহ
যে বৃত্তের সাথী
তার ভিতরেই মাওলা আমার
জ্বালায় নূরের বাতি।

জীবনটাকে যারা বন্দী করে
সেইরূপ এক বৃত্তের ভেতর,
যেখানে হেরার জ্যোতি উপচে পড়ে
আলোকিত হয় মুমিনের অন্তর।

দুনিয়াকে যারা স্বর্গ ভেবে
আত্মসুখে থাকে ডুবে
মেটায় মনের আশা,
বৃত্তচ্যুত হয়ে তারা
হয় শুধু আত্মহারা
পায় না পথের দিশা।

সেখানে সবাই যায় ছুটে যায়
সেইরূপ এক আলোক বৃত্তের মাঝে,
যেখানে জীবন চলে, স্রষ্টার ইশারায়
ফেরেশতারা হাসে, অপরূপ সাজে।

www.bjilibrary.com

আড়াল

নাসীমুল বারী

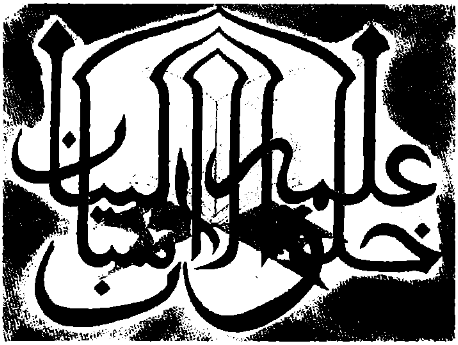

প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় আওরা।

আরবের সম্ভ্রান্ত মহিলা। হরব ইবনে উম্যাইয়ার কন্যা। আরবের শীর্ষ নেতা আবু সুফিয়ানের বোন। শুধু তা-ই নয়, আরবের সবচেয়ে বনেদী পরিবার কুরাইশ বংশের সন্তান আবু লাহাবের স্ত্রী। তাকেই কিনা আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ বলেছে ভবিষ্যতে কাঠকুড়ানী হবে। আরবে উপহাস-তিরস্কার করার সবচেয়ে জঘন্য উপমা এটি। এত বড় কথা! রাগ আর ঘৃণায় ফেটে যাচ্ছে আওরা।

আবু লাহাবও।

স্থির থাকতে পারছে না তারা দু'জন। কথাটা শুনেই আবু লাহাব এক শিষ্যকে পাঠায় কথার সত্যতা যাচাই করতে। সত্যি হলে আওরা নিজেই খুন করবে মুহাম্মাদকে। তার রক্তে মনের জ্বালা মেটাবে।

বিরক্তিটা আবু জেহলের ওপরও পড়ে। কেন যে সেদিন পারল না তাকে হত্যা করতে– ভেবে পায় না। কী সব কথা বলছে আবু জেহেল! এসব কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? সে নাকি কাবাঘরে মুহাম্মাদকে হত্যা করার সময় আগুন দেখেছে। ওর সামনেই আগুনের পরিখা। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

ভাবতে থাকে আওরা।

www.bjilibrary.com

এই তো ঘটনাটা ক'দিন আগের!

কাউন্সিল সভা।

নয়জন সদস্য এ সভায় উপস্থিত। স্থানটা আবু সুফিয়ানের ঘর। সভাপতি হিসেবে আবু সুফিয়ান। প্রধান বক্তা দুজন– আবু জেহেল ও আবু লাহাব। আজই তারা সিদ্ধান্ত নেবে; গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব পুরো আরবে গোত্রসমূহে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে– তা রুখতে হবে। কীভাবে রুখবে? সে নিয়েই আজকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

আবু সুফিয়ান কুরাইশদের অনেক বড় নেতা। আবু জেহেল, আবু লাহাবও। দীর্ঘ আলোচনা হয় সভায়। অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, দুজন দুর্ধর্ষ সাহসী আর কঠিন হৃদয়ের লোক মুহাম্মদকে হত্যা করবে।

কিন্তু!

আবু সুফিয়ান যেন একটু থমকে যায়! ব্যাপারটি নিয়ে মুহাম্মাদের অভিভাবক আবু তালেবের সাথে একটু আলোচনা করা দরকার। তাকে যে কোন উপায়েই রাজি করতে হবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে।

সবাই যায় আবু তালেবের ঘরে।

অসুস্থ আবু তালিব আরবের সবচেয়ে সম্মানিত একজন। কুরাইশ বংশের এই নেতার ভাইপো মুহাম্মদ। তিনি এ মুহূর্তে মুহাম্মাদের অভিভাবক। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্ব যে দল এসেছে তাতে আবু তালিবের আরেক ভাই আবু লাহাবও আছে। এমন শক্তিশালী দলের ভয়ে আবু তালিব যেমন টলেননি, তেমন মুহাম্মাদও। খুব একটা সায় পায়নি আবু তালিবের পক্ষ থেকে। মনোকষ্টে সেখান থেকে ফিরে আসে।

অত:পর অন্য একদিন বসে এ নিয়ে আবার সভা। এবারও আবু সুফিয়ানের ঘরে। এবার ভোজেরও আয়োজন– তপ্ত পাথরে রাখা পোড়া গোশত, মেঘশাবকের ঘাড়, পঙ্গপালের ভাজি, দুধ, মাখন আর এসবের সাথে থাকে প্রিয় মধু ও বার্লির মদ।

এমন ভোজ সভায় খানাপিনার মহাআয়োজন শেষে একদল শপথ নেয় তারা মুহাম্মাদকে হত্যা করে তার হাত থেকে আরবকে মুক্ত করবে।

হত্যাকারী দলের নেতা আবু জেহেল।

কাবাঘরের এক কোণে কাল পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদত করছে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইবাদতরত মুহাম্মাদের ওপর আক্রমণ করবে আবু জেহেল। কাবার পাশে কুরাইশ সর্দারদের কামরায় অন্যরা সবাই প্রস্তুত থাকবে। তারা সাথে সাথে এগিয়ে এসে আবু জেহেলকে সাহায্য করবে।

আবু জেহেল একটা বড় পাথর নিয়ে সেখানে লুকিয়ে রইল। মুহাম্মাদ ইবাদতে যেই নতজানু হল, অমনি আবু জেহেল বেরিয়ে আসে। পাথর মারতে হাত উঁচু করে। কিন্তু

www.bjilibrary.com

এ কি! হাত আর নড়ে না যে! মুহাম্মাদের মাথার ওপর উঁচু করা হাত অচল হয়ে রইল। ভয়ে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে কুরাইশদের কামরায় ফিরে এল।

অন্যরা সবাইও ভড়কে গেল।

ব্যাপার কী? বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রশ্ন করছে। আবু শুধু বলছে, "আমি দেখলাম মুহাম্মাদ ও আমার মাঝের স্থানে আগুনের পরিখা। ঐ অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুনের লেলিহান আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি সেখানে ক্ষমতাহীন ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা স্বপ্ন না বাস্তব তা যা-ই হোক, হুবলের শপথ, আমি নিজের চোখে এই আগুনের পরিখা দেখেছি।"

এমনি অদ্ভুত ঘটনায় সেদিন মুহাম্মাদকে হত্যা করতে পারেনি আবু জেহেল। আওরা মনে মনে ভাবছে, সত্যি কি জেহেল আগুনের পরিখা দেখেছে? সেদিন মুহাম্মাদকে শেষ করে দিলেই তো আজ আর এমন কাঠকুড়ানীর অপবাদ শুনতে হত না।

না, এ বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আজ সে নিজেই হত্যা করবে মুহাম্মাদকে। কে রুখবে তাকে?

লাহাবের পাঠানো সেই অনুগত ও বিশ্বস্ত সহচরকে ফিরে এসে বলে ঘটনাটি সত্য। লাহাবকে শোনায় নাযিল হওয়া কুরআনের সেই আয়াত–

"আবু লাহাবের দুই হাতই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সে নিজেও ধ্বংস হবে। তার উপার্জিত ধন-দৌলত কোন কাজেই আসবে না। সহসাই সে লেলিহান আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং তার স্ত্রীও জ্বলবে। সে [দোযখের] ইন্ধন [কাঠ জ্বালানি] বহন করবে। তার গলায় খেজুরের আঁশের পাকানো রশির বেড়ি থাকবে।"

সূরা লাহাবের এ আয়াতগুলো শুনে রাগ আরও বেড়ে যায় আওরার। আবু লাহাবেরও। রাগে আওরা দ্রুত বেরিয়ে যায় আবু বকরের কাছে। তাঁকে জানায় নিজের মনের ইচ্ছার কথা।

তারপর থেকে সুযোগ আর আসে না। একদিন আসে সুযোগ। লোক মারফতে জানতে পারে আবু বকর আর আরও একজন সাথী নিয়ে মুহাম্মাদ কাবাঘরে অবস্থান করছে।

ব্যস!

দ্রুত যায় কাবাঘরের দিকে।

আজ সে প্রতিশোধ নেবেই। হিজুর প্রতিশোধ। হিজু মানে কবিতার মাধ্যমে নিন্দা করা। আওরা ভাবে, মুহাম্মাদ কবিতার মাধ্যমে তাকে কাঠকুড়ানীর উপহাস করেছে। তার স্বামীকেও উপহাস করেছে। এমন উপহাস কি সহ্য করা যায়?

মোটেই না।

আর তাই মুহাম্মাদকে হত্যা করে মনের জ্বালা মেটাবে। আরবের মানুষকেও মুহাম্মাদের জাল থেকে মুক্ত করবে। কী উত্তেজনা! কী শিহরণ! কী রাগ!

www.bjilibrary.com

এমনি রাগ আর টান টান উত্তেজনা নিয়ে আসে কাবাঘরে। দেখে আবু বকর আর সাথের লোকটি আছে। মুহাম্মাদ নেই। প্রচণ্ড রাগে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, মুহাম্মাদকে কোথায় পাওয়া যাবে?

-তোমার কী প্রয়োজন?

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে আবু বকর জিজ্ঞেস করেন।

-আমি শুনেছি সে আমাকে উপহাস করেছে। আমি হিজুর প্রতিশোধ নেব। পাথর দিয়ে তার দাঁত ভেঙে দেব। তাকে খুন করব।

আবু বকরও সাথে সাথে বলেন, আল্লাহর কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না!

সাথের লোকটিও সাথে সাথেই প্রতিবাদ করে বলে, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। মুহাম্মাদ কবি নন যে তোমাকে নিয়ে উপহাস করবে।

তাঁদের সাথে কথা হয় বটে; কিন্তু মুহাম্মাদের দেখা পায়নি আওরা। মুহাম্মাদকে না পেয়ে আওরা রাগ নিয়েই চলে যায়।

এ ঘটনাটি দেখেছে অনেকেই।

অবাক হয়ে যায় সবাই!

অবাক হবে না কেন? আওরা যখন আবু বকরের সাথে কথা বলছিল, তখন তাঁরই পাশে বসা ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আওরা তখন তাঁকে দেখতেই পায়নি।

অবাক করা কাণ্ডই বটে!

আর তাই তো আবু বকর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, সে কি আপনাকে দেখেনি?

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে উত্তর দেন, "যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছিল।" তারপরই তিনি সূরা বনী ইসরাইলের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতটি পড়ে শোনান,

"আর যখন তুমি কুরআন পড় তখন আমি তোমার ও আখেরাতে অবিশ্বাস স্থাপনকারীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দিই।"

সত্যিই আল্লাহর কী কুদরত!

কুরআনের এ আয়াত সত্যি বলেই কাফের, আখিরাতে অবিশ্বাসকারী আওরা হত্যা করতে এসে দেখতে পায়নি দুনিয়ার একমাত্র সেরা মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।■

www.bjilibrary.com

নারী অধিকার ও আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ [সা]

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

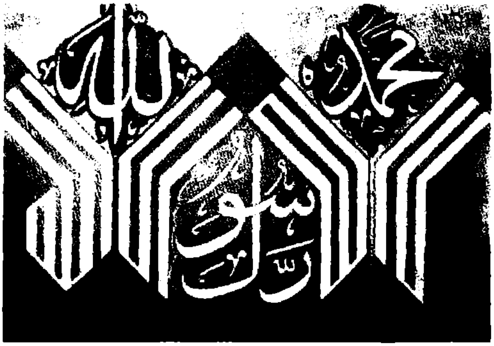

মানবতার মহান শিক্ষক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] এ পৃথিবীতে এসেছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকলের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। অধিকার আদায়ের আন্দোলন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অধিকার আদায়ের প্রশ্ন তখনই আসে যখন একজন মানুষ তার নির্ধারিত অধিকার থেকে পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে বঞ্চিত হন। অধিকার এমন একটি স্পর্শকাতর প্রসংগ যা প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রই অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখেন। আমরা আমাদের সমাজ বাস্তবতায় বিভিন্নভাবে মানুষকে অধিকারবঞ্চিত হতে দেখি। সেই অধিকার বাস্তবে কিংবা আদায়ের ক্ষেত্রে কালে-কালে নানা রকম আন্দোলন সংগ্রামের ডাক দেয়া হয়েছে। কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষও অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজে একজন মানুষ তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সেই ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও গোটা জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ অধিকারবঞ্চিত একজন মানুষ তার অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আইনবহির্ভূত কিংবা আইনের ফাঁক ফোকরে এমন কিছু করে ফেলতে পারেন যা সমগ্র মানব জাতির জন্য অকল্যাণকর।

www.bjilibrary.com

অধিকার কথায় নয়, কাজে

আলোচিত বিষয়টি যতটা না তাত্ত্বিক তার চেয়ে অনেক বেশী বাস্তবিক। বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে ব্যক্তি তার অধিকারের প্রশ্নে সচেতন থাকলে অধিকার আদায় যতটা সহজ হয় ঠিক ততটাই কঠিন হবে অধিকারের প্রশ্নে ব্যক্তি অসচেতন থাকলে। প্রশ্ন উঠতে পারে : ব্যক্তি আগে সচেতন হবে নাকি তাকে অধিকার আগে প্রদান করা হবে? বিষয়টির জটিলতা যত গভীরে কিন্তু তার সমাধান সম্ভব ততটাই সহজ ও সাবলীল। আমাদের সমাজ বাস্তবতায় অধিকার আদায়ের প্রসংগে ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র কখনও কখনও অধিকার আদায়ের প্রশ্ন তুলে অধিকার হরণ করার মত অমানবিক ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। উদারতার পরিবর্তে সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিস্বার্থের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায় অধিকার আদায়ের নানা অনুষঙ্গ যা দেশ ও জাতির জন্য শুধু অকল্যাণকরই নয়, অমানবিকও বটে! যিনি অধিকার পাবেন কিংবা যাকে অধিকার প্রদান করা হবে অথবা যার মাধ্যমে অধিকার বাস্তবায়ন করা হবে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ঘৃণ্য স্বার্থপরতার বেড়াজাল ছিন্ন করতে না পারলে অধিকার হয়ে যায় অভিশাপের শামিল। আমরা আমাদের সমাজে অধিকার প্রদান করতে গিয়ে সমন্বয়হীনতার অভাবে অধিকার বঞ্চিতদের আরেক দফা নির্যাতন কিংবা বঞ্চনার কষাঘাতে বেঁধে ফেলা হয়। তাই অধিকারের প্রশ্নটি ব্যক্তির প্রাপ্য ও প্রাপ্তির সাথে অনেক বেশী সম্পৃক্ত।

অধিকারের নানা অনুষঙ্গ

সৃষ্টিজীবের জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্ধারিত অধিকার দিয়েই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং অধিকার তার জন্মগত প্রাপ্তি। সে প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন নিম্নোক্ত মৌলিক উপাদান :

- ব্যক্তির মূল্যবোধ [Personal values]
- মানবিক মূল্যবোধ [Human values]
- সামাজিক মূল্যবোধ [Social values]
- আদর্শিক মূল্যবোধ [Idological values]

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মূল্যবোধের সাথে লালিত হয় অধিকারের মতো এ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটির। যে জাতি যত বেশী মূল্যবোধের মতো এ মৌলিক উপাদানে সজ্জিত সে জাতি তত বেশী অধিকার সচেতন হবে তা বলা যায় নি:সন্দেহে। মানুষের এই অধিকার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমন কি অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। আমাদের সেই সমাজ পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যাদের আওতাধীন তারা আমাদের নারী সমাজ। অবলা কিংবা অসহায় হিসেবে নারী জাতিকে চিহ্নিত করে তাদের অধিকার আদায়ের নামে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রতারিত করা হয়েছে বিভিন্ন কৌশলে। কৌশলের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নারী উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন রকমের স্পর্শকাতর, অথচ লোভনীয়

www.bjilibrary.com

নীতিমালা। যে নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের নারী সমাজকে অধিকার প্রদানের পরিবর্তে পরিণত করা হয়েছে ভোগ্যপণ্যের লোভনীয় বস্তুতে।

অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও নারী সমাজ

সাম্প্রতিক একটি রির্পোটে পরিলক্ষিত হয়েছে অধিকার আদায়ের আন্দোলন যত বেশি সোচ্চার হয়েছে আমাদের নারী সমাজ তত বেশী অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হয়েছে। কারণ অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নামে অধিকারবঞ্চিত করার এক ঘৃণ্য নীল নকশার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে ২০০৯ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রকাশিত একটি তথ্যে জানা যায়, নারী নির্যাতনের হার প্রতি বছর প্রায় দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু মৌলিক গলদ যেখান থেকে শুরু সেখান থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না নিয়ে আশেপাশে প্রক্রিয়া চালালে সফলতার সোপান খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হবে। আদর্শিক শূন্যতার দিকটি শুধু তথ্য-প্রযুক্তি দিয়ে পূরণ করা যে সম্ভব নয় তা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সে যুগেও নারীদের অবহেলা আর বঞ্চনা ছিল সীমাহীন। তাদের সবই ছিল, শুধু ছিল না আদর্শিক মূল্যবোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি। প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে নারী সমাজের অধিকার আদায়ে কতটা ভূমিকা রেখেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী বিবেচনা সাপেক্ষ ছিল আদর্শগত দিকের অগ্রগতি।

নারী অধিকার ও সাম্প্রতিক সমস্যা

বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার পক্ষ থেকে নারী অধিকারের প্রশ্নটি যত বেশী আলোচিত হচ্ছে সমস্যা সমাধানের পথ ততটাই ক্ষীণ হয়ে আসছে। কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে, সমস্যার সমাধানে আলোচনা-সমালোচনার পথ যত ত্বরান্বিত হচ্ছে সমস্যা নির্মূলে কার্যকরী পদক্ষেপের ততটাই দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। যেসব সমস্যা নারী অধিকার আদায়ের প্রশ্নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে তা গুরুত্বের সাথে তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। যেমন :

- অধিকার আদায়ে অসচেতনতা।
- সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি।
- উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব।
- ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োগ না থাকা।
- নারী উন্নয়ন নীতিমালার নামে নারী সমাজের অধিকার হরণ নীতিমালা বাস্তবায়নের অপপ্রয়াস।
- পারিবারিকভাবে পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের অভাব।
- নারী সমাজকে শুধু বস্তুগত দিক থেকে বিশ্লেষণের অপতৎপরতা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বয়হীনতা।

www.bjilibrary.com

- ❖ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।
- ❖ প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণায় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ।

নারী অধিকার প্রদানে নবী মুহাম্মাদ [সা]

অধিকারের প্রসঙ্গটি আলোচনায় আসলে মানবতার মহান শিক্ষক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ না করে কোন উপায় থাকে না। সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নে মায়ের প্রতি তিনবার দৃষ্টি আকর্ষণ দিয়ে সেই ঐতিহাসিক ভিত্তিটি তিনি নির্মাণ করে রেখে গেছেন। সম্মান দেয়ার প্রশ্নটি যত বেশী আলোচিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে নারী জাতিকে অসম্মান ও মর্যাদাহানিকর ভূমিকা থেকে রক্ষা করার কার্যকরী পদক্ষেপের। দুধমাতা হালিমা'র [রা] প্রতি তাঁর প্রদর্শিত সম্মান যুগ যুগ ধরে সমগ্র নারী জাতির জন্য উল্লেখযোগ্য দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে।

মোটকথা, নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলন কিংবা বাস্তবায়ন সাময়িক উদ্দেশ্য হাসিলের কোন মাধ্যম হতে পারে না, বরং পদ্ধতিগত কিংবা প্রক্রিয়াগত দিক থেকে বিষয়টিকে দীর্ঘমেয়াদী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, একজন নারী একজন মা, আর একজন মা জন্ম দেন একটি ভাল পরিবারের। এরকম অসংখ্য ভাল পরিবারের সমষ্টি হচ্ছে আমাদের সুন্দর সমাজ। সুন্দর সমাজের হাত ধরেই নির্মিত হতে পারে সুন্দর একটি রাষ্ট্রের।■

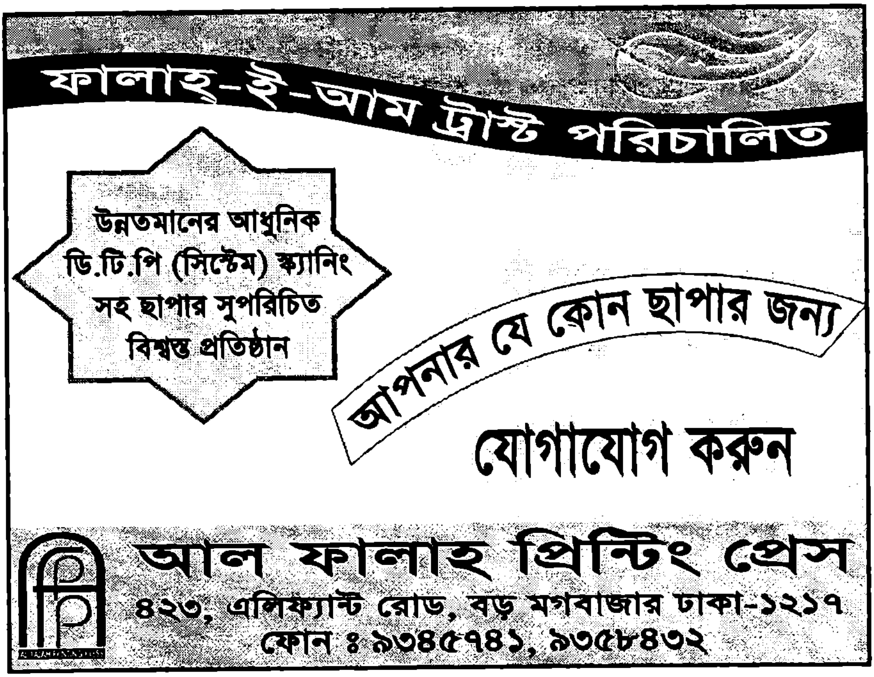

www.bjilibrary.com

প্রার্থনা ॥ ও ম র বি শ্বা স

প্রথম পাঠেই কি পৃথিবী কেঁপেছিল
না পৃথিবী কেঁপেছিল প্রথম সৃষ্টির সময়?

অলৌকিক জ্যোতির পরাগে এক অপূর্ব পুলকে
কেঁপেছিল সমস্ত পৃথিবী এক প্রচণ্ড শিহরণের ভারে!

প্রকৃতির ভাষা বোঝে প্রকৃতি কেবল
জ্যোতির আলো ছড়াবে বলে জেনেছিল তারা অনেক আগেই
তাই তো আপনি হেঁটে গেলে গাছ আপনাকে বলতে থাকত,
'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ'!
পাথরের প্রাণ ফিরে আসত পাথরে
তারাও বলত, 'আসসালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ'
আপনি ছিলেন অপরূপ সত্য বাস্তবতা!

তারাগুলো নিয়ে এসেছিল নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর রাত
জিবরীলের রেশমী কাপড়ের সাথে আসে অলৌকিক কম্পন
পৃথিবী অদ্ভুতভাবে শিহরিত হচ্ছিল রেশমীখণ্ডের লেখা পড়ে–
আপনি তখনো জানতেন না যে কি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে!
সৃষ্টির রহস্য ভরা নিগূঢ় পাঠের মধ্যে আপনি তখনো অস্তিত্বের
অর্থ খুঁজছেন।
রহস্যের প্রান্তর সজীব হয়ে নীলিমায় ছড়াতে লাগল ক্রমে
রুদ্ধশ্বাসে সে সবের সাক্ষী হয়েছিল হেরা।

পৃথিবীর প্রার্থনা কবুল হচ্ছে
আলোকিত হচ্ছে নব ভোর
রেশমীখণ্ডের ভিতর যে রহস্য লুকিয়ে ছিল
তা যতই বের হচ্ছে
পৃথিবী কাঁপছে তত
পৃথিবী কাঁপছে।

www.bjilibrary.com

কেবলাতাইন ॥ শ ফি কু র র হ মা ন র ঞ্জু

আকাশ পানে
আকুল চেয়ে থাকে
    নবীর মন
    হুকুম পেতে ডাকে
কাবার পানে
ঘুরবে কবে দিক
    নামাজ পড়ে
    তৃপ্তি মেটান ঠিক
প্রহর গুণে
আদেশ শুধু হবে
    কাবার পানে
নামাজ পড়ে কবে
হুকুম এলো
কেবলা করো ঠিক
    নামাজ পড়ো
    এবার কাবা দিক
আসর বেলা
হুকুম যেই হয়
    কেবলা তাইন
    কেবলা ঘুরে রয়।

আমাদের প্রিয় নবী ॥ মা ন সু র মু জা ম্মি ল

আমাদের প্রিয় নবী
প্রিয় তাঁর নাম
তাঁকে চেনে ফুল পাখি
দুনিয়া তামাম।

আমাদের প্রিয় নবী
সকলের প্রিয়
নবীজীকে কাছে পেলে
বুকে তুলে নিয়ো।

www.bjilibrary.com

আমাদের প্রিয় নবী–
সুপারিশকারী
পরকালে লিখে দেবেন
দামী ফ্লাটবাড়ি।

আমাদের প্রিয় নবী
কোরানের আলো
পৃথিবীতে এসে নবী
খুব চমকালো।

আমাদের প্রিয় নবী
খুব ভালো লোক
তাঁর সাথে ক্ষণে ক্ষণে
মোর দেখা হোক!

তোমার কথা রাখতে পারিনি ॥ সো হ রা ব আ সা দ

আমার ক্রমাগত বিশ্বাসভঙ্গতার জন্য
কষ্ট পেয়েছো খুব, বেদনায় হয়েছো নীলকণ্ঠ?
ওই অধরা আকাশটার মত তোমার ঔদার্যে
বিস্ময়ে-বিমুগ্ধ আমি।
আবার সাহসে হাত বাড়াই তোমাকে ছোঁবো বলে।
মুক্তোর চেয়েও প্রোজ্জ্বল কী তৃপ্তির হাসি,
রাগ কিংবা বিরক্তি নেই এক তিল!

দীর্ঘ মরুপথ বেয়ে শ্রান্তিতে একটুও হয়নি ম্লান স্বর্গীয় স্মিতি!
শুভ্র স্বেদবিন্দুর আবেশী সৌরভে পরম তৃপ্ত আমি।
খুরমার বন আর বণিকের উটের সারিও দাঁড়িয়ে যায়
দ্যুতিময় সৌম্য-শান্ত আলোর আভায়।
সালাম জানায় ঊষর মরুর নিরক্ষর বেদুঈন।

আত্মার নিলয়ে লুকানো সব প্রেম উজাড় করে
তোমার নি:শ্বাসের অনাঘ্রাত খোশবুর সাথে অবলীলায়

www.bjilibrary.com

মিশে যেতে আকুতি জানালাম।
দেহের সব শক্তি পুঞ্জীভূত করে চিৎকার দিয়ে বলেছি,
এই যে আমি! শুধু তোমারই সেই আমি।

এই দূরান্তের বিরান ভূমি থেকে
আমার ক্ষীণ কণ্ঠের মিনতি ব্যর্থ আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত
হয়ে আছড়ে পড়ে ইথারের কার্নিসে। এর একটি
শব্দ কণাও কি পৌছেনি তোমার কানে?
কি করে পৌছাবে? আমি যে পায়ে পায়ে বিশ্বাসভঙ্গ করেছি প্রিয়!
আমি সেই ক্লান্ত নি:সঙ্গ মুসাফির।
একাই ফিরে যাচ্ছি।

দীর্ঘ সফরে রসদ বলতে নেই কিছুই।
তুমি ছাড়া কে আছে এই অধমের আর্তি শোনার?
কেই বা আছে এমন দু:খ ভোলানিয়া অনুপম প্রেমময় মহাপুরুষ?

বিরল শিশু ॥ মো: ক বি রু জ্জা মা ন

খোদার প্রিয় রাসূল সে যে আমার
প্রিয় নেতা। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীজি ধরার
মানে বিশ্বাসীরা। মায়ের কোলেই তাঁর
ছিল বিরল আচরণ। দুধমাতার–
একটি দুধ তিনি করেন সদা পান।
অন্যটি দুধভাইয়ের সমানে সমান।
মরুচারী হালিমা ভীষণ অসহায়,
মেষ পালে দুধ নেই, ফল নেই গাছে
সংসারে অনটন দু:খ না যায়।
ছুটলেন শহরে পালক শিশুর খোঁজে।
সবে পেল সবৎস দামী উপহার
ভাগ্যে জোটে অনাথ শিশু মা হালিমার।
ঘরে ফিরে দেখলেন এ কি আচানক!
গাছে, মেষে ফল আর দুধের চমক।

www.bjilibrary.com

মুহাম্মদ [সা] ॥ সো হে ল ম ল্লি ক

পৃথিবীর তাবৎ সমস্যার অব্যর্থ দাওয়াই
অনেক আগেই তৈরী যা হেরার গুহায়
তবু কানা ছুটে চলে হনলুলে-হাওয়াই
বোঝে না, মুহাম্মদ একমাত্র অসহায়।

শান্তির খোঁজে দূরে যাবার দরকার নাই
হৃৎপিণ্ডের শব্দ ও ধ্বনিতে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে
যদি বলি মুহাম্মদ সালাম জানাই
মনের আজাব যায় নিভে এক লহমায়।

রাসূল [সা] ॥ শ হী দ সি রা জী

তিনি ছিলেন সবার আপন, আপন ছিলেন খোদার কাছে
সাথীরা তাঁর থাকতো কাছে বাসতো ভাল নিজের চেয়ে
শুনতো কথা নির্দ্বিধায় ভাবতো তাঁকে আপন স্বজন
হাসলে তিনি হাসতো সবাই কাঁদতো সবাই তাঁরই দুখে
খোদার ভয়ে ভীত তারা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতেন
পায়ে পায়ে চলতো সবাই পথে পথে তাঁরই সাথে।

পরশ পাথর ছিলেন তিনি সাথীরা তাই সোনা হলো
খোলাফায়ে রাশেদাতে ফললো সোনা পৃথিবীতে
রমণীরা নির্ভাবনায় চললো হেঁটে নগরপথে
সাথীরা তাঁর শাসক হয়ে আটার বোঝা মাথায় নিয়ে
নিরন্নদের খাবার দিলেন দুখীর দ্বারে ঘুরে ঘুরে
শহর নগর জনপথে খোদার শাসন হলো কায়েম।

আল আমিন আস সাদিক সব রাসূলের সেরা ছিলেন
সারা জীবন অবিকলই কুরআন পাকের মত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক মুহাম্মাদ [সা]

মুহাম্মদ রেজাউল করিম

হযরত মুহাম্মাদ [সা] এসেছিলেন মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে যার আগমনে এ ধরা মুগ্ধ, অন্ধকার-অমানিশা পেরিয়ে আলোরশ্মি প্রস্ফুটিত, বিশ্বজাহানের প্রতিটি জনপদ মুগ্ধ যার ছোঁয়ায়। অসভ্য মানুষগুলো হয়েছিল সভ্য। শত্রু হল আপন বন্ধু। নাঙ্গা তলোয়ার চুম্বন করল রাসূলের [সা] পদযুগল। অপরাধী স্বীকৃতি দিল তার পাপের, এ যেন এক দারুণ পরিবর্তন! কারণ মানুষ যখনি বুঝতে পারল মুহাম্মাদ [সা] মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য একজন সাহসী যোদ্ধা, নিঃস্বার্থ পথিক, লোভ-লালসামুক্ত পথপ্রদর্শক, আর তখনই তারা জীবন বাজি রেখে সে আদর্শের দিকে ছুটে গেল। সে আদর্শের সুঘ্রাণে মোহিত হয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সমবেত হলো ইসলামের সুমহান পতাকাতলে। এই মহান আদর্শ তাদের অন্তঃকরণকে করেছে শাণিত। জীবন দিতে হয়েছে পাগলপারা। পার্থিবতা হলো মূল্যহীন। ত্যাগে খুঁজে পেল সুখ। অধিকার রক্ষা করা হলো দায়িত্ব। লোহার আকর্ষণে চুম্বক যেমন একমুখী, ঠিক তেমনি গোটা মানব সভ্যতা মুহাম্মাদ [সা]-মুখী হয়ে গেল। যে স্বীকার করলো সে আর ছাড়তে জানলো না, যে বুঝলো সে আর কখনও কেটে পড়ল না। কারণ সেই অসভ্য উচ্ছৃঙ্খল নির্যাতিত বনি

www.bjilibrary.com

আদমগুলো ফিরে পেয়েছে তাদের অধিকার ও মর্যাদা। নারী-পুরুষ, মনিব-ভৃত্য, মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরীব, আরব-অনারব, বন্দী-স্বাধীন, ছোট-বড়, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী– এক কথায় প্রত্যেকেই বুঝে পেয়েছে তাদের স্ব স্ব অধিকার। এভাবে কেটে যেতে শুরু করে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। সোনার পরশে মুগ্ধ হলেন আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী [রা]-সহ অনেকেই যাঁরা রাসূলের [সা] ইন্তিকালের পরেও সমাজ ও সভ্যতার প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

'মহানবী মুহাম্মাদ [সা] কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লব ছিল একটি প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা দিল্লী থেকে গ্রানাডা এবং দুনিয়া থেকে আসমান পর্যন্ত যে অমানবতা ও অসত্যের আবর্জনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা চোখের নিমিষে পুড়ে ছারখার করে দিল।' জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর "Getting Maried" গ্রন্থে লিখেছেন, 'যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোনো নায়কের শাসনাধীনে আনীত হতো, তা একমাত্র মুহাম্মাদই [সা] সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।'

ঐতিহাসিক ড. গ্রেফটাউলি লিখেছেন, "ইসলামের যে উম্মী নবীর ইতিবৃত্ত বহু আশাজনক। তৎকালের কোনো বৃহৎ শক্তি যে জাতিকে নিজের আওতায় আনতে পারেনি, সে উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে তিনি তাঁর আওতায় বশীভূত করেছেন।"

Ernold Twinoby বলেছেন, মুহাম্মাদ [সা] ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ ও শ্রেণীগত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিয়েছেন। কোনো ধর্মই এর চেয়ে বড় সাফল্য লাভ করতে পারেনি যে সাফল্য মুহাম্মাদ [সা]-এর ধর্মের ভাগ্যে জুটেছে। আজকের বিশ্ব যার অভাবে অশ্রুপাত করছে সে অভাব কেবল মুহাম্মদী সাম্য নীতির মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ, গোত্র ও শ্রেণীগত পার্থক্যকে চূর্ণ করে একমাত্র মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মূল্যায়ন একমাত্র তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন।

আজ অবধি মানুষ যতটুকু অধিকার পাচ্ছে, এটি তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। আজ দুর্ভাগ্য এই জাতির, সমাজে অধিকার সংরক্ষণের চেয়ে হরণকারীর সংখ্যাই বেশি, অথচ আল্লাহ এক মহান দায়িত্ব দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মানব সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" বলতে কোনো দ্বিধা নেই আজ আমাদের মাঝে প্রতি বছর সীরাতুন্নবী [সা] আসে। রাসূল [সা]-এর শানে ওয়াজ-মাহফিল, আলোচনা সভা, জলসে জৌলুস, সিম্পোজিয়াম-সেমিনার- এর সংখ্যা মোটেই কম নয়। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রের উঁচু থেকে শুরু করে সমাজের নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে এই মহামানবের আদর্শ শুনি বা আলোচনা করি। কিন্তু ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার কয়জনই বা করছি? এই কাজটি করতে গেলেই হতে হয় নিঃস্বার্থ, ত্যাগী; জাগরূক

www.bjilibrary.com

থাকতে হয় অন্তরে সর্বদা খোদাভীতি ও মানবতাবোধ। কিন্তু আমরা তো তার উর্ধ্বে উঠতে পারছি না। পারছি না দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, নিজকরণের শিকলমুক্ত হতে। অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার স্লোগান যতটা না সহজ কাজে বাস্তবায়ন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত বিচারক

রাসূল [সা] পৃথিবীর কোনো মানুষের মনোনীত বিচারক ছিলেন না বরং স্বয়ং আহকামুল হাকিমীন কর্তৃক মনোনীত ছিলেন। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "[হে নবী!] আমি সত্যসহকারে আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহর দেখানো যুক্তির আলোকে বিচার ফায়সালা করতে পারেন।" [সূরা আন নিসা-২০৫] "[হে নবী!] বলুন, আমি আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" [সূরা শূ'রা-১৫] "অতএব, হে নবী, আপনার রবের কসম, তারা কখনই মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের ঝগড়া-বিবাদে আপনাকে বিচারক মানবে এবং আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি মনে কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচ না রেখেই সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নেবে।" [সূরা আন নিসা-৬৪]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল [সা] আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত বিচারক ছিলেন। আর বিচারক রিসালাত থেকে আলাদা ছিল না, তাই রাসূল করীম [সা]-কে বিচারক হিসেবে না মানা মু'মিনের কাজ নয়, বরং তা মুনাফিকের কাজ। আল্লাহ্ বলেন, "যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর নাযিল করা কিতাব ও রাসূলের দিকে এসো, তখন দেখবে যে, মুনাফিকরা তোমার থেকে কেটে পড়ছে।" [সূরা আন নিসা-৬১]

সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবিদ মুহাম্মাদ [সা]

বিশ্বের কোনো মানুষের গড়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বরং পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যিনি কথা ও কাজের পার্থক্য করেননি, তিনি হলেন আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা এমন কথা বল না যা নিজে কর না।" রাসূল [সা] বলেন, "আমি তোমাদের মাঝে শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি" [আল হাদিস]। তিনি অসভ্য আরব জাতির মনের আদালতে এমনই বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যার ফলে মহানবীই প্রথম 'আল-আমীন' উপাধিটি লাভ করেন। তখনও তিনি নবী হননি, অতি সাধারণ মানুষ বেশেই সকল মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় ন্যায় বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। এই কথা সত্য যে, তিনি যদি নবী নাও হতেন তাহলেও তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হতেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন অনুকরণীয় মানব। তখন যদিও তাঁর কাছে আপন কোনো আদর্শ ছিল না। আর নবুয়্যত-পরবর্তী এই মানুষটিই বিশ্বের দরবারে মহান বিচারক হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়েছেন যিনি ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতিটি অধ্যায়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। মহানবী বলেন, ৬৫ বছরের নফল ইবাদত অপেক্ষা একটি ন্যায়বিচার শ্রেষ্ঠ।

www.bjilibrary.com

বিচারকের দায়িত্ব পালনের নীতিমালা

বিচারক সব মানুষের সাথে সমান ব্যবহার করবেন।

সাক্ষ্য-প্রমাণের দায়িত্ব সাধারণত বাদীর ওপরে।

বিবাদীর যদি কোনো প্রকার সাফাই বা প্রমাণ না থাকে তবে তাকে শপথ করতে হবে।

মুকাদ্দামা ফয়সালা করার পর বিচারক ইচ্ছে করলে তা পুন:বিবেচনা করতে পারবেন।

প্রত্যেক মুসলিমের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর সাক্ষ্য গৃহিত হবে না।

আলী [রা]-এর অতিরিক্ত নীতিমালা হলো–

জটিল কিংবা সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের কখনই মেজাজের ভারসাম্য হরানো উচিত নয়।

যখন বিচারক নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন যে, প্রদত্ত রায় ভুল হয়েছে তা সংশোধন করা কিংবা সে রায় বদলে দেয়া তাদের পক্ষে মোটেও মর্যাদাহানিকর ভাবা উচিত নয়।

বিচারক লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন হতে পারবেন না।

বিচারক অবশ্যই যুক্তি প্রমাণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। মামলাকারীর ওপর দীর্ঘ কৈফিয়তে অধৈর্য হবেন না। সত্য ও মিথ্যা উপনীত হবার কাজে অবশ্যই ধীরস্থির হতে হবে।

যাদের প্রশংসা হলে আত্মদর্পী হয়ে ওঠে, যারা তোষামোদে গলে যায়, চাটুকারিতায় ও প্ররোচনায় বিপথগামী হয় তাদের মধ্যে কারো বিচারক হওয়া উচিত নয়।

রাসূল [সা] সুস্থ মস্তিষ্কে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, যাতে কোনো পক্ষের প্রতি অবিচার না হয়। তিনি বলতেন, "রাগান্বিত অবস্থায় যেন কোনো বিচারক দু'জন বিবদমানের মধ্যে ফয়সালা না করেন" [বুখারী] হযরত বুরাইদা [রা] বলেন, "রাসূল [সা] বলেছেন, বিচারক তিন প্রকার– এক প্রকার জান্নাতি আর দু'প্রকার জাহান্নামী। জান্নাতি তিনি যিনি সত্য অবগত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যায় ফয়সালা দান করেন বা সত্য না জেনে আন্দাজের ওপরে বিচারকার্য পরিচালনা করেন, তারা উভয়ই জাহান্নামী।

মুকুটবিহীন সম্রাট

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি শুধু মুসলমানদেরই স্বীকৃত কোনো নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের একমাত্র পথ প্রদর্শক। স্থান-কাল-বর্ণ-গোত্র কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কেমন– এটা শুধু তাঁকে দিয়েই মূল্যায়ন করা সম্ভব। তাই এই নিরক্ষর মহামানবের সম্পর্কে বিশ্বের মহাজ্ঞানীরা যেসব মন্তব্য করেছেন তা আরো বিস্ময়কর!

www.bjilibrary.com

১৯৭৮ সালে আমেরিকায় 'The Hundred Ranking of the most influential persons in history' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ গ্রন্থটির প্রণেতা আমেরিকার MVH. Heart নিজে খ্রিস্টান, তাই হযরত ঈশা [আ]-এর নাম সর্বাগ্রে থাকার কথা। কিন্তু তা না করে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন মুহাম্মদ [সা]-কে। তার কারণ সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, 'He was the only successful on both the religion and secular levels.' অর্থাৎ তিনিই একমাত্র ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় দিক দিয়েই কৃতকার্য।

মাইকেল হার্ট ছিলেন পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় মনীষী। তার অসংখ্য ভক্ত ছিল। গ্রন্থটি প্রকাশের পর অনেকে তাকে এ বলে চিঠি লিখেছিল, 'মাইকেল, তুমি পাগল হলে নাকি যে, ইসলামের নবী মুহাম্মাদ [সা]-কে তোমার বইয়ে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছ?' উত্তরে মাইকেল হার্ট লিখলেন, 'প্রিয় বন্ধুরা, আসলে আমি পাগল হইনি; যাঁর নাম আমি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি সমগ্র পৃথিবী তাঁর জন্য পাগল হয়েছে।'

ন্যায় বিচারকের নীতিমালা

দেশ শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করা একটি মহান দায়িত্ব। ন্যায় বিচারের সাথে এই দায়িত্ব পালন করলে তা হবে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করা। কারণ ন্যায় বিচার আল্লাহ্ তা'আলার একটি মহান গুণ। আর ন্যায় বিচার না করলে তা হবে শয়তানের প্রতিনিধিত্ব। কারণ শাসক ও বিচারকের অবিচার অপেক্ষা মানুষের জন্য অধিক অনিষ্টকর আর কিছু নেই।

ন্যায় বিচারের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হলে শাসক ও বিচারককে প্রথমেই অনুধাবন করতে হবে যে, শাসক ও বিচারকের দায়িত্ব লাভ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তার ওপর বিশেষ অনুগ্রহ, কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যু বা অন্য কোনো অবশ্যম্ভাবী কারণে তা যে কোনো সময় চলে যায়। আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার আদালতে আসামী হয়ে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। পৃথিবীর অস্থায়ী জীবনে ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতার দাপটে কারো ওপর অন্যায়-অবিচার করে থাকলে আখিরাতের জীবনে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সুতরাং দুনিয়ার জীবনে এমন কোনো কাজ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যার ফলাফল হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। পৃথিবীতে বিচারের দণ্ড যাদের হাতে এমন শাসক, বিচারক ও সমাজপতিদের উপলব্ধি করতে হবে, ন্যায়নিষ্ঠ ও ইনসাফের সাথে বিচার না করা হলে মৃত্যুর মাধ্যমে আখিরাতের জীবনে প্রবেশের সাথে সাথে এর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। অপরদিকে ন্যায়দণ্ড প্রদানকারী শাসক ও বিচারকের জন্য রয়েছে অগণিত পুণ্য ও সওয়াব।

মহানবী [সা] বলেন, "শাসকের একদিনের ন্যায় বিচার একাধারে ষাট বছরের ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" যে সাত শ্রেণীর ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের ছায়ায় অবস্থান করবেন, তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ন্যায় বিচারকারী শাসক। নবী করীম [সা]

www.bjilibrary.com

আরো বলেছেন, "সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ন্যায় বিচারকারী শাসকের জন্য সমস্ত প্রজার আমলের সমপরিমাণ আমল প্রত্যহ ফেরেস্তাগণ আসমানে নিয়ে যায় এবং তার এক নামায সত্তর হাজার নামাযের সমান।" তিনি অন্যত্র বলেছেন, "ন্যায় বিচারকারী শাসক আল্লাহর প্রতি নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বড় বন্ধু, আর অত্যাচারী শাসক আল্লাহর কঠোর শাস্তি ভোগের উপযোগী ও তার বড় শত্রু।" অর্থাৎ অত্যাচারী শাসক ও বিচারকের শাস্তি যেমন ভয়াবহ, ন্যায় বিচারকারী শাসক ও বিচারকের পুরস্কারও তত বেশি।

একজন প্রশাসক বা বিচারকের পক্ষে ন্যায় বিচার করা তখনই সম্ভব, যখন তিনি মনে করবেন যে, তিনি নিজেই বিচারপ্রার্থী, অন্য কেউ বিচারক। এই মোকাদ্দমায় তিনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন না, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করবেন না। এই মনোভাব যার মধ্যে নেই, তিনি প্রকৃত মু'মিন নন। নবী করীম [সা] বলেন, "যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তার উচিত নিজের জন্য যা পছন্দ করে না তা অপর মুসলমানের জন্য পছন্দ না করা।"

একজন প্রশাসক বা বিচারকের কাছে বিচার কাজের চেয়ে জরুরি আর কোনো কাজ নেই, এমন কি নফল ইবাদতও না। বিচার কাজ বিলম্বিত করা মানে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বিলম্বিত করা। একজনের অভাব-অভিযোগ মীমাংসার চেয়ে উত্তম আর কোনো কাজ নেই। ন্যায়পরায়ণ শাসকের লক্ষণ হচ্ছে বিচার কাজে বিলম্ব না করা, কাউকে ঘরের দরজায় অপেক্ষায় বসিয়ে না রাখা।

নবী করীম [সা] বলেছেন, "কেউ তোমাদের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হলে তার প্রতি অনুগ্রহ করবে, বিচারপ্রার্থী হলে ন্যায় বিচার করবে, অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করবে। যে ব্যক্তি এগুলো করে না, তার প্রতি আল্লাহর ফেরেস্তাদের ও সকলের অভিশাপ বর্ষিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তার ফরজ, সুন্নাত, কোনো ইবাদতই কবুল করেন না।" এ হাদিস থেকে শাসক-বিচারকদের ভেবে দেখা উচিত তাদের দায়িত্ব কতো গুরুত্বপূর্ণ ও কতো কঠিন! এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন বিচার করবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে।" ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে মহানবী [সা] বলেছেন, "যে ব্যক্তি দু'জন লোকের বিচার করে, আর এতে অন্যায় করে, তার ওপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হয়।"

নবী করিম [সা] আরো বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর দরবারে শাসকদের হাজির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, ঐ ব্যক্তিকে আমার বিধানের অতিরিক্ত শাস্তি কেন দিলে? তারা বলবে, সে তোমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল বলে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাকে বেশি শাস্তি দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের ক্রোধ কি আমার ক্রোধের চেয়ে বেশি? আরেক দল শাসককে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, ঐ ব্যক্তিকে আমার বিধান অপেক্ষা কম শাস্তি দিলে কেন? তারা বলবে, আমরা তাদের প্রতি দয়া করেছিলাম। আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার অপেক্ষা অধিক দয়ালু ছিলে? অতঃপর অধিক ও কম শাস্তিদাতাদেরকে ধরা হবে, জাহান্নামের কোণসমূহ তাদের দ্বারা পূরণ করা হবে।"

www.bjilibrary.com

পরকালে আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পা পাওয়ার জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি বিচারকের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওহে! যারা ঈমান এনেছ তোমরা দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকবে ন্যায় বিচারে আল্লাহর সাক্ষীরূপে, যদিও তা হয় তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে, যদিও সে বিত্তবান হয় অথবা বিত্তহীন হয়– আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। অতএব, তোমরা খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে না ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ তো পূর্ণ খবর রাখেন।"

হযরত উমর [রা] বলেছেন, "মহাবিচারক আল্লাহর পক্ষ হতে পৃথিবীর শাসকদের যে দুর্গতি ঘটবে তা বড়ই আফসোসের বিষয়। কিন্তু যারা সুবিচার করেছে, নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো রায় প্রদান করেনি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেনি, ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো হুকুমের পরিবর্তন করেনি, বরং আল্লাহর কিতাবকে দর্পণের ন্যায় সামনে রেখে তদনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেছে তাদের কোনো দুর্গতি হবে না।"

ইনসাফভিত্তিক ফয়সালার জন্য প্রয়োজন কতগুলো মৌলিক নীতিমালার অনুসরণ। সে ক্ষেত্রে রাসূল [সা] উজ্জ্বল ভাস্বর যিনি ছিলেন আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি ও বেইনসাফীর উর্ধ্বে। একদা এক মহিলাকে চুরির দায়ে হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন তার বংশীয় আভিজাত্যের দিকে তাকিয়ে অনেকে আল্লাহর রাসূলের নিকট মহিলার পক্ষে সুপারিশ করেছে, তখনই তিনি ঘোষণা দেন, "আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে তাহলে নির্দ্বিধায় চুরির শাস্তি হিসেবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"

বিচারকার্যের মূল ভিত্তি

বিচারকার্য পরিচালনার মূলভিত্তি ও উপায়-উপকরণ হচ্ছে প্রথমত আল কুরআন। এরপর সুন্নাহ এবং সর্বশেষে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ ফয়সালা। "হযরত মু'আয ইবনে জাবাল [রা] হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ [সা] যখন তাকে ইয়েমেনে পাঠালেন, তখন বললেন, কিভাবে তুমি বিচার-আচার করবে? মু'আয [রা] বললেন, আল কুরআনের ফয়সালা অনুসারে। হুযুর [সা] বললেন, যদি ঐ বিষয়ে আল কুরআনে কোনো ফয়সালা খুঁজে না পাও? মু'আয [রা] বললেন, সুন্নাহ দ্বারা। হুযুর [সা] বললেন, যদি তাতেও না পাও? তিনি বললেন, আমার ইজতিহাদ দ্বারা এবং এতে কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা দেখাবো না। এরপর নবী করীম [সা] হযরত মু'আযের বুকে হাত রেখে বললেন, প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন ক্ষমতা দান করলেন যাতে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট।" [তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী] নবী করিম [সা]-এর বিচারকার্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার করার সময় বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের কথাবার্তা যথাযথ শুনে এবং তার পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে ফয়সালা প্রদান করা। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা না করা সম্পর্কে নবী করিম [সা] কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা [রা] বলেন,

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন বিচারকের সাথে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ তিনি বিচারকার্যে জুলুম-অত্যাচারের উর্ধ্বে থাকে। যখন তিনি জুলুম ও বে-ইনসাফী করেন তখনই আল্লাহ তার থেকে পৃথক হয়ে যান এবং শয়তান এসে তার সাথী হয়ে যায়।" [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

"হযরত আয়েশা [রা] রাসূলুল্লাহ [সা] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ন্যায় বিচারক কিয়ামতের দিন এই আকাঙ্ক্ষা করবেন যে, দু'ব্যক্তির মধ্যে সামান্য খেজুরের ফয়সালাও যদি তাকে পৃথিবীতে না করতে হতো, তবে কতই না ভাল হত!" [মুসনাদে আহমদ]

যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী [সা]

মহানবী [সা] ২৪ বছরের নবুয়্যতী জিন্দেগীতে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেছেন। ২৭টিতে তিনি সরাসরি সেনা নায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সকল যুদ্ধের প্রতিটি করেছেন মানবতার কল্যাণে। তায়েফের ময়দানের ঘটনাসহ শত শত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর জীবনে খুঁজে পাই। কাফেরদের পাথরের আঘাতে তিনি যখন রক্তাক্ত হলেন সেই মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাইল [আ] এসে কাফেরদের ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। এই মহামানবের মুখ থেকে তখনও বের হলো না তাদেরকে ধ্বংস করে দাও, বরং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, "তারা ধ্বংস হলে আমি ইসলামের দাওয়াত কাদের কাছে পৌছাবো?"

জীবনের কঠিন মুহূর্ত হল যুদ্ধক্ষেত্র, অথচ সেখানে তিনি ছিলেন মানবতার কল্যাণে মগ্ন। হিংসা-বিদ্বেষ কোনো কিছুই তাঁকে উত্তেজিত করতে পারেনি। আধিপত্য বিস্তার বা রাজ্য দখল তাঁর মূলনীতি ছিল না। দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। জনগণকে অত্যাচার, নির্যাতন থেকে বাঁচানোই ছিল তাঁর পেরেশানী। সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, "কোনো বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করবে না। মালে গনীমত আত্মসাৎ করবে না।" মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নির্দেশ দেন, "আহত ব্যক্তির ওপর হামলা চালাবে না, পলায়নরত ব্যক্তির পিছু ছুটবে না, যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে তাকে কিছু বলবে না।" তিনি আরও বলেন, "সন্ন্যাসীদের কষ্ট দিবে না এবং উপাসনালয় ভাঙবে না, ফলবান গাছ ও ফসল নষ্ট করবে না অযথা পশু হত্যা করবে না।"

যারা আজকে এই অভিযোগ তোলে যে, ইসলাম থেকে রক্তের গন্ধ পাওয়া যায়, সামগ্রিকভাবে রাসূল [সা]-এর জীবনকে পর্যালোচনা করলে তাদের এই অভিযোগ ধোপে টেকে না। বদর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত [খায়বারসহ] মোট পাঁচটি বড় আকারের যুদ্ধ হয়েছে। রাসূল [সা] শিক্ষা, প্রচার, গঠন ও সংস্কারমূলক কাজে মোট ২৩ বছর সময় কাটিয়েছেন। এর মধ্যে সব ক'টা যুদ্ধে সর্বমোট ১৫ হাজারের চেয়ে বেশি লোক রাসূল [সা]-এর মোকাবিলায় আসেনি। আর মাত্র ৭৫৯ জনের জীবনকে পথ থেকে সরানোর মাধ্যমে আরবেব লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণ শুধরে গেছে। এত অল্প সময়ে আরবের ন্যায় মরুভূমিকে মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে চরম উচ্ছৃংখল, হিংস্র দাঙ্গাবাজ মানুষখেকো গোত্র

www.bjilibrary.com

ও ব্যক্তিবর্গকে একটি নৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত করা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত।

বিশ্বে ন্যায় বিচারের ধারণা

সরোজিনি নাইডু অভিমত প্রকাশ করেন, "ইসলামের সর্বাপেক্ষা চমৎকার আদর্শসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এর ন্যায় বিচার সম্পর্কিত ধারণা। কারণ কুরআন পাঠকালে আমি লক্ষ্য করেছি যে, মুসলমানদের জীবনের গতিশীল মূলনীতিসমূহ রহস্যাবৃত নয়, বরং সে সকল বাস্তব নীতি সারা বিশ্বে প্রাত্যহিক জীবনে পরিচালিত আচরণসমূহের উপযোগী।" [সরোজিনি নাইডু : লেকচার অন "দি আইডিয়ালস অব ইসলাম", স্পিচেস এন্ড রাইটিংস অব সরোজিনি নাইডু, মাদ্রাজ ১৯১৮, পৃ. ১৬৭]

গণতন্ত্র শিক্ষা দানকারী ও চর্চাকারী প্রথম ধর্ম

সরোজিনি নাইডু আরো বলেন, "এটি ছিল গণতন্ত্র শিক্ষাদানকারী এবং গণতন্ত্র চর্চাকারী প্রথম ধর্ম। কারণ মসজিদের মিনার থেকে যখন আহ্বান উচ্চারিত হয় এবং উপাসনাকারিগণ সমবেত হয় তখন, রাজা ও প্রজা যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মাথা নত করে এবং "একমাত্র আল্লাহ্ মহান" এই বাক্যটি ঘোষণা করে, তখন দিনে পাঁচবার ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের যোগসূত্র রচিত হয়। আমি বারবার ইসলামের সেই অবিভাজ্য ঐক্য লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছি, যেটির মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে সুস্পষ্টরূপে একজন ভ্রাতায় পরিণত করেছে। যখন আপনি লন্ডনে একজন মিশরীয়, একজন আলজেরিয়ান, একজন ভারতীয় ও একজন তুর্কি ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হবেন, দেখবেন কারো মাতৃভূমি ছিল মিশরে এবং কারো মাতৃভূমি ছিল ভারতে তাতে কিছুই আসে যাবে না।" [প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯]

ঐতিহাসিকগণের রূপকথার ন্যায় অসম্ভব কল্পকাহিনী নয়

ডি লেসি ও'লিয়েরী লেখেন, "কিন্তু, ইতিহাস এটি পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করেছে যে, ধর্মোন্মাদ মুসলমানগণ কর্তৃক পৃথিবীব্যাপী অভিযান পরিচালনা করার কাহিনী এবং বিজিত জাতিগণকে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার বিষয়টি রূপকথার ন্যায় সর্বাপেক্ষা অসম্ভব কল্পকাহিনী। ঐতিহাসিকগণ কখনো এই কল্পকাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেননি।" [ডি লেসি ও'লিয়েরী : ইসলাম এট দি ক্রুসেরোডস, লন্ডন ১৯২৩, পৃ. ৮]

খ্রিস্টান জাতিকে লজ্জিত করে

ই.আলেকজান্ডার পাওয়েল বর্ণনা করেন, "কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ের পর মুসলমানগণ যে পরিমাণে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা খ্রিস্টান জাতিসমূহকে লজ্জিত করে।" [ই. আলেকজাণ্ডার পাওয়েল : দি স্ট্রাগল ফর পাওয়ার ইন মুসলিম এশিয়া, নিউ ইয়র্ক ১৯২৩, পৃ. ৪৮]

জে.এম. রবার্টসন লিখেন, "প্রাথমিক যুগের ইসলামের তুলনায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের অধীনে অবশ্যই অধিকতর নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়েছিল। খলিফা আবু বকর [রা] তাঁর অনুসারিগণের প্রতি ৩টি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন : ন্যায়পরায়ণ হবে, পরাজয়বরণ

www.bjilibrary.com

করার পরিবর্তে বরং মৃত্যুবরণ করবে, দয়ালু হবে, বৃদ্ধ, শিশু ও নারিগণকে হত্যা করবে না। ফলবান বৃক্ষ, শস্য ও গবাদিপশু বিনষ্ট করবে না। তোমরা শত্রুকে দেয়া প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করবে।" [জে.এম. রবার্টসন : এ শর্ট হিস্ট্রি অফ ক্রিস্টিয়ানিটি, পৃ. ৪]

কিন্তু আমাদের সমাজে আজ যারা উদার গণতন্ত্র আর মানবতাবোধের বুলি ছড়ান, তারাই বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাতে বছরের পর বছর আফগান, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনিয়া ও ভারতে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে, অথচ অতর্কিত আক্রমণ, আগুনে পোড়ানো, নির্যাতনপূর্বক হত্যা, লুটতরাজ, সম্পদ নষ্ট, লাশ বিকৃতিকরণকে রাসূল [সা] কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ছোট বড় সকল যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা হাজারের বেশি হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নেহায়েতই কম, অথচ এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ২৫০ কোটি মানুষের মধ্যে বণ্টন করলে প্রত্যেকে ৩০ হাজার করে টাকা পেতো। এ যুদ্ধে ৬ কোটি লোক নিহত হয়। হিরোশিমায় এটম বোমার বিস্ফোরণে ১০ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বলেছিলেন, যদি যিশুখৃস্ট এই পৃথিবীতে আবার আগমন করতেন তবে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারতেন না। এজন্য একজন ইংরেজ কবি বিজ্ঞানের মারণাস্ত্র আবিষ্কার সম্পর্কে বলেছেন– Falcon can't hear the falconer. তাহলে একথা সত্য যে, রাসূল [সা]-এর যুদ্ধনীতিও ছিল মানবতার কল্যাণে। কোনো ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও কোনো বে-ইনসাফি তাঁকে অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ গোটা বিশ্বের যুদ্ধনীতি আজ এর বিপরীত।

সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

রাসূল [সা] সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার সংরক্ষণে ছিলেন এক আপসহীন যোদ্ধা। আর আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশই ছিল তাঁর মানদণ্ড। আল্লাহ বলেন, "তোমরা দুঃপ্রবৃত্তির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না।" [সূরা নিসা-১৩৫] তিনি আরও বলেন, "বিচারে কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করো না।" এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে তিনি একটি অসাম্প্রদায়িক বিশ্বের ভিত নির্মাণ করেছেন, যার প্রমাণ একদা একজন ইহুদী আল্লাহর রাসূলের [সা] কাছে একজন সাহাবীর ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি অবৈধভাবে সাহাবীর পক্ষে রায় না দিয়ে ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি অমুসলিম নাগরিকের ওপর অত্যাচার করবে অথবা তার অধিকার হরণ করবে অথবা তার সম্মতি ব্যতীত জোরপূর্বক কোনো জিনিস ছিনিয়ে নেবে, আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে অমুসলিমের পক্ষে উকিল হয়ে দাঁড়াবো।" [আবু দাউদ] তিনি ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিমকে হত্যা করবে তার জন্য বেহেস্ত হারাম।" অথচ বর্তমান বিশ্বের সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত। বিশ্ব সভ্যতার দেশ আমেরিকার নিগ্রোরা আজও সাদা আদমীদের সমান অধিকার পায়নি। তাদের জন্য আলাদা স্কুল-কলেজ ও কর্মক্ষেত্র। শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে লেখা আছে নিগ্রো ও কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের সংঘাত দীর্ঘ দিনের। ভারত আজ মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত। প্রত্যেক মুসলিম জনপদ

www.bjilibrary.com

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে রুদ্ধ। তাই একথা পরিষ্কার এ সকল কিছুর ইনসাফপূর্ণ সমাধান রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবন আদর্শেই রয়েছে।

ন্যায় বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ন্যায় বিচারের সর্বাপেক্ষা নাজুক স্তর হলো আপনজন, এমন কি নিজের ওপর বিনা দ্বিধায় ইনসাফের দণ্ড প্রয়োগ করে যাওয়া। একদিন রাসূল [সা] প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। এই সময় এক বৃদ্ধ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাকে সরাতে গিয়ে ছড়ির আঘাতে তার মুখমণ্ডলে সামান্য রক্ত বেরিয়ে পড়লো। রাসূল [সা] তখনি তাকে উঠিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" লোকটি লজ্জিত হয়ে নিবেদন করলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।" আজকের সমাজে নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকারকারীর সংখ্যা নেই বললেই চলে, অথচ রাসূল [সা]-এর যুগে প্রকাশ্য অপরাধে শুধু বিচারই করেননি, বরং অপরাধী নির্দ্বিধায় এসে নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দেয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এক যিনাকারিণী মহিলা রাসূল [সা]-এর কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।" এভাবে তিনবার বলার পর চতুর্থবার আল্লাহর রাসূল [সা] তার কথা শুনলেন। তখন মহিলা বললেন, "আমি অবৈধভাবে গর্ভবতী।" আল্লাহর রাসূল [সা] তাকে বাচ্চা প্রসব করার পর আসতে বললেন। এর পর উক্ত মহিলা আসলে তিনি বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর পর আসতে বললেন। নবী [সা]-এর কথামত ঐ মহিলা আসলে তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। তার এক ফোঁটা রক্ত খালেদ ইবনে অলিদ [রা]-এর গায়ের ওপর পড়লে খালেদ কটূক্তি করে বললেন, "একজন যিনাকারিণীর রক্ত আমার গায়ে পড়েছে!" এতে আল্লাহর রাসূল [সা]বললেন, "খালেদ, মুখ সামলিয়ে কথা বল। আল্লাহ তা'আলা উক্ত মহিলার তওবায় এত অধিক সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেও যদি ভাগ করে গোটা পৃথিবীর মধ্যে দেয়া হয় তাহলে শেষ হবে না।" আমীরুল মুমিনীন ওমর [রা] ও উবাই ইবনে কাবের [রা] মধ্যে কোনো এক বিষয়ে বিবাদ ঘটে। উবাই মদিনার বিচারক যায়িদ ইবনে সাবিতের [রা] নিকট মুকাদ্দামা দায়ের করেন। সমন পেয়ে ওমর [রা] আদালতে হাজির হন। আর একজন সাধারণ আসামীর মতোই আচরণ করা হয় তাঁর সঙ্গে।

মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের [রা] পুত্র কপ্ট সম্প্রদায়ের এক ছেলের গালে চড় লাগায়। বিচার চাওয়া হয় ওমরের [রা] নিকট। তিনি নির্দেশ দিলেন কপ্ট ছেলেটি গভর্নরের ছেলের গালে অনুরূপ চড় লাগাবে। কেউ কেউ আপত্তি তোলেন, ওমর [রা] বললেন, "কতকাল তোমরা মানুষকে গোলাম করে রাখতে চাও? তাদের মায়েরা তো তাদেরকে স্বাধীন মানুষরূপে জন্ম দিয়েছে!" আলীর [রা] শাসনকালে তার একটি হারিয়ে যাওয়া বর্ম এক ইয়াহূদীর কাছে পাওয়া যায়। আলী [রা] বিচারকের দ্বারস্থ হন। পুত্র ও গোলাম ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী হাজির করতে না পারায় বিচারক মামলা খারিজ করে দেন।

www.bjilibrary.com

খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদেরকে আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না। বিচারক নিযুক্ত করার দায়িত্ব পালন করতেন রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু বিচারকগণই ইনসাফের দাবি অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে নি:সঙ্কোচে রায় প্রদানের স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল [সা] শুধু তাঁর নব্যুয়তি জিন্দেগীতেই ইনসাফ কায়েম করেননি, বরং তাঁর গোটা জিন্দেগীই ছিল ন্যায় বিচারের মূর্ত প্রতীক, যার পরশে ওমরের মতো শ্রেষ্ঠ শাসক পৃথিবী অবলোকন করেছেন। এজন্য জনৈক সাবেক প্রেসিডেন্ট Justice of Conference-এ দু:খ করে বলেছেন, "আজ এই বিশাল অট্টালিকা ও A.C. রুমে বসে আমরা ন্যায় বিচার করতে পারছি না, অথচ হযরত ওমর [রা] গাছতলায় বসে ন্যায়ের শাসন কায়েম করেছিলেন। আমাদের সমাজে আজ বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে।"

উপসংহার

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায় বিচার দারুণভাবে উপেক্ষিত। মানুষের রচিত মনগড়া আইনের যাঁতাকলে মানবতা আজ ধুকে ধুকে মরছে। এর থেকে বাঁচতে হলে রাসূল [সা]-এর অনবদ্য জীবনের একটা বিশাল সমুদ্রে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে। কারণ একদা এখান থেকেই পৃথিবীর পথহারা, অচেতন, অর্ধচেতন, তৃষ্ণার্ত মানুষগুলো পেয়েছে পথের দিশা। প্রত্যেক মানুষই পেতে চায় তার অধিকার ও মর্যাদা। আর একমাত্র রাসূল [সা]-ই সমাজের প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানবরচিত জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছেন। মুহাম্মদ [সা]-এর অনুসারীরা তাঁর জীবদ্দশায়ই এ আদর্শকে ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন করে একটি সোনালী সমাজের ভিৎ নির্মাণ করেছেন। বহু শতাব্দী অতীত হয়ে যাওয়ার পরও আজকের এই সমাজ ও সভ্যতা যতটুকু অধিকার ভোগ করছে তা ইসলামেরই অবদান। তাই আজকে প্রয়োজন ন্যায়বান মানুষের যারা প্রত্যেকেই অধীনস্থদের অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবেন সচেষ্ট। এজন্য পৃথিবী আর একবার ওমরের মতো ন্যায়বান শাসকের প্রতীক্ষায় অধীর।■

www.bjilibrary.com

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে রাসূলের [সা] আদর্শ

জাফর আহমাদ

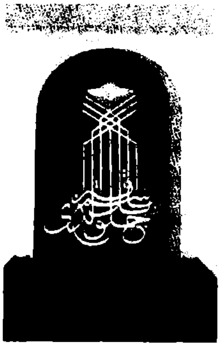

পৃথিবীর আদিকাল থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। মানুষ তাই প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক জীব। হাজারও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ একাকী বসবাস করতে স্বস্তিবোধ করে না। কিভাবে সমাজের উৎপত্তি সেটা বড় কথা নয়। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও সমাজ বিজ্ঞানিগণ যেটা মনে করেন সেটা হল, জীবিকা অর্জন ও জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজনেরই সেই আদিকাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন শুরু করেছে। সমাজ পরিবর্তনশীল। মূলত প্রতিনিয়তই সমাজে পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তনের ধারায় এই পর্যায়ে এসেছে বর্তমান সমাজ যাকে আমরা বলি আধুনিক সমাজ।

প্রকৃতপক্ষে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির ওপরই নির্ভরশীল মানব সমাজের সকল সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি। পূর্বের সমাজের তুলনায় বর্তমান সমাজে অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তথাপি নানাবিধ সামাজিক সমস্যা আমাদের জীবনকে করে তুলেছে জটিল ও সঙ্কটময় যার ফলে সমাজে বসবাসরত মানুষ নানাবিধ বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। নিরাশার কালো চাদরে মুখ লুকাচ্ছে সুখ ও শান্তি। সুখ ও শান্তি আজ যেন তাই কথিত সোনার হরিণ! যে সকল সামাজিক

www.bjilibrary.com

সমস্যা বা ব্যাধি আমাদের সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় তথা বাধার সৃষ্টি করছে, কেড়ে নিচ্ছে মানুষের সুখ-শান্তি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি তাদের মধ্যে প্রধান। বলা যায় এই দু'টোই সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে পশ্চাৎপদতার দু'টি বিন্দু। বর্তমান সমাজে সন্ত্রাস এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যার ফলে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে মানুষ। সন্ত্রাস যেমন চলছে ব্যক্তিগতভাবে, তেমনি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস দিন দিন বেড়েই চলেছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে গোটা দুনিয়ায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সন্ত্রাসের মাত্রা বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে একের পর এক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র দখল করে সেখানকার লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও অসহায় মানুষকে হত্যা করার দৃশ্য দেখে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। স্বার্থপর ক্ষমতালিপ্সু রাষ্ট্রপ্রধানের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে আরো বেড়ে গেছে এই নীল আতঙ্ক। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে মানুষ রীতিমত ভয়ে শিহরিত। দুর্নীতিও তেমনি সমাজের রন্ধ্রে এমনভাবে ঢুকেছে যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। দুর্নীতির কারণে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে আজ পুঞ্জীভূত হচ্ছে দেশের সম্পদ। আর বেশির ভাগ লোক দিন দিন নিঃস্ব থেকে হচ্ছে আরো নিঃস্ব। তাই বাংলাদেশসহ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি থেকে মুক্তি পেতে চায়– চায় রক্ষা পেতে। এজন্য মানুষ তার নিজের তৈরী অনেক মতবাদ কায়েম করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। কিন্তু ফল হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। সন্ত্রাস ও দুর্নীতি হ্রাস না পেয়ে তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই দুনিয়া ও তার ভেতর-বাইরে সব কিছুই যেহেতু মহান আল্লাহর সৃষ্টি, তাই মিথ্যা মরীচিকার পিছে না ছুটে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ পেতে হলে মানুষকে তার মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হতে হবে। আর এই চিরশাশ্বত পথ দেখিয়ে গেছেন নবী করীম [সা]। আল্লাহপাক বলেছেন, "তোমাদের জন্য রাসূলের [সা] জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" তাই নবী করীম [সা]-এর নির্দেশিত পথেই সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ কায়েম করা সম্ভব। তিনি [সা] সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুধু বক্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি, একটি কল্যাণময় ইসলামী সমাজ কায়েম করে দেখিয়ে গেছেন– এ ধরনের সমাজে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি কখনেই প্রশ্রয় পায় না।

এখন আলোচনা করে দেখা যাক, 'সন্ত্রাস' ও 'দুর্নীতি' প্রতিরোধে রাসূলের [সা] আদর্শ কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল এবং বর্তমানের অন্ধকার সমাজে কিরূপে প্রভাব ফেলতে পারে।

তৎকালীন সমাজচিত্র

মহানবী [সা] যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল একটি জাহেলি সমাজ। ইসলামী সমাজ কায়েম হবার পূর্ব পর্যন্ত এ জাহেলি সমাজে চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, রাহাজানি, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। রাজা ও সম্রাটদের জীবন যাত্রা ছিল বিলাসে পরিপূর্ণ। তাদের বিলাসী

www.bjilibrary.com

জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। আর এই অর্থের জোগান দিতে হতো জনসাধারণকে। তাদের ওপর ট্যাক্সের ওপর ট্যাক্স চাপানো হতো। ট্যাক্স আদায় করতে না পারলে তাদেরকে হতে হতো নিপীড়নের শিকার। রাষ্ট্রীয় তহবিল ছিল রাজা বা সম্রাটের তহবিল। জনগণের অধিকার এতে স্বীকৃত ছিল না। কোন রাজা বা সম্রাট জনগণের জন্য অর্থ ব্যয় করলে তা তার বিশেষ অনুগ্রহ বলে গণ্য হতো। রাজা বা সম্রাট জনগণের কল্যাণে অর্থ ব্যয় না করলে কারো কিছু বলার ছিল না। যুগ যুগ ধরে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ চলত। মোটকথা নৈতিক অবক্ষয় এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে, নিজ শিশু কন্যাকে নিজ হাতে মাটিতে পুঁতে ফেলে হত্যা করা হতো। তখনকার সমাজে দাস প্রথা চালু ছিল। হাটে-বাজারে পণ্যের মতো বিক্রি হতো মানুষ। এ সকল দাসের ক্রয় করে নিয়ে মনিবরা তাদেরকে দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করাতো। এহেন আরও বহুবিধ কার্যক্রম সেখানে চলতো। তাই ইতিহাসে এ যুগকে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অন্ধকার যুগ বলা হতো।

এই অমানিশার ঘনঘোর অন্ধকারে আদর্শিক সূর্যোদয় হলো খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর আগমনে ধরা যেন আসমানের স্নিগ্ধ-সুন্দর ও শান্তিময় চাঁদটি হাতে পেল! অন্ধকার জাহেলি সমাজে যেন উদয় হলো চিরবসন্তের কুসুমবাগ।

প্রাথমিক পদক্ষেপ

ঘূণে ধরা, বহু সঙ্কটে পূর্ণ জাহেলি সমাজে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন মুহাম্মদ মুস্তফা [সা]। ভাবতে থাকেন, খুঁজতে থাকেন মানুষকে আলোর পথে আনয়নের পথ ও পন্থা। ফিজারের যুদ্ধে বিভীষিকা দেখে তাঁর মন কেঁদে ওঠে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে গঠন করেন হিলফুল ফুজুল– শান্তি সংঘ। কিন্তু এতে সাময়িক সুফল এলেও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তথা সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থ হলেন তিনি। সমাজের করুণ পরিণতি দেখে বারবার মর্মাহত হতে থাকেন তিনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেও তেমন কিছুই করতে পারেননি। তাই নির্জনে বসে মহান প্রভুর কাছে ধরনা দিতে শুরু করেন। সঠিক পথের দিশা খুঁজতে থাকেন সঠিক পথের নির্মাতার কাছে।

সমাজ জীবনের সার্বিক উন্নয়নে মনোনিবেশ

মানব জাতিকে অপরাধ প্রবণতা থেকে উদ্ধারের জন্য মহানবী [সা] মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অপরাধের মূল যেহেতু সন্ত্রাস ও দুর্নীতি, তাই এটা দূর করতেই সকল তৎপরতা অব্যাহত থাকে। মূলত বিবেকের ওপরই ইসলামের গোটা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির বিবেককে সদা জাগ্রত রাখার এবং তার চেতনা ও অনুভূতিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও তীব্র করার শিক্ষা দেন মহানবী [সা]।

মানুষ যখন বিবেকবোধ হারিয়ে ফেলে তখনই সে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। বিবেক শাণিত হলে ব্যক্তি কোন অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। বিবেকবোধসম্পন্ন একজন ব্যক্তি কোন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়লেও তিনি বিবেকের তাড়নায় অস্থির হয়ে সে অপরাধের জন্য নিজেকে দোষী বলে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হন

www.bjilibrary.com

না। মহানবী [সা] বিবেকের সুপ্ত চেতনাকে সর্বাগ্রে বিকশিত করেছেন। ফলে এমন লোক তৈরি করতে তিনি সক্ষম হন যারা বিবেকের প্রতিরোধে অপরাধ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখেন।

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়ত প্রাপ্ত হন এবং মক্কার লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। এর পরও তিনি দমে যাননি। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। তদানীন্তন সমাজে যাদের মধ্যে কিছুটা মানবীয় গুণ ছিল তারা একে একে এ আন্দেলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। মুসলমানদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে ততই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে মদীনার লোকেরা নবী করীম [সা]-কে সমর্থন করেন এবং সেখানে চলে আসার অনুরোধ জানান।

চূড়ান্ত পদক্ষেপ

মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে মুসলমানগণ একে একে মদীনায় হিজরত করেন। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে মহানবী [সা] হযরত আবু বকর [রা]-কে সাথে নিয়ে মদিনার উদ্দেশে রওনা হন। মদীনায় গিয়ে পর্যায়ক্রমে তিনি একটি পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন যা ছিল সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত। সেখানকার মানুষ চরম সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার সুযোগ পায়। কোন অলৌকিক উপায়ে আল্লাহ এ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেননি, বরং নবী করীম [সা]-এর নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এ সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে লক্ষণীয়, নবী [সা] কোন প্রকার সন্ত্রাস বা দুর্নীতির আশ্রয় নেননি। সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তিনি একটি চূড়ান্ত আদর্শকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। বর্তমানের ন্যায় ক্ষমতালিপ্সু ইঙ্গ-মার্কিন সমাজপতিদের মতো সন্ত্রাস প্রতিরোধের নামে চরম সন্ত্রাসের পথ তিনি বেছে নেননি। তিনি যে পদ্ধতিতে সমাজে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন তা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক পন্থায়। আর আজও এ ধরনের সমাজ কায়েম সম্ভব যদি দেশের জনগণ ও নেতৃবৃন্দ এগিয়ে আসেন। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনের সূরা রা'দের ১১ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না যে পর্যন্ত না তারা তাদের চিন্তা ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়।"

ইসলামী রাষ্ট্র

নবী করীম [সা] মদীনায় জনগণের সমর্থনে একটি রাষ্ট্র কায়েম করলেন, যে রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন তিনি নিজে। ক্ষুদ্রায়তন এ ইসলামী রাষ্ট্রটির পরিসর দিন দিন বাড়তে থাকে এবং দলে দলে বিভিন্ন গোত্র এর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে থাকে। খুন, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, ধর্ষণের দেশ আরব ভূখণ্ডে ইসলামের ছায়াতলে এসে সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে মানুষ পূর্ণ নিরাপত্তাসহ সুখে শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পায়। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই এ ঘটনা পড়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন! কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, এটি কোন অলৌকিক ঘটনা ছিল না। আল্লাহপাক ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

www.bjilibrary.com

"তারা এমন লোক, আমি যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" [সূরা হাজ : ১১] এ বৈশিষ্ট্যসমূহ কার্যকরী না হলে তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে না। আর ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহ রাষ্ট্রে কার্যকর করা সম্ভব হলে সে রাষ্ট্রে সন্ত্রাস-দুর্নীতি এমনিতেই বিদায় নেয়ার কথা। ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে কুরআনের আইন চালু হয়ে সমাজ থেকে সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি দূর হয়ে যেতে বাধ্য। নবী করীম [সা] প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজে এবং তৎপরবর্তী খলিফাদের আমলে এ দৃশ্যই লক্ষ্য করা যায়।

একটি পর্যালোচনা

এখন দেখা যাক, মহানবী [সা] সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কী আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে, 'All of the glitters of the world Mohammad [Sm] is the most successful."

ক. বহুত্ববাদের পরিবর্তে একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা : যদি প্রশ্ন করা হয় : একজন মানুষ কোন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবে– কোন একক শক্তির কাছে, না কি অসংখ্য শক্তির গড্ডলিকা প্রবাহের পদযুগলে? জবাব রয়েছে প্রিয় নবী রাসূল করীম [সা]-এর প্রাপ্ত আলোর মধ্যে। কোন আলোকোজ্জ্বল দীপ শিখা, বৃহৎ বৃক্ষটি, আগুনের কুণ্ডলি কিংবা হাতে গড়া মাটির প্রতিমা নয়, বরং এক একটি দেবতা অসংখ্য দেবতার মুখোমুখি করে, কোন মানুষকে এক শক্তির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসে বহু প্রভুত্বের সমস্যা থেকে বের করে এক শক্তির আলোকবর্তিকা দিল সকলের মাঝে। চূড়ান্ত প্রভুত্বের স্বীকৃতি মূলত সব কিছু থেকে নিজেকে রক্ষা করে এক প্রভুত্বের বলয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সহায়তা করে। ফলে এখানে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কোন চিহ্নটিও থাকে না।

খ. মানুষের জ্ঞান ও অহির জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য : আবুল হেকাম কিংবা বুদ্ধির পিতা পরিণত হল আবুল জেহেল কিংবা অজ্ঞের পিতায়। তার নিরপেক্ষ মানদণ্ড হিসেবে নিরূপণ করা হলো আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানকে। মানব মুহাম্মাদ [সা] যখন অহির জ্ঞান প্রাপ্ত হননি, তখনও তিনি সমাজে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে আল আমিন উপাধি পেয়ে সমধিক পরিচিত ছিলেন। হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপনের ঘটনাটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহানবীর [সা] কৌশলী ভূমিকায় দূর হয়ে গেল সমস্ত বিভেদ। কিন্তু তারপরও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হল একমাত্র অহির জ্ঞান যা মুহাম্মাদ [সা]-এর জীবনে পুরোটাই বাস্তবায়িত হয়েছে।

গ. পরিপূর্ণ শিক্ষার বিস্তার : শিক্ষা মানে মানব জীবনের পরিপূর্ণতা সাধন। জীবনের কোন একটি দিক শুধু নয়, সার্বিক জীবনের পুনর্বিন্যাস সাধন করে একজন পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য, অথচ আমাদের সমাজের দুর্নীতির কারণগুলো পর্যালোচনা করলে ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই এর কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়াও। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেছেন, 'এ তিনিই যিনি উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল [সা] স্বয়ং তাদের মধ্য হতে দাঁড় করিয়েছেন যিনি তাহাদেরকে তাঁর

www.bjilibrary.com

আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়ে শোনান, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ সুগঠিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দেন।' [আল জুম'আ : ০২] মুহাম্মাদ [সা] শিক্ষার এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একজন পরিপূর্ণ মানুষ তৈরির শিক্ষা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলা যেতে পারে প্রচলিত বিদ্যাপীঠের শিক্ষা কিংবা সনদপত্র ছাড়াই যে শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল তা একজন মানুষকে শুধু ডিগ্রিধারীই করেনি, বরং বাস্তব জীবনকে দিয়েছে বদলিয়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদের পরিবর্তে সনদ পেয়েছেন সমাজের মানুষর পক্ষ থেকে। যে শিক্ষা শুধু কিছু নীতিকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এক একটি শিক্ষা এক একটি জীবন্ত মানুষের রূপ লাভ করেছিল, একজন সুন্দর পরিপূর্ণ মানুষ দেখে যে কেউই শত্রু কিংবা মিত্র উপলব্ধি করতে পারত। এই হল মুহাম্মাদ [সা]-এর কুরআন প্রদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব নমুনা।

ঘ. শাস্তিই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় : দুনিয়ায় অপরাধের বিরুদ্ধে নানা ধরনের শাস্তিসম্বলিত আইন রচিত হয়েছে। এই আইনের প্রয়োগও সমাজে কম বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারপরও অপরাধ দমিত হচ্ছে না। নবী করীম [সা]-এর শিক্ষা ছিল অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়া। মহান রাব্বুল আলামীন নবী করীম [সা]-এর নিকট অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন অপরাধের ভয়াবহতা সম্পর্কে। অপরাধ তথা সন্ত্রাস ও দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি স্বভাবতই মানব মনে তীব্র ভীতির সঞ্চার করে। ফলে সে অন্যায় পথে পা বাড়াতে সাহস পায় না। আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, 'যে লোক কোন মুমিন ব্যক্তিকে সঙ্কল্প করে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। চিরকাল থাকবে সেখানে। আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য খুব সাংঘাতিক আযাব নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করে রেখেছেন।' [সূরা আন নিসা : ৯৩]

ঙ. পারস্পরিক সহযোগিতা : বিশ্বনবী মুহাম্মাদ [সা] ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, পরস্পরিক কল্যাণ কামনা, সত্যের উপদেশ, ধৈর্য অবলম্বনের নসিহত এবং সকল সীমা লঙ্ঘনমূলক কাজ, অন্যায়, জুলুম ও বিপর্যয়ের প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশিকা স্পষ্ট, 'তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো কল্যাণময় ও তাকওয়াপূর্ণ কাজে এবং কোনরূপ সহযোগিতা করবে না পাপ, গুনাহ ও সীমা লঙ্ঘনমূলক কাজে।" [আল মায়িদা : ০২]

বিশ্বনবী [সা] দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে লোকই কোন অন্যায়, পাপ ও ঘৃণ্য কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা নিজ হস্তে ও শক্তিবলে ক্রমশ পরিবর্তন করে দেয়। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন মুখে তার প্রতিবাদ করে এবং তাও করতে সমর্থ না হলে অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা করে, এটাই সর্বনিম্ন স্তরের দুর্বল ঈমানের লক্ষণ। নবী করীম [সা] এমন এক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন যেখানে অন্যায়বিরোধী চেষ্টা-সাধনায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ব্যাপক রূপ লাভ করে। সকলেই অন্যায়ের প্রতিরোধে উঠে-পড়ে লাগে। কোন অন্যায়, অপরাধকারীকে কেউ এক বিন্দু প্রশ্রয় দেয় না। সাহায্য-সহযোগিতা করে না। ফলে রাসূল [সা] প্রতিষ্ঠিত সমাজে

www.bjilibrary.com

অন্যায়, জুলুম বা পাপ বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেনি। দুর্বল ক্ষীণ হয়ে থাকে, প্রচ্ছন্ন ও নির্মূল হয়ে যায় এবং ন্যায় ও কল্যাণমূলক কাজ ব্যাপকতা লাভ করে।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবী [সা]-এর আদর্শ : বর্তমান প্রেক্ষিত

মহানবী [সা] যেরূপে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ উপহার দিয়েছিলেন তদ্রূপ বিশ্ব ব্যবস্থা এখনও গড়ে তোলা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেছেন, 'He was the master-mind not only of his own age but of all ages.' অর্থাৎ মুহাম্মাদ [সা] যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁকে শুধু সে যুগেরই একজন মনীষী বলা যাবে না, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।

বিশ্বের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাব বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রধান। আজ রাজনীতির নামে বিশ্বে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে আরও করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। সম্প্রতি আমেরিকাতে যে সন্ত্রাসী হামলা হয় টুইন-টাওয়ারের ওপর, এটাকে ইস্যু করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শক্তি প্রয়োগ করে অপপ্রচার চালাচ্ছে, যদিও এটা কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি। তারা আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে জনসাধারণের ওপর নির্যাতন করে সরকার পরিবর্তন করে দেয়। তারপর দেখা গেল ইরাকে মার্কিন-ইঙ্গ আক্রমণের করুণ ইতিহাস। সেখানেও গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতার মসনদ থেকে নামিয়ে দেয়া হয়। মুসলমানদের ওপর বর্বর নির্যাতন চালানো হয়। গত ২২ মার্চ ২০০৮ সোমবার ভোরে গাজা উপত্যকায় মসজিদে ফজরের নামায শেষে বাসায় ফেরার সময় মসজিদ চত্বরে রক্ত পিপাসু ইসরাইলি সেনাবাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শাহাদত বরণ করেন স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা হামাসের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত আলেমে দীন ৬৭ বছর বয়স্ক শেখ আহমদ ইয়াছিন। তাঁর রক্তের গন্ধ না শুকাতেই হত্যা করল ডা. আব্দুল আজিজ রানতিসিকে। অন্যদিকে ভারতে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করে হত্যা করা হচ্ছে। তাদেরকে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া করার সুযোগ দেয়া হয় না। কাশ্মীর সমস্যা বিগত ৫০ বছর ধরে হচ্ছে। ভারতের একগুঁয়েমির কারণে সেখানে গণভোট হচ্ছে না। জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে না পারায় একটি মরা লাশ হিসেবে বিশ্বের মানুষের নিকট পরিচিতি পেয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে চরম তথ্যসন্ত্রাস ও দুর্নীতির বীজ। আমেরিকা, ইসরাইল, রাশিয়া, ব্রিটেন, ভারত– এরা সবাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদকে [State terrorism] জায়েয করে নিয়েছে এবং অন্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি পথ তৈরি করে দিয়েছে অতি সহজে মুসলিম নিধন আর সারা বিশ্বের অরাজকতা সৃষ্টির জন্য। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল তাদের এক রিপোর্টে দেখিয়েছে যে, বিশ্বের ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোতে তাদেরই তৈরি ও মত চাপিয়ে দেয়া নিয়ম-কানুনের জোরে প্রতারণার মাধ্যমে প্রতি বছর বাণিজ্য থেকে লুটে নিচ্ছে দশ হাজার কোটি ডলার [দৈনিক ইনকিলাব, ১২ এপ্রিল ২০০২]। এভাবে বিশ্বের শান্তিকামী

www.bjilibrary.com

মানুষকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মানবতার দুশমনরা গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এখন আলোচনা করে দেখা যাক বর্তমান বিশ্ব সঙ্কট থেকে সমাধানের জন্য বিশ্বনবী মুহাম্মদ [সা]-এর আদর্শ কিভাবে প্রভাব ফেলে।

পরিবেশ তৈরি

পরিবেশ সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিবেশের কারণেই অনেকে এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। মহানবী [সা]-এর ন্যায় সেই পরিবেশেই এখন তৈরি করতে হবে যাতে কেউ অন্যায় বা অপরাধ করার সুযোগ না পায়। অন্যায় কাজের সুযোগ দেয় বা অনিবার্য করে তোলে যেসব পথ তাও বন্ধ করে দিতে হবে। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সকল পন্থা ও উপায় বন্ধ হয়ে যাবার পরও যদি কেউ তা করে তবে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে।

মূলত আল্লাহর দেয়া আইন বাদ দিয়ে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, সমাজ থেকে পরিপূর্ণভাবে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পন্থা ও তার বৈশিষ্ট্য সকলকে জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বা কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

নামাযের মাধ্যমে চরিত্র সংশোধন : মানুষ নিয়েই সমাজ। সমাজে বসবাসরত মানুষ যদি নিজ নিজ জীবনে সৎ ও চরিত্রবান না হয়, তাহলে তাদের দ্বারা গঠিত সমাজ বা রাষ্ট্রে কখনো শান্তি আসতে পারে না। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে করে থাকে। চরিত্র সংশোধনের সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো নামায। নামায সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহপাক বলেছেন, 'নিশ্চয়ই নামায মানুষকে সকল অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।" [সূরা আনকাবুত : ৪৫] নবী করীম [সা] প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে নামায কায়েমের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র সংশোধনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার ফলে তদানীন্তন সমাজের অধিকাংশ মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। সমাজের মানুষ যদি আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভয়ে ভীত থাকে তাহলে নিজেরাই পাপ থেকে দূরে থাকে। ফলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি করার সুযোগ পায় না।

যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু : ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই ধনী লোকদের সম্পদে গরিবের যে হক আছে তা রাষ্ট্র আদায় করে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানেই সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতো ধনী দরিদ্রের বিশাল ব্যবধান থাকার সুযোগ নেই। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাই এমন যে, এখানে সম্পদ এক স্থানে পুঞ্জীভূত হতে পারে না। ফলে দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায়।

সৎ কাজের আদেশ : বর্তমানে রাষ্ট্রই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে যে কোন কাজ সহজেই সম্পন্ন হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভালো কাজ করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয় না, বরং রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যায়

www.bjilibrary.com

কাজ চালু হয়। ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে সব সময় সৎ ও ন্যায় কাজের আদেশ দিয়ে থাকে এবং সেই অনুযায়ী পরিবেশও গড়ে তোলে। রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবেশটাই এমন করা হয় কোন মানুষ অন্যায় কাজ করতে চাইলেও পরিবেশের কারণে তা করার সাহস পায় না। রাষ্ট্রের কর্ণধার ব্যক্তিগণ মানুষকে সত্যের পথে চলার জন্য সর্বদা উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

অসৎ কাজের নিষেধ : নামায ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবেশের মাধ্যমে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার সাথে সাথে অন্যায় কাজকে কঠোর হস্তে দমন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নবী করীম [সা] ছিলেন রাহ্মাতুল্লিল আলামীন। কিন্তু আল্লাহর আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপসহীন ও কঠোর। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সমাজে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বাড়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকা এবং 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান' এ দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর না করা।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো তা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, এ ধরনের রাষ্ট্রে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি থাকার কোনো সুযোগ নেই। তাই বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে মূল প্রতিবন্ধক সন্ত্রাস ও দুর্নীতি কেবল ইসলামী আইন চালুর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব।

উপসংহার

ড. মরিস বুকাইলি 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনা করে বলেছেন, 'মুহাম্মাদ [সা] একজন নিরক্ষর রাসূল ছিলেন কিন্তু তাঁর উপস্থাপিত জীবনাদর্শ আর ইসলাম ও আল কুরআন আল্লাহপ্রদত্ত এবং তা অবিকৃত অবস্থায় সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মানব সমাজে সংরক্ষিত আছে।' বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও গবেষক মাইকেল এইচ হার্ট তার দ্য হান্ড্রেড গ্রন্থে বলেন, 'মুহাম্মাদ [সা] একাধারে একটি ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন।' বিশ্ববিখ্যাত শত শত পণ্ডিত রাসূল [সা]-কে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হিসেবে আখ্যায়িত ও প্রশংসা করেছেন। রাসূল [সা] বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে রাখবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো কুরআন আর অপরটি হলো আমার সুন্নাহ।' বিশ্ববাসীর মহাসঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য এই বক্তব্যটিই যথেষ্ট।

তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন চালুর উদ্যোগ গ্রহণ না করে অন্য যে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা দ্বারা সাময়িক কোন ফায়দা লাভ করা গেলেও পরিপূর্ণভাবে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দূর করা সম্ভব নয়। তাই বিশ্ববাসীকে ইসলাম তথা মহানবী [সা]-এর আদর্শের দিকেই এগিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মানব জাতিকে মহানবী [সা]-এর প্রতিরোধ পদ্ধতির দিকেই ফিরে যেতে হবে।■

www.bjilibrary.com

রমজানের বিশেষ কমিশন

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে -

১. রমজানের তিরিশ শিক্ষা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	মূল্য- ১৫০/-
২. আমার সিয়াম কবুল হবে কি	মাসুদা সুলতানা রুমী	মূল্য- ২০/-
৩. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুসকিলের সাথে আসানীও রয়েছে	মাসুদা সুলতানা রুমী	মূল্য- ২০/-
৪. নামাজ জান্নাতের চাবি	মাসুদা সুলতানা রুমী	মূল্য- ১৫/-
৫. রমজান ও রোজা	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	মূল্য- ২০/-
৬. আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ (১-৫)	মুহাম্মদ আনওয়ার হুসাইন	মূল্য- ১৫০০/-
৭. সাইন্স ফ্রম আল-কোরআন	মুহাম্মদ আবু তালেব	মূল্য- ২৮০/-
৮. ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	মূল্য- ৪০০/-
৯. নির্বাচিত দারসে কোরআন (১-২)	জনাব আলী ভূঁইয়া	মূল্য- ১৮০/-
১০. আমপারা (বাংলা অনুবাদ)	সংকলিত	মূল্য- ৪০/-
১১. কোরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি	মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী	মূল্য- ৪৫/-
১২. এন্তেখাবে হাদীস (সম্পূর্ণ)	আবদুল গাফফার হাসান নদভী	মূল্য- ১৩০/-
১৩. দারসে হাদীস (১-২)	মাওলানা হামিদা পারভীন	মূল্য- ১৬০/-
১৪. সকাল সন্ধ্যায় আযকারে নববী	মোহাম্মদ আবদুর রহীম খান	মূল্য- ২৫/-
১৫. ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা	মাওঃ ফজলুর রহমান আশরাফী	মূল্য- ২২০/-
১৬. শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা	ইমাম ইবনে তাইমিয়া	মূল্য- ১৫০/-
১৭. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	মুহাম্মদ নুরুল আমীন	মূল্য- ২৫০/-
১৮. রূহের রহস্য	হাফিয ইবনুল কায়্যিম	মূল্য- ২৩০/-
১৯. সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, কি কেন কিভাবে	মাওঃ ফজলুর রহমান আশরাফী	মূল্য- ১৭০/-
২০. গীবত	মাওঃ মওদূদী ও অন্যান্য	মূল্য- ৬০/-
২১. ইসলামের সামাজিক আচরণ	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	নেট মূল্য-২০০/-
২২. আমরা কি মুসলমান	মুহাম্মদ কুতুব	মূল্য- ১০০/-
২৩. বিশ্বনবীর (সাঃ) জীবনালোকে	আব্বাস আলী সরকার	মূল্য- ১১০/-
২৪. ইসলামের সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও বন্টন	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	মূল্য- ৭০/-
২৫. আদমের আদি উৎস	আল্ মেহেদী	মূল্য- ১০০/-
২৬. আদর্শ মানব মুহাম্মদ (সাঃ)	এ কে এম নাজির আহমেদ	মূল্য- ৩০/-

এছাড়াও আমাদের শতাধিক গ্রন্থ থেকে আপনার পছন্দের কপির জন্য দেশের স্বনামধন্য বই বিক্রেতা অথবা নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আহসান পাবলিকেশন

Ahsan Publication

১. কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬, ০১৮১৫৪২২৪১৯
২. ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৯৩৭৪৮০
৩. ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা, ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৯২২৭০৪২১০

www.ahsanpublication.com

www.bjilibrary.com

তাকওয়াপূর্ণ সফল জীবন গঠনে রাসূল [সা]-এর কয়েকটি হাদীস

মো: আব্দুর রহীম খান

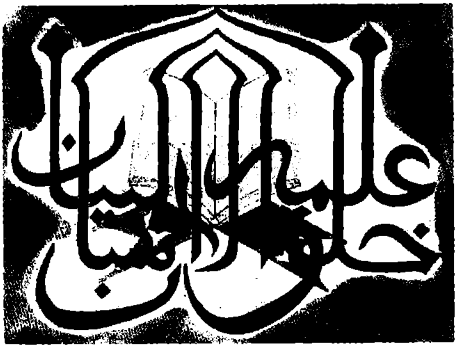

১. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] যখন লোকদেরকে হুকুম দিতেন, তখন এমন কাজের হুকুম দিতেন যা করার সাধ্য তারা রাখত। [একবার] তাঁরা [সাহাবীরা] বললেন, হে রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার মতো নই। আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সব ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। [কাজেই আপনার চেয়ে বেশী ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য] এতে রাসূলুল্লাহ [সা] রেগে গেলেন, এমন কি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্নও দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, আমিই তো তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। [হাদীস নং-১৯]

২. ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত, নবী [সা] বলেন : আমাকে দোযখ দেখানো হলো। আমি দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হলো : তারা কি আল্লাহর প্রতি কুফরী করে? তিনি বললেন, 'তারা স্বামী ও উপকারের প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি তুমি এক যুগ ধরে তাদের কারও উপকার কর, তারপরও সে তোমার কোন ত্রুটি দেখলে বলে, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভাল কিছু পাইনি।' [হাদীস নং-২৮]

www.bjilibrary.com

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেন : চারটি [দোষ] যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোন একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে। ২. সে কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। ৪. আর সে ঝগড়া করলে, গালাগালি করে। [হাদীস নং ৩৩]

৪. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেন : দীন সহজ। যে কেউ দীনের কাজে বেশী কড়াকড়ি করে, তাকে দীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যপথ অবলম্বন কর এবং [দীনের] কাছাকাছি হও, আর হাসিমুখে থাক। আর সকালে, বিকেলে ও রাতের কিছু অংশে [ইবাদতের মাধ্যমে] সাহায্য চাও। [হাদীস নং-৩৮]

৫. আনাস [রা] বলেন, উবাদা ইবনে সামেত আমাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ [সা] একবার শবে কদর সম্পর্কে অবগত করার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলিম ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছিল। এতে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ঝগড়া করল। এ কারণে এর জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হলো। তবে এতে তোমাদের জন্য ভালই হবে বলে আশা করা যায়। তোমরা এটাকে [রমযানের] সাতাশ, উনত্রিশ ও পঁচিশ তারিখে অনুসন্ধান করো। [হাদীস নং-৪৭]

৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে নবী [সা] পেছনে পড়লেন। আমরা নামায পড়তে দেরি করে ফেলেছিলাম এবং আমরা অযু করছিলাম, আর [তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে] পা ওপরে ওপরে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদের কাছে এসে উচ্চ স্বরে দু'তিন বার বললেন, 'এ গোড়ালিগুলোর জন্য আগুনের শাস্তি রয়েছে।' [হাদীস নং-৫৮]

৭. ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, নবী [সা] আমাদেরকে ক্লান্তি থেকে বাঁচার জন্য উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কয়েক দিনের বিরতি দিতেন। [হাদীস নং-৬৮]

৮. আনাস [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেন, 'তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন করে তুলো না। আর সুখবর দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।' [হাদীস নং-৬৯]

৯. আবু ওয়াইল [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ লোকদেরকে প্রতি বৃহস্পতিবারে নছিহত করতেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আবু আবদুর রহমান [ইবনে মাসউদ]! আপনি প্রতি দিন আমাদেরকে নছিহত করবেন বলে আমি আশা করি। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে এ বিষয়টি বাধা দেয়, আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না। নবী [সা] যেমন আমাদের ক্লান্তির ভয়ে বিরতি দিতেন, তেমনই আমিও তোমাদেরকে নছিহত করার ব্যাপারে বিরতি দিয়ে থাকি।' [হাদীস নং-৭০]

১০. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, হে রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআত পাওয়ার ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান? রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, হে আবু হুরাইরা, আমি মনে করি, তোমার পূর্বে আর কেউ

www.bjilibrary.com

আমাকে এই ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীসের প্রতি তোমার লোভ রয়েছে। আমার শাফাআত লাভের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান যে তার অন্তর অথবা মন থেকে একান্ত নিষ্ঠাসহকারে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে। [হাদীস নং-৯৮]

১১. আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত। আনাস [রা] বলেছেন, আমাকে তোমাদের কাছে বেশী হাদীস বর্ণনা করতে বাধা দেয় নবী [সা]-এর একটি বাণী : যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে! [হাদীস নং-১০৬]

১২. আবু হুরাইরা [রা] বলেছেন, আমি বললাম, হে রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই। তিনি বললেন, 'তোমার চাদর মেলে ধর।' আমি তা মেলে ধরলাম। তারপর তিনি দু'হাত দিয়ে অঞ্জলি করে [চাদরের মধ্যে] ঢাললেন। এরপর তিনি বললেন, 'ওটাকে [বুকে] লাগাও।' আমি তা লাগালাম। এরপর থেকে আমি আর কিছুই ভুলিনি। [হাদীস নং-১১৭]

১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী [সা]-কে হজ্জে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় দেখলাম তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি বলল, 'হে রাসূলাল্লাহ! আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি।' তিনি বললেন, 'কঙ্কর নিক্ষেপ করো, কোন ক্ষতি নেই।' আর একজন বলল, 'হে রাসূলাল্লাহ! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেন, 'কুরবানী করো, কোন ক্ষতি নেই।' তারপর কোন কাজ আগে বা পরে করার যে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, 'করো, কোন ক্ষতি নেই।' [হাদীস নং-১২২]

১৪. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ [সা]-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন আমার অযুর চিহ্ন হেতু 'গুররাল-মুহাজ্জালীন' বলে ডাকা হবে। কাজেই তোমাদের যার যার পক্ষে সম্ভব হয় সে তার জ্যোতি বিস্তৃত করুক। [হাদীস নং-১৩৩]

১৫. আবু কাতাদা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেন, তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ না করে। আর সে যেন [পানির] পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। [হাদীস নং-১৫১]

১৬. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] জুতা পরা, চুল আঁচড়ান, পবিত্রতা অর্জন করা [অযু-গোসল] এবং এ ধরনের প্রতিটি কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। [হাদীস নং-১৬৪]

১৭. ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] দুধ পান করে কুলি করলেন এবং বললেন, দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে। [হাদীস নং-২০৫]

১৮. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত, নবী [সা] বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ

www.bjilibrary.com

পানিতে পেশাব না করে, যা প্রবাহিত হয় না। কেননা পরে হয়তো সে-ই উক্ত পানিতে গোসল করবে। [হাদীস নং-২৩২]

১৯. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রতিটি পানীয় দ্রব্য হারাম। [হাদীস নং-২৫৩]

২০. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী [সা] জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে তাঁর পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিতেন এবং নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন। [হাদীস নং-২৭৯]

২১. আবু সাঈদ খুদরী [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ [সা] ঈদুল আযহা কিংবা ঈদুল ফিতরের সময় ঘর থেকে ঈদগাহের দিকে বের হয়ে আসলেন। তিনি মেয়েদের নিকট গিয়ে বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা বেশী করে দান করতে থাকো। কেননা আমাকে তোমাদের অধিকাংশকে দোযখে দেখানো হয়েছে। তারা বললো, কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি জবাব দিলেন, তোমরা বেশী অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমি তোমাদের চেয়ে আর কাউকেও জ্ঞানবুদ্ধি ও দীনদারির ক্ষেত্রে অপরিপক্ব দেখি না কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি হরণ করে থাকো। তারা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জ্ঞান ও দীনদারির মধ্যে কি অপরিপক্কতা রয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য [শরীয়তের দৃষ্টিতে] পুরুষের সাক্ষের অর্ধেকের সমান নয় কি? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই তোমাদের জ্ঞানের অপরিপক্বতার নিদর্শন। আর ঋতুবতী হলে তোমাদের কেউ নামায পড়তে পারে না এবং রোযা রাখতে পারে না, তাই না? তারা বলল, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক। তিনি বললেন, এটাই তোমাদের দীনদারির অপরিপক্বতার নিদর্শন। [হাদীস নং-২৯৩]

২২. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আবাসে ও প্রবাসে নামায দু'রাকাআত করে ফরয করেছিলেন। পরে প্রবাসের নামায ঠিক রাখা হলো এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হলো। [হাদীস নং-৩৩৭]

২৩. মায়মুনা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] জায়নামাযের ওপর নামায পড়তেন। [হাদীস নং-৩৬৮]

২৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] একবার কেবলার দিকে দেওয়ালে থুথু দেখে নিজে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে, সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা নামাযের সময় আল্লাহ সুবহানাহু তার সামনে থাকেন। [হাদীস নং-৩৯১]

২৫. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়াবে, সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে নামাযে থাকে, আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে। আর ডান দিকেও না। কেননা ডান দিকে ফেরেশতা থাকে, বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলবে। তারপর তা মাটি চাপা দেবে। [হাদীস নং-৩৯৯]

www.bjilibrary.com

২৬. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়ার পর মুসাল্লায় যতক্ষণ সে অযুসহ অবস্থান করে ততক্ষণ ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে। ফেরেশতারা বলে, 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তার ওপর রহম করো।' [হাদীস নং-৪২৬]

২৭. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, জামা'আতের নামায ঘরের ও বাজারের নামাযের তুলনায় [সওয়াবের দিক থেকে] পঁচিশ গুণ অধিক মর্যাদার অধিকারী। কেননা তোমাদের যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর একমাত্র নামাযের উদ্দেশে মসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ মাফ করে দেন। তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর, যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করে, তাকে নামাযের মধ্যে শামিল করা হয় এবং যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য তার বে-অযু না হওয়া অবধি দোয়া করে। [হাদীস নং-৪৫৭]

২৮. আবু জুহাইম [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী এটা তার জন্য কত বড় গুনাহর কাজ, যদি জানত, তাহলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ [বৎসর] দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। রাবী আবুন-নযর বলেন, [আমার উস্তাদ বুসর] চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমি জানি না। [হাদীস নং-৪৮০]

২৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী [সা]-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, ঠিক সময়ে নামায আদায় করা। তিনি [আবদুল্লাহ] পুনরায় বললেন, এরপর কোন্ কাজটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? নবী [সা] বললেন, পিতামাতার সেবা ও আনুগত্য করা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোন্ কাজটি? জবাবে নবী [সা] বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, নবী [সা] আমাকে এগুলোর কথাই বললেন। আমি আরো বেশী জানতে চাইলে তিনি আরও বলতেন। [হাদীস নং-৪৯৬]

৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর [রা] থেকে বর্ণিত। [তিনি বলেন] রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, যার আসরের নামায ফউত অর্থাৎ কাযা হলো, তার যেন পরিবার ও সম্পদ সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো! [হাদীস নং-৫১৯]

৩১. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আসরের নামাযের একটি সিজদাও পায়, তাহলে তার উচিত নামায পূর্ণ করা। আবার অনুরূপভাবেই কেউ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের একটি সিজদাও পায়, তাহলে তার উচিত নামায পূর্ণ করা। [হাদীস নং-৫২৩]

৩২. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] এশার নামায আদায়ের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং [এশার নামাযের] পরে কথাবার্তা বা গল্প-গুজব অপছন্দ বা মাকরুহ মনে করতেন। [হাদীস নং-৫৩৫]

www.bjilibrary.com

৩৩. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ [রা] বর্ণনা করেন, একদিন [পূর্ণিমার রাতে] আমরা নবী [সা]-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন, তোমরা যেমন এ পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই তেমনভাবে তোমাদের প্রভু [মহান আল্লাহ তা'আলা]-কেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্টতা থাকবে না। সুতরাং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায [ফজর ও আসরের নামায] আদায়ের ব্যাপারে যাতে তোমরা [শয়তান কর্তৃক] পরাভূত না হও তার ব্যবস্থা করো। এরপর তিনি [কুরআনের আয়াত] পাঠ করলেন, 'সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তাসবীহ পড়ো বা পবিত্রতা ঘোষণা করো।' [হাদীস নং-৫৩৯]

৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত সাতাশ গুণ বেশী। [হাদীস নং-৬০৯]

৩৫. আবু সাঈদ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ [সা]-কে বলতে শুনেছেন, একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত সাতাশ গুণ বেশী। [হাদীস নং-৬১০]

৩৬. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, রাস্তায় চলতে চলতে একটি লোক পথের ওপর একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখতে পেয়ে সেটা সরিয়ে ফেলল। এতে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন। এরপর তিনি বললেন : শহীদ পাঁচ প্রকার : প্লেগে [বা মহামারীতে] মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, চাপা পড়ে মৃত এবং আল্লাহর পথে শহীদ। তিনি আরো বললেন : লোকেরা যদি জানত আযান দেয়ার ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর কী সওয়াব তাহলে [সেই সওয়াব পাওয়াার জন্য] লটারী ছাড়া অন্য কোনো উপায় না পেলে তারা অবশ্যই লটারী করত। যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার সওয়াব জানত তাহলে অবশ্যই তারা এজন্য দৌড়ে যেত। যদি তারা এশা ও ফজরের নামায [জামা'আতে] পড়ার সওয়াব জানত, তাহলে তারা এজন্য অবশ্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। [হাদীস নং-৬১৫]

৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা [রা] নামের আযদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর এক ব্যক্তিকে দু'রাক'আত নামায পড়তে দেখতে পান। যখন রাসূলুল্লাহ [সা] নামায শেষ করলেন, লোকেরা তখন ঐ ব্যক্তিকে ঘিরে ধরল। রাসূলুল্লাহ [সা] তাকে বললেন, ফজরের [ফরয] নামায কি চার রাকআত? ফজরের [ফরয] নামায কি চার রাকআত? [হাদীস নং-৬২৩]

৩৮. নোমান ইবনে বশীর [রা] বলেন, নবী [সা] বলেছেন, [নামাযে] তোমরা কাতার সোজা করে নেবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন। [হাদীস নং-৬৭৪]

৩৯. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ [সা]-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা এক প্রকার চুরি, যা শয়তান বান্দার নামায থেকে করে থাকে। [হাদীস নং-৭০৭]

www.bjilibrary.com

৪০. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, নামাযে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, [নামাযে] রাসূলুল্লাহ [সা] আমীন বলতেন। [হাদীস নং-৭৩৬]

৪১. আনাস ইবনে মালেক [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, সিজদার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা করো। তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় কুকুরের [মতো] দু' বাহু বিছিয়ে না দেয়। [হাদীস নং-৭৭৬]

৪২. ইবনে উমর [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] এই মর্মে নিষেধ করে দিয়েছেন যে, কোন লোক যেন তার কোন ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেই জায়গায় না বসে। [হাদীস নং-৮৫৮]

৪৩. ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] ঈদুল ফিতরে দু'রাক'আত নামায পড়লেন। এর পূর্বে কোন নামায পড়লেন না এবং পরেও কোন নামায পড়লেন না। [হাদীস নং-৯০৮]

৪৪. আবু সারিম [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা]-এর সফরে যখন কষ্ট হত, তখন তিনি মাগরিব ও এশা এক সংগে পড়তেন। ইবনে আব্বাস তাঁর এক বর্ণনায় বলেন, আল্লাহর রাসূল [সা] সফরের অবস্থায় যোহর ও আসর এক সংগে পড়তেন এবং মাগরিব ও এশার নামাযও এক সময়ে পড়তেন। [হাদীস নং-১০৩৮]

৪৫. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় একটি করে ফুঁ দিয়ে বলে, এখনো দীর্ঘ রাত অবশিষ্ট। সুতরাং ঘুমাতে থাক। সে যদি সেই সময় নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে পড়ে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে একটি গিরা খুলে যায়, অযু করলে আরেকটি গিরা খুলে যায় এবং নামায পড়লে আরো একটি [শেষ] গিরা খুলে যায়। তখন প্রফুল্ল ও চটপটে মন নিয়ে তার ভোর হয়। অন্যথায় অলস ও অপবিত্র মন নিয়ে তার ভোর হয়। [হাদীস নং-১০৭১]

৪৬. ইবনে উমর [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, তোমাদের নফল নামাযের কিছু তোমরা বাড়িতে আদায় করো। তোমাদের ঘরগুলো তোমরা কবরে পরিণত করো না। [হাদীস নং-১১১০]

৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] যোহরের দু'রাক'আত নামায আদায় করে না বসেই [তাশাহহুদ না পড়েই] দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায পূর্ণ করে তিনি দু'টি সিজদা করলেন এবং তারপর সালাম ফিরালেন। [হাদীস নং-১১৪৫]

৪৮. জাবের বিন আবদুল্লাহ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তা দেখে নবী [সা] উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো একজন ইয়াহুদীর জানাযা!

www.bjilibrary.com

তিনি বললেন, তোমরা যখনই যে কোন জানাযা যেতে দেখবে তখনই দাঁড়িয়ে যাবে। [হাদীস নং-১২২৬]

৪৯. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] বলেন, যে ফাঁসি লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, দোযখে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দেবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করে, দোযখে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিঁধিয়ে শাস্তি দেবে। [হাদীস নং-১২৭৪]

৫০. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, প্রতিদিন প্রত্যূষে যখন [আল্লাহর] বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত করো এবং অপরজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করো। [হাদীস নং১৩৪৯]

৫১. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'হজ্জে মাবরূর'। [হাদীস নং-১৪২১]

৫২. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, ঈমান [শেষ পর্যন্ত] এমনভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে। [হাদীস নং-১৭১৪]

৫৩. সাদ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী [সা]-কে বলতে শুনেছি, কেউ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করলে সে এমনভাবে বিগলিত হয়ে যাবে লবণ যেমন বিগলিত হয়ে যায়। [হাদীস নং-১৭৪২]

৫৪. আয়েশা [রা] বর্ণনা করেছেন, যখন [রমযানের শেষ] দশ দিন এসে যেত, তখন নবী [সা] পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন [অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন], রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন। [হাদীস নং-১৮৮২]

৫৫. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ [সা]-কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্যসামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে, কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ ধ্বংস হয়ে যায়। [হাদীস নং-১৯৪২]

৫৬. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয়, নামায পড়ার আদেশ করব। অত:পর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে যেসব লোক নামাযের জামাআতে আসেনি তাদের বাড়ি গিয়ে তাদেরসহ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিই। [হাদীস নং-২২৪২]

৫৭. আনাস [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুমকে আমরা সাহায্য করবো এটা তো বুঝলাম, কিন্তু জালিমকে আমরা কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তার [জালিমের] হাত শক্ত করে ধরে রাখবে। [হাদীস নং-২২৬৫]

www.bjilibrary.com

৫৮. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, আল্লাহর নিকট সেই লোক সর্বাধিক ঘৃণিত যে অত্যন্ত ঝগড়াটে। [হাদীস নং-২২৭৮]

৫৯. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, তোমাদের কারো খাদেম তার কাছে খাবার নিয়ে আসলে সে যদি তাকে সাথে না-ও বসায় তাহলে অন্তত এক বা দুই লোকমা খাবার তার মুখে তুলে দেবে। কেননা সে এই খাবার [পরিবেশন]-এর জন্য পরিশ্রম করেছে। [হাদীস নং-২৩৭১]

৬০. ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। দান করে যে ব্যক্তি আবার তা প্রত্যাহার করে নেয় সে এমন কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। [হাদীস নং-২৪৩০]

৬১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, কেউ কসম করতে চাইলে আল্লাহর নামে কসম করবে। অন্যথায় চুপ থাকবে [অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা যাবে না।] [হাদীস নং-২৪৮৪]

৬২. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম এক শ'টি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ত করবে, সে বেহেশতে যাবে। [হাদীস নং-২৫৩৪]

৬৩. সালেম আবুল নযর [রা] থেকে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা আমি পাঠ করেছি। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, যখন তোমরা তাদের [শত্রুদের] মুকাবিলা করবে [জিহাদে লিপ্ত হবে] তখন ধৈর্যসহকারে মুকাবিলা করবে। [হাদীস নং-২৬২৩]

৬৪. আয়েশা [রা] নবী [সা] থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর নিকট জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, [তোমাদের] সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জ। [হাদীস নং-২৬৬৫]

৬৫. ইবনে উমর [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, গুনাহ বা অন্যায় কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের [নেতা] আদেশ শোনা ও পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি গুনাহ বা অন্যায় কাজের আদেশ দান করা হয় তাহলে তা শোনা ও আনুগত্য পাওয়ার কোন অধিকার তার নেই। [হাদীস নং-২৭৩৭]

৬৬. ইবনে উমর [রা] থেকে বর্ণনা করেন, কোন একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ [সা] যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন। [হাদীস নং-২৭৯৩]

৬৭. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ [সা] ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টিকার্য সমাধা করেন, তখন তাঁর কিতাবেও লিখে নেন, নিশ্চয়ই আমার ক্রোধের চেয়ে আমার করুণা প্রবল এবং তা আরশের ওপর আল্লাহর নিকট বিদ্যমান। [হাদীস নং-২৯৫৩]

৬৮. আবু যার [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] বলেছেন, আমাকে জিবরাইল

www.bjilibrary.com

অবহিত করলেন, আপনার উম্মতের এমন কেউ যদি মারা যায়, যে আল্লাহর সাথে কোন শিরক করেনি, তবে সে বেহেশতে যাবে অথবা দোযখে প্রবেশ করবে না। নবী [সা] জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে [তবুও]। জিবরাইল জবাব দিলেন, যদিও [যিনা করে এবং চুরি করে তবুও]। [হাদীস নং-২৯৮২]

৬৯. সাহল ইবনে সাআদ [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, জান্নাতে আটটি দরজা। এর মধ্যে একটি দরজার নাম রাখা হয়েছে রাইয়্যান। একমাত্র রোযাদাররাই এ দরজা দিয়ে [বেহেশতে] প্রবেশ করবে। [হাদীস নং-৩০১৬]

৭০. আয়েশা [রা] নবী [সা] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্বর [এর উৎপত্তি] জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তোমাদের জ্বর ঠাণ্ডা করো। [হাদীস নং-৩০২২]

৭১. আবু সাঈদ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী [সা] বলেছেন, নামায পড়াকালে তোমাদের কারো সামনে দিয়ে যদি কেউ চলাচল করে, তাকে অবশ্যই বাধা দেবে। যদি অমান্য করে, আবারও নিষেধ করবে। এবারও অমান্য করলে তার সাথে [প্রয়োজনে] লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান। [হাদীস নং-৩০৩২]

৭২. আবু হুরাইরা [রা] বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, রমযান [মাস] যখন শুরু হয়ে যায়, তখন আসমানের [অন্য বর্ণনায় বেহেশতের] দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। [হাদীস নং-৩০৩৫]

৭৩. নবী [সা] থেকে আবু হুরাইরা [রা]-এর বর্ণনা। তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠল এবং অযু করল, তখন তার তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা উচিত। কেননা শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত্রি যাপন করেছে। [হাদীস নং-৩০৫৩]

৭৪. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] ইরশাদ করেছেন, পাঁচ রকম প্রাণী ফাসেক। হারাম শরীফেও তাদের মারা যেতে পারে [এরা হলো] ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক এবং কামড়ায় এমন কুকুর। [হাদীস নং-৩০৬৮]

৭৫. আবু হুরাইরা [রা] বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ [সা]-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, জন্মকালে শয়তান যাকে খোঁচায় না, পয়দা হওয়ার সময় শয়তান তাকে খোঁচা দেয় বলেই সে চিৎকার দিয়ে কাঁদে। তবে মরিয়াম ও তার পুত্র [ঈসা]-এর একমাত্র ব্যতিক্রম। তারপর আবু হুরাইরা বলেন, [এর কারণ মরিয়ামের মায়ের এ দো'আ] হে আল্লাহ! আমি মরিয়ামকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করেছি। [হাদীস নং-৩১৭৮]

৭৬. আবু হুরাইরা [রা]-এর বর্ণনা। নবী [সা] বলেছেন, ঈসা [আ] এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চুরি করেছ? সে জবাব দিল কখনও নয়, সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। ঈসা [আ.]

www.bjilibrary.com

বললেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং নিজের চোখকে অবিশ্বাস করেছি। [হাদীস নং-৩১৮৯]

৭৭. আবু হুরাইরা [রা] বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, ইয়াহুদ ও নাসারারা চুলে মেহেদী ইত্যাদি রং ও খেযাব লাগায় না। অতএব, তোমরা খেযাব লাগিয়ে তাদের খেলাফ ও বিপরীত কাজ করো। [হাদীস নং-৩২০৪]

৭৮. আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, আমার উপমা ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা এরূপ যেমন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও সুরম্য গৃহ নির্মাণ করলো কিন্তু এক কোণে একটি ইটের স্থান খালি রয়ে গেল। অত:পর লোকেরা গৃহটিকে [চারপাশে] ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো আর বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলো, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি? রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী। [হাদীস নং-৩২৭১]

৭৯. আনাস ইবনে মালেক [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] [একদিন] আবু বকর, উমর ও উসমানসহ ওহুদ পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলে পাহাড় তাঁদেরকে নিয়ে [খুশিতে] দুলতে লাগল। তখন নবী [সা] বললেন, ওহুদ, স্থির থাক। কেননা তোমার ওপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন। [হাদীস নং-৩৪০০]

৮০. আবু হুরাইরা [রা] নবী [সা] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী [সা] বলেছেন, ইহুদীদের মধ্যে যদি দশজন আমার প্রতি ঈমান আনত তাহলে সমগ্র ইহুদী জাতি আমার প্রতি ঈমান আনত। [হাদীস নং-৩৬৫০] ■

[বি: দ্র: হাদীসগুলো আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'সহীহ বুখারী' থেকে চয়ন করা হয়েছে।]

www.bjilibrary.com

Dr. A. K. M. Waliullah

MBBS Dhaka, D O (DU)
Trained in Sutureless IOL Microsurgery
Eye Specialist & Microsurgeon
Hon. Consultant, Vision Eye Hospital, Dhaka

Specialised Outdoor Service

Vision Care Optics (Rampura Bazar Branch)
316, East Rampura, Dhaka
Phone : 8357459
Visiting Hours : 9:00 AM-11:30 AM
Friday & Saturday Closed
E-mail:akmwali@hotmail.com

Vision Eye Hospital

House # 4/2, Block # D
Lalmatia, Dhaka
Phone : 8113302, 9119109
Visiting Hours :
3:00 PM-6:00 PM (Monday Only)

Vision Care Optics

68/A, East Hajipara, Dhaka.
Phone : 9343029
Visiting Hours : 6.00 PM - 8.30 PM
Friday Closed

"Your Vision is our goal"

রাসূল [সা]-এর জীবন

মোঃ আবেদুর রহমান

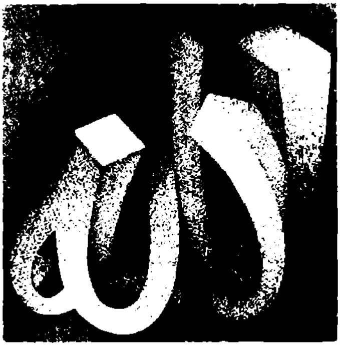

অশান্ত পৃথিবী! মানুষ মানুষকে মারছে। ইরাকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে নারী ও শিশু। ফিলিস্তিনে দখল করে নেয়া হচ্ছে স্বাধীন ভূমি। বিশ্বময় মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য চলছে এক মহাপরিকল্পনা। আর এ কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা। সেই হিরোশিমা-নাগাসাকি থেকে বোমা বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে, আজও চলছে একই কায়দায়। হত্যা, দখল, সন্ত্রাস, সম্পদ লুটপাটসহ এমন কোন কাজ নেই যা তারা করছে না। তারাই আবার মানবাধিকারের কথা বলে! বিপদে-আপদে এগিয়ে যায়। মিডিয়াতে বুলি আওড়ায়। এই সমস্ত কাজে অনেক দেশই তাদের বন্ধু সাজে। মুসলমানদের ধ্বংস করে দিয়ে আমেরিকা পৃথিবীতে একক রাজত্ব কায়েম করতে চায়। তাই তারা ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদ শব্দটি সংযোগ করে মুসলমানদেরকে প্রশ্নবোধক করতে চায়। বস্তুত তারা এককভাবে পৃথিবী শাসন করতে চায়।

কিন্তু তারা যতই মানুষের তৈরী মতবাদ দিয়ে পৃথিবীতে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুক না কেন, তা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের প্রিয় নবী [সা] ছিলেন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমাজ বিনির্মাণের বাস্তব নমুনা। রাসূল [সা] নিজেই ছিলেন আল কুরআনের

www.bjilibrary.com

উদাহরণ। সেই রাসূল [সা] বলেছেন, "একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে যুলুম করবে না, অপমানিত করবে না এবং অসম্মান করবে না।" সমাজে মুসলমান ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তারাও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের সাথে মিলেমিশে না থাকলে সামাজিক ভারসাম্য থাকে না। তাই তিনি বলেছেন, "কোন অমুসলিম নাগরিককে যে অত্যাচার করলো বা তার অধিকার ক্ষুণ্ন করলো বা তাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করালো বা তার অমতে তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে নিল, কিয়ামতের দিন আমি হবো তার বিপক্ষে মামলা দায়েরকারী।"

তিনি আরো বলেন, "কোন সংখ্যালঘুকে যে হত্যা করলো সে বেহেস্তের ঘ্রাণও উপভোগ করতে পারবে না, অথচ বেহেস্তের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও অনুভব করা যাবে।"

সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় এসব অসাধারণ নির্দেশনা ও সুবিচারপূর্ণ বিধান দুনিয়ার কোন ধর্ম কিংবা মতবাদে বলা হয়নি। কিন্তু আমরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বিজাতীয়দের দেয়া আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখি! কী আশ্চর্যের ব্যাপার!

ইসলামকে আমরা শুধু ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের চেষ্টা করি। বর্তমানে এই ঘূণে ধরা সমাজ রক্ষা করতে হলে, সমাজে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে এবং একটি সভ্য সমাজ গড়তে হলে রাসূল [সা]-এর চরিত্রকেই ধারণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

পৃথিবীতে সকল অমুসলিম গবেষক রাসূল [সা]-কে সেরা মানুষ হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন কিন্তু তাঁর কর্ম-কৌশল সকলে গ্রহণ করছেন না।

এই দ্বিমুখী চিন্তা থেকে বিশ্বকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ যেটা ভাল বলে স্বীকার করবো তা গ্রহণ করবো না– এটাই মূলত নিজের সাথে প্রতারণার শামিল। আজ আমাদের দেশের অনেক নেতা-নেত্রী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামবিদ্বেষী। তারা ইসলামকে শুধু নামায, রোযা ও ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। আর সমাজের অন্যান্য সকল কাজ নিজেদের তৈরী নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনা করেন, সমস্যাটা এখানেই। কারণ "Islam is the complete code of life."

অন্যরা কথাটি জানলেও মানেন না। কারণ একটাই সমস্যা– নিজেদের জারিজুরি শেষ হয়ে যাবে। যার ফলে আজকে আমাদের সমাজে এত বিপর্যয়, এত হানাহানি, এত অসঙ্গতি!

কিন্তু সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। শেষ বিচারের দিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। যার যত বড় দায়িত্ব তার তত বড় হিসাব। তাই জেনে বুঝে সমাজকে অধ:পতনের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। এই আশরাফুল মাখলুককে বিপদে ফেলা আদৌ ঠিক নয়।

আসুন, আমরা সকলেই রাসূলের [সা] জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে এই পৃথিবীকে পরিবর্তিত করি। একটি সুন্দর সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে আমরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করি।■

www.bjilibrary.com

আশেকে রাসূল ॥ হা রু ন ই ব নে শা হা দা ত

সত্যি কি তোমায় ভালবাসি আমি
নাকি ভণ্ড প্রেমিক,
ভালবাসার মানে কি সফেদ পাঞ্জাবী-পায়জামা, সভা, সমাবেশ,
বিবৃতি, না'ত আর মর্সিয়া ক্রন্দন!

বনের বাঁশ বিচ্ছেদ ব্যথায় কাঁদে যখন তাকে বলি বাঁশী
তার সে কান্না বন্ধন ছেঁড়ার বিলাপ,
প্রতি মুহূর্তে ছিঁড়ছি তোমার বন্ধন নিজের খায়েশের রঙের তালাশে,
তারপরও জায়নামাজে মসজিদে মাহফিলে সরব আমি তোমার বন্দনায়!

তোমার ভালবাসা জগতের সকল মানুষের জন্য
কিন্তু আমি আছি শুধু তোমায় নিয়ে,
মানুষের দিকে তাকাবো সে সময় কোথায়?
তোমার নামে বুকে অস্ত্র বেঁধে তোমার ভালবাসাকে হত্যা করে
উল্লাসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলি, তোমায় ভালবাসলাম।

জায়নামাযে মসজিদে মাদরাসায় মাহফিলে যতক্ষণ
আমার হৃদয়েও ততটা সময় তোমার পবিত্র আসন
এরপর যেখানে যাই সযতনে রেখে যাই রেহালে,
সেখানে বিচ্ছেদের কবিতা নয়, শোষণের হাতিয়ারে শান দিই
তার নাম দিই আইন, মানুষের মুক্তিসনদ ন্যায়দণ্ড।

তারপরও কি দম্ভ উক্তি– ভালবাসি তোমায়, হে রাসূল, তুমি আমার ভালবাসা।
হাশরে তোমার হাউজে কাউসারের শীতল পানি পান করে
কলিজা ঠাণ্ডা করব, ভালবাসা ভরা তৃষিত নয়নে দেখব তোমায়
আশেকে রাসূল আমি, নাকি আত্মার সাথে শুধুই প্রতারণা,
আঁধার পথের এক যাত্রী!

www.bjilibrary.com

না'তে রাসূল ॥ আমিনুল ইসলাম

সাল্লি আলা সাল্লি আলা
মুহাম্মদ রাসূল
উষর মরুর ধূসর বনে
ফুটলো রঙিন ফুল।
মুগ্ধ হলো বিশ্ব ভুবন
ফুলের সুবাস পেয়ে
মাতাল হলো বাতাস শুধু
নাচলো গজল গেয়ে
　　আমরা যেন হতে পারি
　　বেকারার বুলবুল ॥

ম্লান হলো চাঁদের হাসি
তাকিয়ে ফুলের দিকে
কুল আলমের রূপ মহিমা
হলোই বুঝি ফিকে
　　পরশ পেয়ে হয়ে যাবো
　　দেওয়ানা বিলকুল ॥
সাল্লি আলা সাল্লি আলা
মুহাম্মদ রাসূল
তাঁর দেখানো পথ অমলিন
নড়বো না এক চুল।

উসওয়াতুন হাসানা ॥ ইয়াকুব বিশ্বাস

হাল পাল সব হারিয়ে যদি
মাঝ দরিয়ায় ওঠে তুফান
ঈশান কোণে কালো মেঘের গর্জন
বাদল গ্রাসে প্রবল ঘূর্ণিঝড়
আঁধার কালোতে ছেয়ে যায় দু'চোখ
হারিয়ে যায় নাবিকের সকল দিক
পেছনে আর কেউ না থাকে
স্বপ্ন হারিয়ে নিরাশার বালুচরে
হঠাৎ নামে অদ্ভুত এক আঁধার

www.bjilibrary.com

তাই বলে কি থমকে যাবে!
না! ধর আবার হাল, তোল পাল
তুমি যে চিরসত্যের নাবিক
ঐ যে দূরে চোখ মেলে দেখ
হেরার রাজতোরণ নিয়ে
সোবহে সাদিকের রক্তিম আভায়
হাতছানিতে ডাকছে তোমায়
উসওয়াতুন হাসানা।

রাসূলকে কিভাবে দেখবো ॥ মু হা ম্ম দ ই স মা ঈ ল

আমরা কত আদর্শের কথা বলি
অথচ একবারও কি ভেবে দেখেছি
রাসূলের আদর্শই বড় আদর্শ!
আমরা বড় বড় নেতার কথা বলি
একবারও কি ভেবে দেখেছি
রাসূলের মত বড় নেতা আর আসেনি?
আমরা বড় বড় বিজ্ঞানীর কথা বলি
একবারও কি ভেবে দেখেছি
রাসূলের মত বড় বিজ্ঞানী আর আসেনি?

আমরা নির্যাতনের কথা বলি,
অথচ একবারও কি ভেবে দেখেছি
রাসূলের মত নির্যাতন কেউ সহ্য করেনি?
আমরা সন্ত্রাসের কথা বলি,
অথচ কখনো ভেবে দেখিনি
সন্ত্রাসকে নির্মূল করার জন্য
কিভাবে হিলফুল ফুজুল গঠন করেছিলেন
রাসূল আমার!

www.bjilibrary.com

রাসূলের ছবি ॥ নূর আল ইসলাম

প্রশান্ত যাঁর মুখের গড়ন কোমলতায় ভরা
বসন্ত তাঁর নির্মলতায় ভরলো বসুন্ধরা।
চোখ দু'টো তাঁর ডাগর কালো সুরমা টানা টানা
স্বল্পভাষী বন্ধুসুলভ মধুর স্বভাবখানা।
জোড়া ভুরু কোঁকড়ানো চুল লম্বা ঘন কালো,
তারই মাঝে মুখচ্ছবি জ্যোতির মত আলো।
দূরে থেকে চিত্তটাকে টেনে নিতেন কাছে
কাছে গেলে পেতো যত মিষ্ট স্বভাব আছে।
অহংকারী বাহুল্যতামুক্ত ছিলেন যিনি,
মিষ্টভাষী পষ্টভাষী জোয়ান ছিলেন তিনি।
গঠন ছিল সুঠামদেহী হালকা গড়নধারী
মোটা বেটে লম্বা গেটে ছিল না যে ভারী।
সাহাবীরা প্রাণের চেয়ে বাসতো ভালো তাঁকে
তাঁর কথাতে অকাতরে বিলাতো প্রাণটাকে।
তিনি যখন কোন কথা বলতেন নিচু স্বরে
নীরব হয়ে শুনতো সবে নিমগ্ন অন্তরে।
যখন তিনি হুকুম দিতেন কারো কোনো কাজে
ছুটে গিয়ে তামিল হতো সকাল বিকাল সাঁঝে।
অনুসরণ করতো যেমন আলোর পাশে ছায়া
অনুকরণ করতো তেমন হৃদয় জুড়ে মায়া।
তাঁর মতো আর একটি মানুষ আসবে না যে ফিরে,
সালাম দরুদ পাঠাই আসুন সেই না নবীজীরে!

তুমি নেই বলে ॥ রেহানা রুমি সুবর্ণা

তুমি নেই বলে ভোরের মৃদু সমীরণ হৃদয় জুড়ায় না
পাখিরা যদিও বা ডাকে সুর ধরার ভরসা পায় না
তুমি নেই বলে সূর্য অম্লান থাকে, ঝিলিক মারে না
উষার আবছা আলোর ন্যায় ব্যথিত বদন খানা
তুমি নেই বলে পুষ্পরা নিথর যেন, সুবাস ছড়ায় না
বাতাস যদিও দোলায় মাথা, মুখে হাসি ফোটে না
তুমি নেই বলে, হে রাসূল
শিশুরা খেলার সাথী পায় না
স্নেহপাগল এতিমরা তোমার
খুঁজে ফেরে আস্তানা।

www.bjilibrary.com

রাসূল আমার ॥ মা হ তা ব উ দ্দী ন আ হ মে দ

উছলে পড়া লক্ষ চাঁদের স্নিগ্ধ আলোক ধারা
মা আমিনার ঘরখানি তাই উজ্জ্বলতায় ভরা।
কোন অতিথি আসলো যে আজ তাঁর রূপেরেই ছটা
নিখিল জগৎ পূর্ণ হলো সেই সুখেরই ঘটা।
ধূসর মরুর তীব্র তাপে আলোক ঝরা ফুল
রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদ রাসূল।
অনাচারের অন্ধকারে আরব জাহান যখন
হাবুডুবু খাচ্ছে সবাই, জন্ম নিলেন তখন।

শান্তিধারার মূর্ত প্রতীক এলেন মহানবী
পুড়িয়ে ফেলে সব জঞ্জাল আঁকলেন নতুন ছবি।
যাঁর সুবাসে সুবাসিত হলো গোলাপ ফুল
সেই সুবাসে সুবাসিত সকল মুমিনকুল।

হে রাসূল ॥ আ নো য়া রু ল কা ই য়ূ ম কা জ ল

তাওহিদী মন্ত্রে এনেছ
পাপ-পংকিলতা বিদারি শরতের শুভ্র সকাল,
মরুতে মরুতে সবুজ-শ্যামল উদ্যান, হীরা-মণি মুক্তা দানা।
অধিকারহারা বঞ্চিত মানবতার জয়গান
পথহারা মানুষের নবজীবনের সত্যদিশা।
তুমি—
সত্যের সংগ্রামে বীর সেনানী
বিশ্ব সভ্যতার শান্তি মশাল
ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব ও সমৃদ্ধির বার্তাবাহী
বিজয় সুখের কল্লোলিত ফল্গুধারা
মহাজাগরণের বংশীবাদক মানবতার মহান মুক্তিদূত।
ঘনঘোর অন্ধকার অমানিশায়; আলো ঝলমল
মুক্ত পৃথিবীর প্রদীপ, দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ
সৌরভ মোহিত কাননে ফোটা ফুল
আমার প্রিয় রাসূল।

www.bjilibrary.com

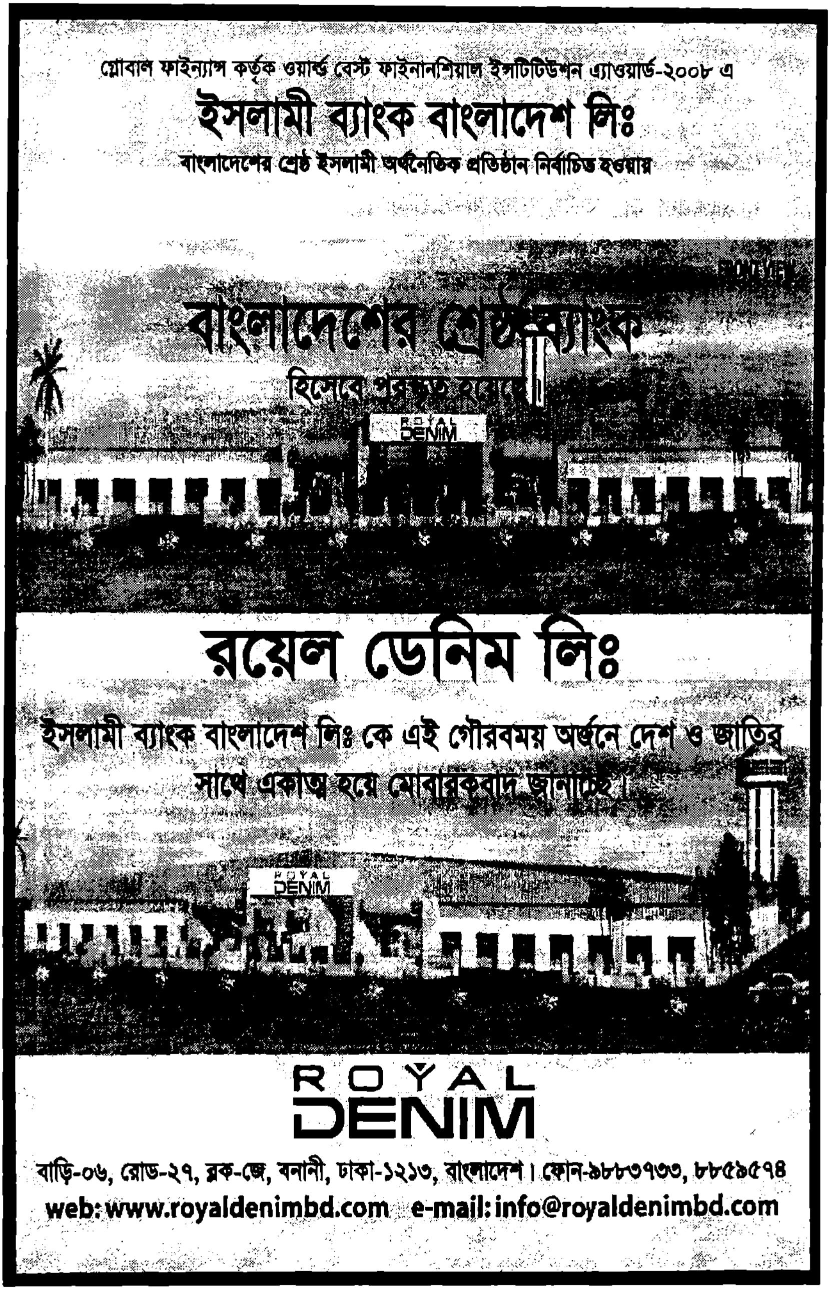

www.bjilibrary.com

বিশ্ব শান্তির পথ

ইকবাল কবীর মোহন

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ঝলমল আধুনিক বিশ্ব আজ অশান্তির তীব্রতায় বিপর্যস্ত। চরম অশান্তি ও অস্থিরতার কষাঘাতে জনজীবন জর্জরিত নয় এমনটি চিত্র আজ দুর্লভ। একটু কান পাতলেই আমরা বাতাসে শুনতে পাই লক্ষ-কোটি বনি আদমের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, কি রাষ্ট্র– সর্বত্রই যেন অশান্তির ঘোর অন্ধকার! চারদিকে হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার সংঘাত যেন প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া করে ফিরছে। বিশ্ব সমাজে এখন অনৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধের চলছে একান্ত অভাব। মানবীয় সাধনার ব্যর্থতা ও চরম অবক্ষয়ের এই বিবর্ণ পরিবেশে মূল্যবোধের জন্য, শান্তি ও সুস্থির প্রত্যাশায় সবার মধ্যে করুণ আর্তি ও নির্মম হাহাকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চরম হতাশার বিষয় এই যে, মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো আজ তাদের জীবন থেকে নির্বাসিত, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের সৌন্দর্য এখন গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানব কল্যাণ ও মহত্ত্বের পরিচর্যা আজ প্রতারণার শিকার। মানুষে হিংসা, বিভেদ ও কলহ আমাদের সমাজ জীবনকে করেছে বিষাক্ত। শোষণ, জুলুম, অবিচার, নিপীড়ন, আত্মপূজা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও মনুষ্যত্বহীনতা সমাজ দেহের সর্বত্র অস্থিতার বিষ ঢেলে দিয়েছে।

www.bjilibrary.com

চরিত্রহীনতা, শঠতা, কপটতা, ভাওতা, রাজনৈতিক জবরদখল, স্বেচ্ছাচারিতা ও বল প্রয়োগ আমাদের স্বপ্নিল দুনিয়াকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করেছে। প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, দয়া-মায়া, কল্যাণ ও সুন্দর কামনা আজ নির্বাসিত। ফলে শুধু শান্তির অন্বেষণেই মানুষ ছুটছে দিগ্‌বিদিক। কেউ কেউ হতাশার তীব্রতায় হচ্ছে নেশাগ্রস্ত। শুধু শান্তির জন্যই পৃথিবী জুড়ে বাড়ছে আত্মহত্যার সংখ্যা। মানুষের অন্তর্লোক মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা ও আত্মহননের বিষবাষ্পে।

অশান্তির অর্থ

ইংরেজি ডিকশনারীতে অশান্তি বলতে Want of peace, disorder, disturbance, confusion ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আর বাংলা ডিকশনারীতে অশান্তি বলতে শান্তির অভাব, মানসিক যন্ত্রণা, কলহ, গোলমাল বা গোলযোগ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। আরবীতে অশান্তির প্রতিশব্দ ফাসাদ। Dictionary of Modern written Arabic-এ ফাসাদের অর্থ করা হয়েছে নিরতিশয় মন্দ, খারাপ, ক্ষতিগ্রস্ত করা ইত্যাদি। এসব বিবেচনায় মানুষের মধ্যে যে নানাবিধ মানসিক অস্থিরতা, যন্ত্রণা ও কাতরতা, মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে, সমাজে সমাজে ও দেশে দেশে যতসব গোলযোগ, সংঘাত, কলহ, সংঘর্ষ, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ-এর সবই এক কথায় অশান্তির আওতায় পড়ে।

অশান্তির কারণ

আজকের বিশ্বে অশান্তির যে ভয়ানক দাবানল জ্বলছে তার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। অশান্তির মূলে রয়েছে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার আনুগত্যের বিমুখতা, তাঁর ঐশী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, মানুষের তার শ্রেষ্ঠত্বকে বেমালুম ভুলে যাওয়া, সত্য ও সুন্দরের নির্মল আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে পাপ, পঙ্কিলতা ও অনৈতিকতার অন্ধকার গলিপথে বিচরণ, মানবরচিত মতবাদকে আঁকড়ে ধরে অহেতুক শান্তি খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াস, মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা, ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, দুর্বল মানুষের ওপর সবলের অত্যাচার ও নিপীড়ন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘৃণ্য উচ্চাভিলাষ। মোটা দাগে বলতে গেলে অশান্তির কারণগুলো হলো ১. স্রষ্টাপ্রদত্ত আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, ২. এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে বহু খোদার অনুসরণ, ৩. পরিবর্তিত বিভিন্ন ধর্ম ও আদর্শের প্রচার ও প্রসার, ৪. মানুষের মনগড়া নানান মতবাদের অন্ধ অনুকরণ, ৫. মনুষ্যত্ব ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, ৬. সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি, ৭. আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংস্থাগুলোর পক্ষপাতমূলক আচরণ ইত্যাদি।

অশান্তির মূলে কারা দায়ী

আদর্শ বা মতবাদ যা-ই হোক না কেন, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষই বিশ্বের যাবতীয় অশান্তি ও অনাচারের মূল চালিকাশক্তি। ওপরে যেসব কারণকে বিশ্ব শান্তির পথে অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তার পক্ষগুলোও আমাদের কারো অজানা নেই। শান্তিপ্রয়াসী দুনিয়াবাসীর সামনে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ধর্মীয় আদর্শগুলোর মধ্যে খ্রিস্ট, ইহুদী ও হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম বিরাট জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে

www.bjilibrary.com

বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যচ্যুত করে চলেছে। কেননা আদর্শ হিসেবে এসব ধর্মের এখন আর কার্যকারিতা নেই। এসব ধর্মের রক্ষক ও দিশারীর ভূমিকায় রয়েছে অভিশপ্ত ইহুদী গোষ্ঠী ও সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল, খ্রিস্ট ধর্মের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা ও তার দোসর পশ্চিমা বিশ্ব। আর পৌত্তলিকতার ধারক হিসেবে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই চারটি শক্তি দুনিয়াকে পদানত করে শাসন ও শোষণ করার কারণে যে সামাজিক অস্থিরতার জন্ম হয়েছে তা বিশ্ব শান্তিকে জটিল করে তুলেছে। পরিণামে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্যভাবে পৃথিবীকে অহরহ কাঁপিয়ে তুলেছে। তা ছাড়া মানবরচিত পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতো অসার মতবাদগুলোর ব্যর্থতা বিশ্বের মানুষকে মুখোমুখি করেছে চরম বৈষম্য, দীর্ঘ হানাহানি ও সংঘাত, অন্তহীন অভাব, অনটন ও বেকারত্ব, সীমাহীন অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ও মন্দা এবং ভয়ানক সন্ত্রাস ও উগ্রতার সাথে। এরই সাথে এসে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব শান্তি ও সমঝোতার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা, সংগঠন ও ফোরামগুলোর [যেমন জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ন্যাম ইত্যাদি] বিবেকবর্জিত পক্ষপাতিত্ব, একদেশদর্শিতা ও বর্ণবাদী মনোভাব। ফলে শান্তির শেষ আশাটুকু পর্যন্ত এখন নিঃশেষের পথে। এর ফলে বিশ্বের বিশাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক মানবাধিকার অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে। আজ আমরা ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মীর, গাজাসহ বিশ্বের নানা স্থানে যে রক্তক্ষরণ চলছে গোটা বিশ্বের কাছে তা জলজ্যান্ত প্রমাণ। এ ছাড়া বিশ্বের তাবৎ মানুষের অর্থনৈতিক ও মানবিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নামে যেসব প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছে [যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ ইত্যাদি] সেগুলোর বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক নীতির কারণেও বেড়েছে মানুষের অশান্তি। এর ফলে একদিকে মানুষ যেমন হারাচ্ছে তাদের রাজনৈতিক অধিকার, তেমনি হারিয়েছে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও। সামনে পথ চলার মতো আলোর দিশাও এখন তাদের জানা নেই। এর জন্য দায়ী হলো সেই বিকৃত হয়ে যাওয়া ধর্মীয় আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা এবং মানবরচিত নানা মতবাদের ব্যর্থতা।

মানবরচিত মতবাদগুলো ব্যর্থ

বর্তমান বিশ্বে অনুসরণীয় বিভিন্ন ধর্মের অকার্যকারিতা আলোচনার আগে বিশ্বে প্রচলিত ও ব্যাপকভাবে আলোচিত কয়েকটি মতবাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করা যেতে পারে। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে পুঁজিবাদের কথাই ধরা যাক। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আড়ালে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সেক্যুলারতন্ত্রের নামে খোদায়ী আইন ও জীবন বিধানকে অস্বীকার করে উপযোগবাদ ও ভোগবাদকে তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে যথেচ্ছ ভোগবিলাস ও অবাধ স্বাধীনতার নামে অনৈতিক বেহায়াপনা ও বেলাল্লাপনা গোটা পাশ্চাত্য ও তার অনুসারী দেশগুলোর মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ফলে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি ও অন্যান্য অসামাজিক কর্মকাণ্ড ঐসব দেশের মানুষেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাষ্ট্র দর্শন ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বে যে রাজনৈতিক অরাজকতা ও স্বৈরতান্ত্রিক মডেলের রাজনীতি এবং অন্য দেশ দখলের নীতির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে তার নজির ও পরিণাম

www.bjilibrary.com

নিকট অতীতে বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে। দুই দু'টি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ সংগঠন ও কোটি কোটি মানুষের জীবনাবসান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থারই বীভৎস পুরস্কার। গায়ের জোরে অর্ধ শতকব্যাপী ফিলিস্তিনে মানব হত্যায় মদদ, ভিয়েতনামে নারকীয় বর্বরতা চালানো, ইরাক-ইরান সংঘাতে উস্কানি, স্বাধীন দেশ আফগানিস্তান ও ইরাক দখল, ইরানে অন্যায়ভাবে অবরোধ আরোপসহ অতীতে ও বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী আমেরিকা ও তার দোসর পশ্চিমাদের আসল চরিত্র। আর অর্থনৈতিক আদর্শ হিসেবেও দুনিয়া জুড়ে শোষণ, বৈষম্য ও মন্দা সৃষ্টিতে পুঁজিবাদের জুড়ি নেই। তাই মতবাদ হিসেবে পুঁজিবাদের সমালোচনায় মুখর সারা বিশ্বের বিবেকবান মনীষী ও চিন্তাবিদরা। পাশ্চাত্য দার্শনিক এইচ.জি. ওয়েলস পুঁজিবাদের ব্যর্থতা তুলে ধরে বলেছেন, পুঁজিবাদ মানে অনিয়ন্ত্রিত অর্থোপার্জনের মানসিকতা এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হলেও বিকৃত সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পথ। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাসকি বলেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই নিন্দনীয়। এই ব্যবস্থায় মানুষ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে পরান্নজীবিরা মানুষ হিসেবে বাঁচার সমগ্র উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রফেসর হাম পুঁজিবাদের দুর্বলতা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, পুঁজিবাদের ফলে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, সম্পদ ও আয়ের মধ্যে অসমতা তৈরি হয়, একচেটিয়াবাদের জন্ম হয় এবং বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী দর্শনের কুফল হচ্ছে আজকের বিশ্বের চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়, ভোগবিলাস ও হীন মানসিকতার ফলে মূল্যবোধের বিপর্যয়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উদগ্র বিস্তার।

আমরা সবাই জানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈষম্যমূলক ও অপচয়মূলক নীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয় আরেক প্রান্তিক মতাদর্শ সমাজতন্ত্র। এই মতাদর্শ ধর্মকে পুরোপুরি অস্বীকার করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও সমতার যে স্লোগান নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল মাত্র সত্তর বছরের মাথায় তার আদর্শের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। খোদায়ী আইনের বিরোধিতা করে সমতা ও শান্তির নামে সমাজতন্ত্রও আরেক সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতিভূ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে আমরা ষাট ও সত্তরের দশকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার দেশ দখল ও সমাজতন্ত্র বিস্তারের যে রক্তাক্ত নজির দেখেছি তা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি মানবতাবিরোধী। কিন্তু সমাজতন্ত্র আজ তার নিজ জন্মভূমিতেই পরবাসী। তার মানে আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকার্যকর। মতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি চমকপ্রদ স্লোগান। পশ্চিমা জগতে তো বটেই, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এই আদর্শের জয় জয়কার। তবে এটি একটি ধর্মহীন মতবাদ হিসেবে ইতোমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছে এবং চরম অসহিষ্ণু ও উগ্র মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভারতের ইতিহাস দেখলে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেখানে অন্যান্য ধর্মের মানুষের জীবন ও ধর্ম কখনই নিরাপদ ছিল না। ভারতের কথাই যদি ধরি, তাহলে

www.bjilibrary.com

দেখা যায়, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শোষণ ও নিপীড়নে কিভাবে মুসলমানসহ সংখ্যালঘু নীচু সম্প্রদায়ের লোকেরা উৎপীড়িত হচ্ছে। রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বারবার দাংগায় প্রায়ই মুসলমানের রক্ত ঝরছে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে নীচু সম্প্রদায়ের মানুষ ও মুসলমানদের জীবন ও ধর্ম ক্ষমতাসীন কুলীন ভারতীয়দের বৈরিতার শিকার হয়েছে। ফলে বিভিন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামার নামে কত মুসলমানের জীবন যে ঝরে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সর্বশেষ আমরা গুজরাটের নারকীয় ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের কথা স্মরণ করতে পারি। তাদের ধর্মীয় অধিকার পর্যন্ত নেই। ভারতে মাইকে আযান দেয়া, কুরবানী করাসহ আরো অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলমানরা বাধার সম্মুখীন। প্রায় প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলমান দাঙ্গায় নিহত হবার খবর আমাদের কারো অজানা নেই। পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোতেও মুসলমানদের স্বাধীনতা খুবই সীমিত। ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোতে কাগজে কলমে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার হলেও অপর ধর্মের স্বাধীনতা সেখানে নেই মোটেও। সেখানে অবাধে ধর্মীয় রীতি পালন, মুসলমান মেয়েদের হিজাব পরা ও মুসলিম সংগঠন করার ব্যাপারে যেসব বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে তা ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অসারতাই প্রমাণ করে।

মানবতার মুক্তির আদর্শ— ইসলাম

আজ যে নানাবিধ সমস্যা, অশান্তি ও অস্থিরতার বেড়াজালে মানবতা বিপর্যস্ত তা কিন্তু নতুন কিছু নয়। যুগে যুগে পৃথিবীর মানুষ এ ধরনের অন্ধকার সভ্যতার মুখোমুখি হয়েছে। মানব ইতিহাসের পেছনের দিকে একটু ফিরে তাকালেই আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি মানুষ কীভাবে বারবার পথহারা হয়েছে, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে অশান্তির দাবানলে হাবুডুবু খেয়েছে। তারপর আবার ফিরে পেয়েছে সঠিক পথ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখাবার জন্য ঐশী বাণীসহ তাঁর প্রিয় নবী-রাসূলদের মানুষের মাঝে পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষের কাছে হেদায়াতের বাণী নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন, নিয়ে এসেছিলেন শান্তির পয়গাম। এই যে শান্তির বাণী তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন, তা আর কিছুই নয়। তাঁদের এই বাণীর সারবত্তা ছিল ইসলাম। এ ব্যাপারে সূরা আন নিসার ১৬৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন, 'আমি তো তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম।' আর এই ইসলামের বাণীকেই মানবতার হেদায়াতের একমাত্র পথনির্দেশ বলে উল্লেখ করেছেন মহান স্রষ্টা। সূরা আলে-ইমরানের ১৯ নং আয়াতে এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "নি:সন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন [জীবন ব্যবস্থা]।" তার মানে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এবং প্রকৃত কল্যাণের বিধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলামকে একমাত্র দীন হিসেবে ঘোষণার সাথে সাথে অন্য যে কোন আদর্শ বা মতবাদকে বর্জনীয় ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে-ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে ঘোষণা করে বলেছেন, "কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য

www.bjilibrary.com

কোন দীন গ্রহণ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" এই আয়াতের মাধ্যমে শেষ নবী মুহাম্মাদ [সা] প্রদর্শিত জীবন বিধান ব্যতীত অন্য সব ধর্মকে অকার্যকর ও যাবতীয় মতাদর্শকে অসার ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঐসব মত ও পথকে ক্ষতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কে আল্লাহ তায়ালা আখেরী নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।" স্বাভাবিকভাবেই মহানবী [সা]-এর মাধ্যমে ইসলামের এই ধারা পূর্ণাঙ্গ লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ কথার ঘোষণা দিয়েছেন সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে। আল্লাপাক বলেছেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" এই আয়াতের মাধ্যমে ইমলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে যেমন স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি এই ব্যবস্থাই মানুষের জন্য অনুকরণীয় একমাত্র পথ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির চলার জন্য আর কোন বিধানের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়েছে। আরো লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা বিধানের সাথে সাথে যে নবীর মাধ্যমে তিনি রিসালাতের ধারাও সমাপ্ত করেছেন তাঁর সম্পর্কে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং বলেছেন, "আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।" মহানবী [সা]-এর আদর্শকে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ।" একই সাথে এই সেরা মানুষটির চরিত্র মাধুর্যের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তায়লা সূরা কলমের ৪ নং আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" আল্লাহর নবী [সা] নিজেও তিরমিযী শরীফের একটি হাদিসে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহপাকের নিকট সকল সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হলাম আমি। "এতে আমার গর্বের কিছুই নেই।" যেই মানুষটিকে আল্লাহ তায়ালা সেরা মানুষ হিসেবে উত্তম চরিত্র দিয়ে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর প্রদর্শিত এই বিধানের আলোকে জীবন পরিচালনা করলেই কেবল মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ও কল্যাণ বিধান হতে পারে।

আমরা আল্লাহর নবীর দেখানো বিধানের আলোকে মানুষের কল্যাণ ও অধিকারের কয়েকটি বিষয় খতিয়ে দেখলে দেখতে পাব, কেবল ইসলামই পারে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। নবুয়াতের পরবর্তী তেইশ বছরে মহানবী [সা] মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে মানুষ ও মানবতার জন্য কল্যাণ ও প্রশান্তির যে মডেল স্থাপন করে গিয়েছেন তা আজও অনন্য। আজ গোটা বিশ্বে মানুষের অধিকার, বিশেষ করে ধর্মীয় অধিকার যেভাবে ভূলুণ্ঠিত মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত মদীনার সমাজে মানুষের সেই অধিকার ছিল স্বীকৃত। মানুষ তখন ধর্ম গ্রহণ

www.bjilibrary.com

করা না করার ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। সূরা আল বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "যেহেতু আল্লাহ সত্য মিথ্যা পরিষ্কার করে দিয়েছেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে, তাই ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই।" এই নির্দেশ তিনি নিজেও যথাযথভাবে পালন করেছেন। আজও সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর এই নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক বিশ্বে ধনী লোকেরা ও ধনী রাষ্ট্রগুলো দুর্বলের মান-সম্মান ও জীবন নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি খেলে তার ছিটাফোঁটাও ছিল না রাসূলের [সা] সমাজে। সমাজের অভাবী ও অসহায় মানুষের প্রয়োজন মেটানোকে আল্লাহ মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের অসিলা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা আল বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি অভাবী আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, পথিক ও প্রার্থীকে ধন-সম্পদ দান করে, অন্য লোকদের তাদের ঋণ, দাসত্ব কিংবা কয়েদ অবস্থা হতে মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য করে এবং সালাত ও যাকাত আদায় করে একমাত্র তারাই পুণ্য লাভ করতে পারে।" আজ বিশ্বব্যাপী শ্রমিকের অধিকার ও তাদের প্রাপ্তি নিয়ে মালিক ও রাষ্ট্রপক্ষের কাছ থেকে যে অবহেলা ও অনীহা চলছে তার কারণে প্রায় প্রতিটি দেশেই লেগে আছে শ্রমিক অসন্তোষ, অথচ এসব নিরীহ মানুষের অধিকারের ব্যাপারে রাসূল [সা] বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি পরিশোধ কর।" আমরা আজকাল নারী অধিকার ও নারী আন্দোলন নিয়ে বেশ হৈ চৈ করছি। সারা দুনিয়ায়, বিশেষ করে উন্নত পশ্চিমা বিশ্বে নারীরা নানাভাবে নিগৃহীত, অসম্মানের জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। অথচ তাদের অধিকার ও সম্মানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে ইসলাম। ইসলাম-পূর্ব আরবের অন্ধকার সমাজে তখন মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এই জঘন্য অপরাধ রোধ করে নবীজি নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কন্যা সন্তানকে হত্যা করো না।" ঐদিকে আল কুরআন ঘোষণা করলো, "পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদের অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশী।" আজকের পশ্চিমা বিশ্বে পুরুষের কাছে স্ত্রীরা যেখানে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত সেখানে আল কুরআন সূরা আন নিসার ১৯ নং আয়াতে স্ত্রীদের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হয়ে ঘোষণা করেছে, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবন যাপন করবে।" সমাজে মানুষে মানুষে মিলেমিশে থাকা এবং প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহর নবী [সা]-এর সে কী অমিয় বাণী যেখানে তিনি বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।" তিনি আরো বলেছেন, "যে ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহকারে খানা খায়, অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে পড়ে থাকে অভুক্ত অবস্থায়।' বর্তমান দুনিয়ায় বড় একটি সমস্যা হচ্ছে ধর্মীয় বিরোধ ও বিদ্বেষ। বিশেষ করে মুসলমানরা সারা দুনিয়ায় চরমধর্মী বৈষম্যের শিকার, অথচ মানবতার নবী [সা] অমুসলিমদের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, "মনে রেখ, যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে

www.bjilibrary.com

কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানি করে অথবা তার কোন সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে পক্ষ অবলম্বন করবো।" এভাবে দেখা যায়, প্রতিটি সামাজিক বিষয়ে ইসলামের বিধান কল্যাণমুখী এবং শান্তি ও স্থিতির অনুকূলে।

ইসলামই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, মহানবীই [সা] একমাত্র অনুসরণীয়

'ইসলাম' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা। এই জীবন বিধান কায়েম করেই আল্লাহর রাসূল দুনিয়াতে শান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখি, মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুফল শুধু মুসলমানরাই উপভোগ করেনি, অমুসলিম জনগণ ও ইসলামবিদ্বেষী মানুষও এর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত। এর ফলে ইসলাম অতি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন অর্ধ পৃথিবীর মানুষ মুসলিম শাসনাধীনে বাস করত। মহানবী [সা] এমন এক শান্তির সমাজ কায়েম করেছিলেন যেখানে এক সময় যাকাত নেয়ার মতো লোকের অভাব পড়ে গিয়েছিল। আনসার-মুহাজির মিলে মুসলিম-অমুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে এক অনন্য মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হয়েছিল দুনিয়াবাসী এর দ্বিতীয়টি আর অবলোকন করেনি। তাই মহানবী [সা]-এর জীবন ও তাঁর আদর্শ ইসলামকে অনেক অমুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদও প্রশংসা না করে পারেননি। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ল্যামারটিন মহানবী [সা]-ও ইসলাম সম্পর্কে যে চমৎকার মন্ত ব্য করেছেন সত্যিই অনন্য। তিনি বলেছেন, "মুহাম্মাদ সেনাবাহিনী, আইন, শাসন, সাম্রাজ্য, সভ্যতার অন্ধকার সময়ে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনপদকে শুধু পরিবর্তন করেননি, বরং এর চেয়েও গুরুত্বপর্ণ যে, তিনি অসংখ্য দেবতা, কল্পিত ধর্ম বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, এমন কি মানবের হৃদয়কে বিজয় করার এক মহাবিপ্লবের কর্মসূচী নিয়ে এসেছিলেন। একটি কিতাব ছিল এসব পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি যার প্রতিটি বর্ণ আইন ও সংবিধান।' এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতো নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দাবী করেছে, "তিনি মানে মুহাম্মাদ [সা] জগতের ধর্ম প্রবর্তকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফলকাম পয়গম্বর।" ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'দি হানড্রেড, এ র‍্যাংকিং অফ দি মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল পারসনস ইন হিস্টরী' বইতে একজন বিশ্বখ্যাত অমুসলিম ব্যক্তি মাইকেল হার্ট দাবী করেছেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল বিরল ব্যক্তিত্ব অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর স্থান সবার শীর্ষে।" ১৮৪০ সালে এডিনবার্গের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে নিবেদিতপ্রাণ খ্রিস্টান ধর্মযাজক বসওয়ার্থ স্মীথ মুহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে বলেছেন, "ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদ ছিলেন একাধারে 'পোপ' ও 'সীজার'।" কিন্তু পোপের অসম্ভব দাবী অথবা সীজারের বিশাল সৈন্যবাহিনী কোনটাই তাঁর ছিল না। যদি কোন মানুষ স্থায়ী সেনাবাহিনী, দেহরক্ষী, রাজপ্রাসাদ, নির্দিষ্ট রাজস্ব ছাড়া কেবল ঐশ্বরিক অধিকার বলে রাজ্য শাসন করার দাবী করতে পারেন, তবে মুহাম্মাদই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি।" ওদিকে বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক জন ড্রেপার তার "এ হিস্টরী অফ দি ইনটেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অব ইউরোপ" শীর্ষক গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন, "মুহাম্মাদ এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি মানব

www.bjilibrary.com

ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।" আমরা নামকরা ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও চরম ইসলামবিদ্বেষী সমালোচক এইচ. জি. ওয়েলসের মুখেও মুহাম্মাদ [সা]-এর স্তুতি দেখে অবাক হই! তিনি বলেছেন, "মুহাম্মাদ সেই আকর্ষণীয় বিশ্বাসগুলো মানব জাতিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন। ইসলাম সৃষ্টি করেছিল এমন এক সমাজ, এর আগে দুনিয়ার অস্তিত্বশীল যে কোন সমাজের তুলনায় যা ছিল ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক অত্যাচার থেকে অধিকতর মুক্ত।" মুহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে গুরু নানকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি এ রকম, "এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ। সাধু, সংস্কারক, গাজী, পীর, শেখ ও কুতুবগণ অশেষ উপকার পাবেন যদি তাঁরা পবিত্র নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন।"

শেষ কথা

পরিশেষে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামের বাণী ও মহানবী [সা]-এর প্রদর্শিত বিধান একটি কল্যাণকর ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র গঠনের জন্য অপরিহার্য। আজকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য ইসলামী আদর্শের কোন বিকল্প নেই। তাই আসুন, দুনিয়ায় শান্তি, কল্যাণের স্বার্থে ও পরকালীন জীবনে মুক্তির প্রত্যাশায় সবাই মিলে মহানবী [সা]-এর আদর্শকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি এবং আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের বাণীকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিই। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে মজবুত ঈমানের ওপর টিকে থাকার তওফিক দান করুন!■

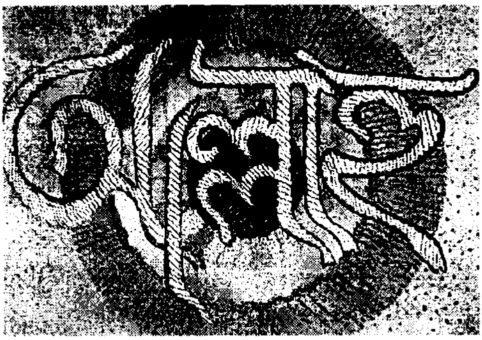

www.bjilibrary.com

Flat For Sale

- West Dhanmondi
- Sukrabad
- Elephant Road
- Maghbazar
- Darussalam
- Mirpur-1, 2, 10

MEMBER REHAB

[redacted]

For Ideal Homes...

CRESCENT HOLDINGS LTD.

Corporate Office: Abosar Bhaban, 3rd Floor
7-13 Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka-1209
Tel:9121135, 9142268, 8118698, 9121400 Fax: 88-02-8151068
Mobile: 01713 043878, 01713 034490, 01819 229532
Email: info@crescentholdings.net, web:www.crescentholdings.net

www.bjilibrary.com

নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলাম

অধ্যাপিকা শারাবান তহুরা

বিভিন্ন সমাজে নারীদের অবস্থা

যুগে যুগ বিভিন্ন ধর্মে ও বিভিন্ন দেশে নারী জাতির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অতি করুণ ও কলঙ্কময়। সত্যের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বে আরব মহিলারা ছিল পুরুষদের সম্পত্তি ও ভোগের সামগ্রী মাত্র। খ্রিস্ট ধর্মে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ছিল নিতান্তই কম। স্ত্রী স্বামীর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করত। রোমক জাতির সামাজিক চিত্র হচ্ছে পুরুষ ছিল পরিবারের প্রধান, এমন কি কখনো কখনো স্ত্রীকে হত্যা করার অধিকারও সে রাখত। এক কথায় বিশ্বমানব সমাজ নারী-পুরুষের স্বভাবসম্মত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। পরিণামে দীর্ঘকাল ধরে নারী নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল।

সমাজের প্রাথমিক ও ক্ষুদ্রতম পরিসর হচ্ছে পরিবার। এরই বৃহত্তর পরিসর হচ্ছে রাষ্ট্র। এখানে আমরা পরিবারের সাথে জড়িত নারীর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করব, যেসব সামাজিক সমস্যায় ইসলাম নারীর জন্য মুক্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেছে।

বিয়ে নারী-পুরুষের পারস্পরিক মতের ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক যার মাধ্যমে সামাজিক সংহতি বজায় থাকে।

www.bjilibrary.com

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মজীদে বিবাহকে নবী-রাসূলগণের জন্য এক বিশেষ দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

"হে নবী, আপনার পূর্বেও আমি অনেক নবী ও রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি।" আল্লাহপাক বয়স্ক ছেলেমেয়ে ও দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য হয়েছে।"

স্বাধীন মতামত

ইসলাম নারী জাতিকে পুরুষের মতো স্বাধীন ও তার সম্মতির মাধ্যমেই বিয়ে সুসম্পন্ন করার অধিকার দিয়েছে। নারী ভাল-মন্দ বিবেচনা করে স্বামী নির্বাচনে ক্ষমতাবান হওয়ায় জোরপূর্বক অভিভাবকরাও তাকে তার অপছন্দনীয় পাত্রে বিয়ে দিতে পারে না, এমন কি ছোট অবস্থায় বিয়ে দিলেও পূর্ণবয়স্কা হলে ইচ্ছা করলে সে বিয়ে বাতিল করতে পারে। এভাবে ইসলাম নারীদেরকে সম্মানিত করেছে।

বহু বিবাহ

স্মরণাতীত কাল থেকে বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। চীনা, ভারতীয়, বেবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, মিসরীয় সভ্যতায় বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। মূসা [আ] ও দাউদ [আ]-এর আমলে বহু গ্রহণের অনুমতি ছিল। খ্রিস্ট ধর্মে বহু বিবাহ নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামে একাধিক বিয়ের ব্যাপারে বলা যায়,

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে ইসলাম নতুন কিছু সংযোজন করেনি। বহু পূর্ব যুগ থেকে একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম হিসাবে ইসলাম একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছে। কারণ সামর্থ্য থাকলে মানবীয় ও শারীরিক প্রয়োজনে কোন সময় এটা জরুরি হয়ে পড়ে।

ইসলাম সমতা বিধানে শর্ত আরোপ করে পরোক্ষভাবে বহু বিবাহ রোধে উৎসাহিত করে। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে শুধু সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হলেই একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। অবিচার থেকে দূরে রাখার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কাজেই সমতা বিধানের শর্তে মুসলিম সমাজে অধিক বিবাহের পথ রুদ্ধ হয়।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ভাল দিক এই যে, আইনগত সমর্থন পেয়ে বহু অসহায় নারী অনেক সময় সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া কোন কারণে যদি পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়, যেমন বর্তমান উত্তর ইউরোপে রয়েছে। দ্বিতীয়ত যুদ্ধের কারণে যদি কোন দেশে নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়, সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়; তখন একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

চিরকৌমার্য

বর্তমানে চিরকৌমার্য সমস্যা সভ্য দেশগুলোকে নাড়া দিচ্ছে। রাসূলে পাক [সা] বলেন, "যে লোক বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।" এ শিক্ষার কারণেই বিবাহযোগ্যা অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা মুসলিম সমাজে নেই বললেই চলে।

www.bjilibrary.com

গৃহে নারী

বিয়ের পর নারীর অধিকার খর্ব হয় না, বরং সে সামাজিক মর্যাদা পায়। নারী তার স্বামীর সংসারে রাণী ও সর্বময় কর্ত্রী। কারণ স্ত্রী তার ইচ্ছামত যে কোন চুক্তি করতে পারে। সে নিজ নামে যে কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে স্বামীর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

তালাক

তালাক ভাল ও মন্দ দুই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিনা কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম বস্তু। রাসূলে পাক [সা] বলেন, "আল্লাহর কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হচ্ছে তালাক।"

অবশ্য অনেক সময় পারিবারিক অশান্তির কারণে তালাক অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টীয় ইউরোপে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হলেও ধর্ম ও আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি ছিল না। এ শর্ত তালাক থেকেও কঠোর ছিল। কারণ বিচ্ছিন্ন নারী পুরুষের জন্য সারা জীবন বৈরাগ্য পালন অথবা যৌন পাপাচারে মগ্ন হওয়া ছাড়া কোন পথ ছিল না।

স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীকে তালাক দানের অনুমতি প্রদান করে ইসলাম নারীদের সামাজিক নিশ্চয়তা বিধান করেছে। তবে নারীকে তালাক দানের একক অধিকার এজন্য দেয়া হয়নি যে, নারী তার প্রকৃতিগত কারণে কোন তুচ্ছ বিষয়ে তালাক দিয়ে পরিবারের জন্য ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদে দাম্পত্য জীবন যাপন করা অস্বাভাবিক হয়ে যায়, বিবাহ বিচ্ছেদ কেবল তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, আরববাসী নারীদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করত, যখন তখন নারীদের তালাক দিত। ইসলামী আইন প্রবর্তনের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে তালাক বিরল হয়ে যায়।

পুনঃবিবাহ

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ওপর পূর্ব স্বামী বা তার আত্মীয়-স্বজনের কোন প্রকার অধিকার নেই। এরূপ অধিকার ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলোতেও নারীদের দেয়া হয়নি।

ইয়াতীম বালিকা

জাহিলিয়াতের যুগে ইয়াতীম বালিকারা যাদের আশ্রয়ে থাকত তারা ইয়াতীমদের সম্পত্তির লোভে বা রূপ-সৌন্দর্যের কারণে বা তাদের খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ নেই এ কথা ভেবে ইয়াতীমদের বিয়ে করত এবং তাদের প্রতি অন্যায়, যুলুম ও অবিচার করত। এ প্রসংগে আল্লাহপাক ইয়াতীম মেয়েদেরকে স্বামীর নির্যাতন থেকে রেহাই দানকল্পে আয়াত নাযিল করেন :

www.bjilibrary.com

দাসী

হযরত মুহাম্মদ [সা] দাসীদের সম্পর্কে বলেন, যদি কেউ তার দাসীদের সদয়ভাবে কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে শাস্তি না দিয়ে সৎ শিক্ষা দেয় এবং পরিশেষে তাকে মুক্ত করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে, তবে তাকে দ্বিগুণভাবে পুরস্কৃত করা হবে। দাসীদের ব্যাপারে তিনি বিধান দান করেন যে, সন্তানদের মা হওয়া মাত্র সে সেই পরিবারের একজন বলে গণ্য হবে। এভাবে দাসীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে।

যৌতুক

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যৌতুক প্রথা নারী সামাজের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে। আমাদের সমাজে যৌতুকের কারণে অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। ফলে প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী পিতা-মাতার গলগ্রহ হয়ে আছে। এ সুযোগে কিছু লোক নারী ব্যবসা চাঙ্গা করে তুলছে যার ফলস্বরূপ শহরে, গ্রামে সর্বত্র বহু পতিতালয় বৃদ্ধি ছাড়াও দ্রুত বেগে বাড়ছে নারী নির্যাতন, অপহরণ, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি। সুতরাং যৌতুক প্রথা বিলোপ করা না হলে লক্ষ লক্ষ মহিলার ভাগ্য অনিশ্চিত থাকবে, সমাজে বিরাট বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের অবসান হবে না।

যৌতুক প্রথার কারণে শুধু সমাজের অধিকাংশ নারীরাই নির্যাতিতা হচ্ছে, তাই নয়, বরং গোটা সমাজ ব্যবস্থা এর জের টানছে। একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী পরিবার গঠনে নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। একা নারীর পক্ষে যেমন অসম্ভব তেমনি নরের পক্ষেও একা সম্ভব নয় সুন্দর সংসার গড়ে তোলা। কাজেই বিয়ের প্রাথমিক পর্বই যদি দেনা-পাওনার বিষাক্ততায় ভরে ওঠে, তাহলে স্বভাবতই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা ছড়াবে। সুতরাং যৌতুক প্রথা শুধু পরিবারের জন্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না, বরং গোটা সমাজের জন্যই ধ্বংস বয়ে আনছে।

ইসলামে যৌতুকের কোন অবকাশ নেই, বরঞ্চ যৌতুকের ঠিক উল্টো মোহরানার নির্দেশ রয়েছে, যা স্বামী স্ত্রীকে দিয়ে বিয়ে করে। মোহরানার কোন নির্দিষ্ট অংক বা সীমা নেই। পুরুষের আর্থিক সামর্থ্য ও সদিচ্ছার ওপর মোহরানা নির্ধারিত হয়। কুরআন মজীদে আল্লাহ মোহরানা সম্পর্কে ঘোষণা করেন, "বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন, তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে আসন দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুভার তিনি তার ওপর চাপান না, আল্লাহ কষ্টের পর শান্তি দেবেন।" স্ত্রীগণ স্বামী থেকে মোহর দাবী করতে পারে, আবার খুশী হয়ে মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা নারীর মোহর শোধ করা পুরুষের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে শক্ত নির্দেশ আছে। অতএব, ইসলামে যৌতুকের স্থান তো নেই, বরং স্ত্রীর মোহরানা দেয়ার কড়াকড়ি নির্দেশ দিয়ে নারী জাতির নিরাপত্তা বিধান করেছে ইসলাম।

পর্দা

পর্দা প্রথা মুসলিম সমাজের একটা বিশেষ অঙ্গ। সমালোচকরা কুরআন মজীদের দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে পর্দাকে অন্তরীণ প্রথা বলে তীব্র সমালোচনা করেছে। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে :

www.bjilibrary.com

"হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদেরকে, আপনার কন্যাগণকে ও বিশ্বাসিগণের স্ত্রীদের বলে দিন যে, তারা যেন নিজেদের উপর স্ব স্ব আবরণী সুবিন্যস্ত করে। এটা এ জন্য সমীচীন যে, এতে তারা [সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে] পরিচিত হবে এবং অনন্তর তারা অত্যাচারিত হবে না এবং আল্লাহ বড় করুণাময়।"

নিম্নোক্ত সামাজিক পরিস্থিতিতে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। শহরতলী বা শহরের বাইরে মাঠে আসা-যাওয়ার সময় মহিলারা তস্করদের হাতে অপমানিত হত। মেয়েদেরকে তারা দাসী মনে করে এসব নৈতিকতাবিরোধী অপকর্ম করত। এর প্রেক্ষিতে রাসূলে পাক [সা] মুসলিম নারীদেরকে চাদর গায়ে দেয়ার নির্দেশ দেন যাতে তারা অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেয়ে নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াত :

"মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে; তাদের স্ত্রীরা বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।" এ আয়াতে নারীদের মুখমণ্ডল ও হাত অনাবৃত রাখার অনুমতি আছে। কেননা পুরুষ অপরিচিত মহিলাদের মুখ ও হাত ছাড়া অন্য দিকে তাকাতে পারে না। সুতরাং মহিলাদের শালীনতা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে ইসলাম বর্তমান যুগের প্রচলিত অর্ধনগ্নতারও সংস্কার সাধন করেছে।

অনেক আগেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে শাসক পরিবারের সদস্যরা ও অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদেরকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সব সময়ই পর্দা করত। মহিলা ও পুরুষ সকলেই পর্দা করে নিজেদেরকে জনসাধারণের চোখের আড়ালে রাখত। হযরত ইবরাহীম [আ]-এর আমলেও পর্দা প্রথাকে সমর্থন করা হত। গ্রীক ও রোমক আইনেও এ প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করা হত। পারস্য ও মিসরের প্রাচীন রাজা-বাদশাহরা এ প্রথাকে কঠোরভাবে মেনে চলত। চীন ও কোরিয়াতেও এ প্রথা চালু ছিল। কিছুকাল আগেও ইংল্যান্ডের মহিলারা বর্তমানের চেয়ে অধিকতর অন্তরীণ জীবন যাপন করত।

মহানবীর [সা] যুগে মেয়েরা মসজিদে নামায পড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করা, আত্মীয় পুরুষের সাহায্যে নেতৃত্ব দান ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করত নিজেদের পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে। কাজেই মুসলিম সমাজের পর্দা প্রথাকে অন্তরীণ প্রথা হিসেবে আখ্যা দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, মেয়েদের সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষায় কুরআন মজীদ পর্দার নির্দেশ দিয়ে যে পবিত্রতার শিক্ষা দিয়েছে তা প্রতিটি সভ্য সমাজের কাম্য হওয়া উচিত। মেয়েদেরকে চারদেয়ালে বন্দী করে রাখা ইসলামী আইনের অংশ বলে পাশ্চাত্যে যে ধারণা চালু আছে, তা ভ্রান্তিপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা

সমাজের বৃহত্তর পরিসর রাষ্ট্র নারীর জ্ঞান, মাল, ইজ্জত ও আবরুর নিরাপত্তা প্রদান করছে। ইসলামী রাষ্ট্রে "বায়তুল মাল" অভাবগ্রস্ত নারীদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

www.bjilibrary.com

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

সমাজের মানুষের মর্যাদায় মানদণ্ড হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। বস্তুত বৈষয়িক অবস্থা সুদৃঢ় হলেই মানুষ সমাজে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। বিভিন্ন আইনের তুলনায় ইসলামে নারীর বৈষয়িক অবস্থা বেশ শক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের বিরাট অধিকার দান করেছে। নারী পিতা, স্বামী ও পুত্র সন্তানের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় এবং স্বামীর নিকট থেকে মোহর পায়। এসব সম্পত্তির ওপর তার একক অধিকার ইসলাম স্বীকৃত।

উত্তরাধিকার আইনে নারী পুরুষের অর্ধেক পায়। তার কারণ হলো নারী স্বামীর কাছ থেকে মোহর ও ভরণ-পোষণ পায়। তাছাড়া স্বামীর অবর্তমানে পিতা, ভাই, পুত্র তাদের ভরণ-পোষণ করে, অথচ পুরুষরা মোহর ও ভরণ-পোষণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত, বরং পুরুষদেরই সংসার চালাতে হয়। কাজেই নারীদের গুরু দায়িত্ব নেই বিধায় উত্তরাধিকার আইনে তাদের অংশ কম দেয়া হয়েছে।

নারীদের উত্তরাধিকার আইনের বিবরণ প্রদান করা হলো :

স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ

ক. মৃতের সন্তান বা পৌত্র-পৌত্রী জীবিত থাকলে মোট সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ।

খ. মৃতের কোন সন্তান বা পৌত্র-পৌত্রী না থাকলে চার ভাগের এক ভাগ।

গ. মৃতের একাধিক স্ত্রী থাকলে মোট সম্পত্তি চার ভাগের এক ভাগ তাদের মাঝে সমান করে ভাগ করে দিতে হবে।

পিতার সম্পত্তিতে কন্যার হক নিম্নরূপ :

ক. যদি কোন পুত্র-সন্তান না থাকে এবং যদি সে একমাত্র কন্যা হয়, তাহলে মোট সম্পত্তির অর্ধেক।

খ. যদি কোন পুত্র-সন্তান না থাকে এবং দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তান থাকে তাহলে সব কন্যা সন্তান এক সাথে মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে।

গ. যদি এক বা একাধিক পুত্র সন্তান থাকে, কন্যারা পুত্র সন্তানের প্রাপ্ত দু'ভাগের এক ভাগ পাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দুই পুত্র ও এক কন্যা জীবিত থাকে, তাহলে মোট সম্পত্তিকে পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ দুই পুত্র এবং অবশিষ্ট এক ভাগ কন্যা সন্তান পাবে।

তিনটি ক্ষেত্রে মায়ের হক নিম্নরূপ :

ক. যদি একটি পুত্র বা পৌত্র থাকে তাহলে মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন।

খ. যদি কোন পুত্র বা পৌত্র-পৌত্রী বর্তমান না থাকে, তাহলে মায়ের অংশ বেড়ে তিন ভাগের এক ভাগ হয়।

গ. যদি একজন স্ত্রী বা স্বামী এবং একজন বাবা বর্তমান থাকেন, তাহলে স্ত্রীরা স্বামীর হক আদায়ের পর যা থাকে, মা তার তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন, বাকি দু'ভাগ পাবেন

www.bjilibrary.com

পিতা। এ ক্ষেত্রে বাবা একজন কেবল অংশীদারই নন, তিনি অবশিষ্টাংশের দ্বিতীয় শ্রেণীর হকদার।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সে নিজ ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে এবং সে সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করতে পারে। ব্যবসার লভ্যাংশের সে পূর্ণ মালিক। এ সব সম্পত্তির ওপর স্বামী, সমাজ, এমন কি স্বয়ং সরকার পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮০০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে স্বামী ছিল স্ত্রীর সম্পত্তির মালিক। বর্তমানেও রোমান ক্যাথলিক ধর্মানুসারী দেশগুলোতে স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীরা আপনা আপনি হকদার ও মালিক হয়ে বসে। এখানে নারীর অধিকার সামান্যই স্বীকৃত হয় এবং স্ত্রীরা স্বামীর করুণার পাত্রীতে পরিণত হয়।

ইসলাম নারী জাতিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে পুরুষের অধীনতামুক্ত করে। সৈয়দ আমীর আলী লিখেন, "মুসলমান নারীরা তাদের ভবিষ্যতের জন্য তাদের পিতা, মাতা, ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের দয়া-মায়ার ওপর নির্ভর করে না। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন তাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করে।"

তা ছাড়াও প্রয়োজনে পর্দা করে বাইরের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার অধিকার মহিলাদের প্রদান করা হয়। যে কোন আশ্রয়হীন মহিলা তার জীবিকার তাগিদে এবং স্ত্রীর মান-সম্মান রক্ষাপূর্বক যে কোন হালাল উপায়ে কামাই-রোযগার করতে পারে। এজন্য সব রকমের বিধিসম্মত উপায়ও সে অবলম্বন করতে পারে।

স্বামী ধনী হোক বা গরীব হোক, স্ত্রী বাপের বাড়িতে থাকুক বা স্বামীর সাথে অবস্থান করুক, সব অবস্থায় স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা। বিধবাদের ৪ মাস ১০ দিন ও তালাকপ্রাপ্তাদের ৩ ঋতু পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করতে হবে। স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবাদেরকে স্বামীর সম্পত্তি থেকে মোহরানা দিতে হবে। মৃতের সম্পত্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার আগে তার স্ত্রীর অপরিশোধিত মোহর আদায় করতে হয়। তালাকপ্রাপ্তাদেরকে মোহরানা পরিশোধ করা স্বামীর একান্ত কর্তব্য। এ বিষয়ে ইসলাম কড়াকড়ি নির্দেশ আরোপ করেছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাদের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বিধান করেছে। অপরপক্ষে আগেকার যুগে পিতা কন্যা সন্তানের মোহরানার অর্থ ভোগ করত।

পাশ্চাত্য নারীকে পুরুষ সাজিয়ে পুরুষরূপী মর্যাদা দিয়ে সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু ইসলাম নারীকে তার প্রকৃতিতে সাজানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি প্রযোজ্যও নয়। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সর্বোত্তম বিধান ইসলামই দিয়েছে। তাই নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য ইসলামী নীতিমালার বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।■

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবীর [সা] দশটি উপদেশ

হেলাল আনওয়ার

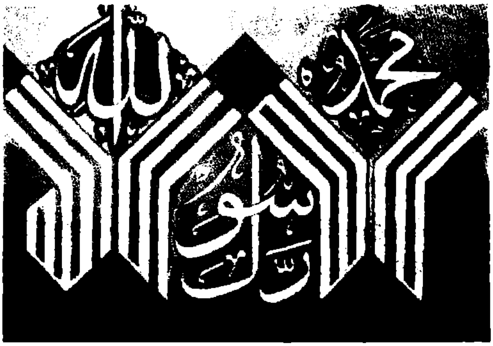

বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলে মকবুল [সা] তাঁর উম্মাতের মুক্তির জন্য বহু দিক নির্দেশনা দান করেছেন যার মাঝে মানুষের ইহকালীন শান্তি, পরকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি রয়েছে। সেই নির্দেশনার মাঝে যেমন রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের বাস্তবসম্মত দর্শন, অন্যদিকে রয়েছে রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের কল্যাণমুখী বিশ্লেষণ যাতে তাঁর সুপ্রিয় উম্মতগণ ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যায়ে একটি সুখী, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে সক্ষম হয়। এমনই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি হযরত মুয়াজ বিন জাবালকে দশটি উপদেশ প্রদান করেছিলেন। উপদেশগুলো নিম্নরূপ :

১. যদি তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তবুও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

২. পিতা-মাতার কখনো অবাধ্য হয়ো না যদিও তোমাকে পরিবার, পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ করেন।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয নামায ত্যাগ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করবে তার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

www.bjilibrary.com

৪. কখনো মদ পান করবে না। কেননা এটা সকল অশ্লীলতার উৎস।

৫. সাবধান! সর্বদা গুনাহর কাজ থেকে দূরে থাকবে। কেননা পাপের কারণে আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক হয়ে থাকে।

৬. সাবধান! জিহাদের মাঠ থেকে পলায়ন করবে না যদিও সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।

৭. আর তোমার উপস্থিতিতে লোকদের মাঝে মহামারী দেখা দিলে তখন সেখানেই অবস্থান করবে। মৃত্যুর ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।

৮. তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করবে। কৃপণতা করে তাদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট দেবে না।

৯. পরিবারের লোকদের আদব-কায়দা শিক্ষা দানের ব্যাপারে শাসন করা থেকে বিরত থাকবে না।

১০. আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সর্বদা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকবে।

রাসূল [সা]-এর এই উপদেশাবলী আলোচনা করলে সহজেই বুঝতে পারি যে, আল্লাহর সাথে কোনো অবস্থাতেই শিরক করা যাবে না। কেননা শিরক করার মতো জঘন্য আর বড় পাপের কাজ নেই। সেজন্য হযরত লোকমান [আ] তাঁর নিজ সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "হে আমার সন্তান! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। কেননা এটা সবচেয়ে বড় জুলুম।"

শরীক এর অর্থ হলো– গুণে মানে, শক্তিতে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিধান দাতা হিসেবে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে মনে করা। ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের দিক দিয়ে কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনা করা, অথচ এসবের মালিক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

হযরত আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল [সা] সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তা হলো–

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।

২. আইন ছাড়া কাউকে হত্যা করা।

৩. সুদ খাওয়া।

৪. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা।

৫. যাদু-টোনা করা।

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা।

৭. সতী নারীর প্রতি মিথ্যা দোষ চাপানো।

উল্লিখিত হাদীসে শরীক করাকে ধ্বংসের কারণ বলে রাসূল [সা] উল্লেখ করে তাঁর উম্মতদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্যে উপদেশ দান করেছেন।

www.bjilibrary.com

রাসূলের [সা] দ্বিতীয় উপদেশ হলো পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য প্রসঙ্গে। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, "তোমার প্রভু এই মর্মে বিধান জারি করেছেন যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কারোর দাসত্ব করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি ভাল আচরণ করো তাঁদের বৃদ্ধাবস্থায় একজন অথবা দু'জনকেই যদি পাও। তাঁদের সাথে কষ্টদায়ক ও অপমানকর কথা বলো না এবং তাঁদের মর্যাদা দিয়ে কথা বলো। তাঁদের জন্যে তোমার দুই ডানা হাত প্রসার করো এবং বলো, হে আল্লাহ! তুমি তাঁদের প্রতি তেমন দয়া দেখাও যেমনভাবে তাঁরা আমাদের ছোটকালে দেখিয়েছিলেন।"

রাসূলের [সা] এই উপদেশটির মাঝে মানুষের পারিবারিক বন্ধনকে আরো শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। একটি শিশু মৌলিকভাবে তার পিতা-মাতার ওপর নির্ভরশীল। পিতা-মাতার অবর্তমানে শিশুর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই শত কষ্টের মাঝেও পিতামাতা তাঁর সন্তানকে অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করে থাকেন। রাসূল [সা] এক হাদীসে বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টিতে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে।" হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন রাসূলের [সা] নিকট জিজ্ঞাসা করলো, "হে রাসূল [সা]! সন্তানদের ওপর মা বাবার কি দাবী আছে? তখন রাসূল [সা] বললেন, তাঁরা দু'জনই তোমাদের বেহেস্ত ও দোযখ।"

পিতামাতা সম্পর্কে রাসূলের [সা] আরো একটি উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল [সা] বলেছেন, প্রতিটি পাপ আল্লাহ যতটুকু সম্ভব ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যতা ক্ষমা করেন না, বরং এটার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই তার মৃত্যুর পূর্বে প্রদান করে থাকেন।

কোনো অবস্থাতেই পিতামাতার অবাধ্য না হওয়ার জন্য বিশ্বনবী [সা] উপদেশ দান করেছেন।

রাসূলের [সা] তৃতীয় উপদেশ হলো স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করা প্রসঙ্গে। পবিত্র আল কুরআনের বহু স্থানে নামায আদায়ের জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। মূলত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এজন্যে মহানবী [সা] নামাযকে দীনের মূল ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন, এমন কি একে বেহেস্তের চাবিও বলা হয়েছে। নামায কাফির ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য তৈরি করে দেয়। মহানবী [সা] আরো স্পষ্ট করে বলে দিলেন, যে স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো।

মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, "সেসব মুমিন সফল যারা খুসু ও খুজু হয়ে নামায আদায় করে।" মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামাযকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, "সেসব মুত্তাকীদের জন্য হিদায়েত যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করে।" একজন মানুষ নামাযের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হতে পারে। কেননা এটি একটি প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষরে দ্বারা ব্যক্তিজীবন গঠন করা সম্ভব। সত্যিকারের একজন নামাযী যাবতীয় গুনাহের পথ পরিহার করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় নামায মানুষকে অসৎ কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সৎ কর্মের আদেশ দেয়।"

www.bjilibrary.com

তাই নামাযের প্রতি অবহেলা বা শৈথিল্য দেখানো উচিত নয়। যারা এমন করে তাদের জন্য আল্লাহর ঘোষণা, "ধ্বংস সেসব নামাযীর জন্য, যারা তাদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন এবং যারা লোক দেখানো নামায আদায় করে তারাও।"

এজন্যে বিশ্বনবী [সা] নামায আদায়ের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা না করে বরং যত্নশীল হওয়ার জন্য উপদেশ দান করেছেন।

রাসূলের [সা] চতুর্থ উপদেশ মদ পান না করার জন্য। মদের মাধ্যমে মানুষ হিতাহিত ভুলে যায় যার ফলে জীবনকে পাপের সাথে আকণ্ঠ জড়িয়ে ফেলে। মদের কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে যার কারণে ইসলাম মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু– শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" হাদীসে কুদসীতে রাসূল [সা] বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন শরাবখোরের দেখা পাবেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাৎ পাবেন তখন সে নেশাগ্রস্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি কি পান করেছিলে? সে উত্তরে বলবে শরাব পান করেছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি তা তোমার জন্য হারাম করিনি? সে বলবে, হ্যাঁ। অত:পর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে।"

রাসূল [সা] বলেছেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মদের ওপর, মদ পানকারীর ওপর, যারা মদ পান করায় তাদের ওপর, মদ বিক্রেতার ওপর, মদ প্রস্তুতকারীর ওপর, মদ বহনকারীর ওপর এবং যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই ব্যক্তির ওপর লানত করেছেন।"

মূলত মদ্যপায়ীরা দেশ, সমাজ, জাতির, এমন কি আপন পরিবার-পরিজনের কাছেও অপ্রিয় হয়ে থাকে। এজন্যে মানবতার মহান শিক্ষক বিশ্বনবী [সা] মদপান না করার জন্য উপদেশ দান করেছেন।

রাসূলুল্লাহর [সা] পঞ্চম উপদেশ হলো গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে। গুনাহ বলতে এখানে সকল পাপ কাজকে বোঝানো হয়েছে। দ্বীনবিরোধী শরীয়তপরিপন্থি কোনো কাজ করা বা অকপটে সমর্থন করাকে বোঝানো হয়েছে। যদি কেউ এমন কাজে লিপ্ত হয় তারা মূলত আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, "তাদের ওপর অপমান, লাঞ্ছনা ও ক্রোধ।" সুতরাং বিশ্বস্রষ্টা, বিচার দিনের মালিক সেই আল্লাহ যদি তাঁর বান্দার ওপর ক্রোধান্বিত হন তাহলে বান্দার জন্যে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে? এজন্যে রাসূল [সা] এই উপদেশ প্রদান করেছেন।

রাসূলের [সা] উপদেশ হলো– জিহাদের মাঠ থেকে পলায়ন না করা প্রসঙ্গে। জিহাদ হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নবী [সা] এখানে সমুখ সমরের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। সমর থেকে পলায়ন করলে একদিকে যেমন ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ পায়, অপরদিকে

www.bjilibrary.com

মনোবলের ওপর আঘাত করে। তাই যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন না করে শাহাদতের তামান্না পোষণ করা উচিত। যারা শাহাদতের আশা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য অগ্রিম পুরস্কার ঘোষণা করে বলেন, "আর যারা আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করে তাদেরকে মৃত্যু বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।" অন্যত্র মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "যারা আল্লাহর রিযিক বা নিয়ামত লাভ করছে এবং তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত। আর নিশ্চয় আল্লাহ ঈমানদারদের পুরস্কার নষ্ট করে দেন না।"

রাসূল [সা] ইরশাদ করেন, "বেহেস্তে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সব কিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। সে দুনিয়ায় এসে দশবার শহীদী মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহাদতের মর্যাদা দেখতে পাবে।"

এই মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থায় পৌছাতে হলে তাকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য। একজন মুজাহিদ শত সংকটেও জিহাদের মাঠ থেকে পলায়ন করবে না। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ। তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, "আল্লাহ মুমিনের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।" এজন্যে মহানবী [সা] জিহাদের মাঠ থেকে পলায়ন না করার জন্য উপদেশ দান করেছেন।

অষ্টম উপদেশ হলো সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের প্রতি কৃপণতা না করে অর্থ ব্যয় করা প্রসঙ্গে। কেননা পরিবারের সাথে কৃপণতা করলে সুনাম নষ্ট হয় এবং গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যায়। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের প্রতি ব্যয় করার জন্য আল্লাহর রাসূল [সা] উপদেশ দিয়েছেন।

রাসূলের [সা] নবম উপদেশ হলো পরিবারের লোকদের আদব-কায়দা শিক্ষা দান প্রসঙ্গে। পারিবারিক শিক্ষা ছাড়া কখনো সুনাগরিক উপহার দেয়া সম্ভব নয়। পারিবারিক শিক্ষা যেটা সাধারণত মা-বাবা ও অন্য সদস্যদের ওপর নির্ভর করে। যদি বাবা-মা সচেতন হন তাহলে অবশ্যই তাদের সন্তান অনন্য হয়ে গড়ে উঠবে। এজন্যে রাসূল [সা] বলেছেন, সন্তান তার পিতার অনুরূপ হয়ে থাকে।

এজন্যে পারিবারিক শিক্ষার জন্যে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে সুন্দর মানস তৈরি হয়। এর উপকারিতা দেশ, জাতি ও সমাজ ভোগ করতে পারে। এজন্যে বলা হয়, মায়ের কোল শিশুদের জন্য প্রথম পাঠশালা।

আল্লাহর রাসূল আদব শিক্ষা দানের বিষয়টি পরিবারের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এজন্যে পরিবারের প্রতি শাসনের প্রয়োজন হলে তা করার জন্যও উপদেশ দান করেছেন।

রাসূলের [সা] দশম উপদেশ হলো আল্লাহর ব্যাপারে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করানো অর্থাৎ পরিবার-পরিজনের নিকট খোদাভীতি বা তাকওয়া অর্জনের জন্য বলতে হবে।

www.bjilibrary.com

তাকওয়া ছাড়া কোন রকম স্বচ্ছ মানুষ হওয়া যায় না। তাকওয়ার মাধ্যমে সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিই সম্মানিত আল্লাহর নিকট যার হৃদয়ে খোদাভীতি আছে।"

পরিবারের সকলকে জানাতে হবে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাধ্য হয়ে চলতে হবে। তিনি গোপন প্রকাশ্য সব জানেন এবং তাঁর নিকট ভাল-মন্দ সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে খোদাভীতি অর্জনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে তাদের গড়ে তুলতে হবে।

রাসূলের [সা] উল্লিখিত দশ উপদেশ আমাদের পারিবারিক ও সমাজ কাঠামোকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। ইসলামী তাহজীব ও তমুদ্দনকে শক্ত ভিতের ওপর স্থাপনের জন্য উল্লিখিত উপদেশগুলো মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন।■

তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ ॥ কিতাবুল ঈমান ॥ সংকলনে : মেশকাতুল মাসাবিহ।

২. সূরা লোকমা ॥ আয়াত নং ১৩।

৩. বুখারী ও মুসলিম ॥ কিতাবুল ঈমান ॥ উদ্ধৃতি : মেশকাতুল মাসাবিহ।

৪. সূরা ইসরা ॥ আয়াত নং ২৩-২৪।

৫. তিরমিযী ॥ উদ্ধৃতি : মেশকাতুল মাসাবিহ ॥ কিতাবুল আদাব।

৬. ইবনে মাজাহ।

৭. মেশকাতুল মাসাবিহ ॥ কিতাবুল আদাব।

৮. সূরা বাকারা ॥ আয়াত নং ৪-৫।

৯. সূরা মা'উন।

১০. সূরা মায়িদা ॥ আয়াত নং ৯০।

১১. হাদীসে কুদসী ॥ সংকলনে : আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী ॥ অনুবাদ : মমতাজ উদ্দীন আহমদ ॥ ই.ফা.বা. প্রকাশনী। পৃষ্ঠা : ২৩৭।

১২. আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী। অনুবাদ : এম এম সিরাজুল ইসলাম। ই.ফা.বা. প্রঃ, পৃষ্ঠা-৩৮৯

১৩. সূরা আলে ইমরান। আয়াত নং ১৬৯।

১৪. সহীহ আল বুখারী ॥ কিতাবুল জিহাদ ॥ হযরত আনাস [রা] থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত।

১৫. সূরা আত তাওবা। আয়াত নং ১১১।

www.bjilibrary.com

মানুষকে আল্লাহ্ ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করেননি

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

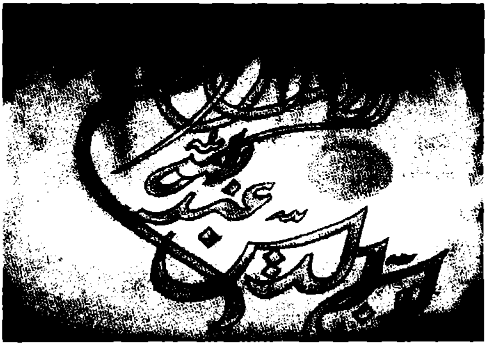

মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে। আল্লাহ মানুষকে ইবাদত ছাড়া অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করেননি। ইবাদত কি? কিভাবে করতে হয়? এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য যুগে যুগে তিনি নবী পাঠিয়েছেন, রাসূল পাঠিয়েছেন। যাঁরা মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে শিখিয়েছেন এবং তাঁরা মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চালিয়েছেন। এই সিলসিলায় নবী-রাসূলদের ওপর আল্লাহ্ কিতাব পাঠিয়েছেন এবং সেই সাথে কিতাবের শিক্ষক হিসেবে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। এই সিলসিলার সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিলেন হযরত আদম [আ] এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ [সা]। তিনি সমস্ত মানব জাতির জন্য নবী হিসেবে এসেছিলেন কেবল কোন বিশেষ জাতি বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর নবী ছিলেন না। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা বলছেন, 'হে নবী তুমি নিশ্চয়ই মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' সুতরাং তাঁর চরিত্র সমস্ত প্রশ্নের উর্ধ্বে ছিলো। আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা তাঁকে যেভাবে প্রশংসা করেছেন, তাতে করে তিনি নি:সন্দেহে উত্তম চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ

www.bjilibrary.com

করার মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ নিহিত। আর তিনি যা কিছু মানুষকে বলছেন তা আল্লাহর কাছ থেকে আদিষ্ট হয়ে বলেছেন। আল কুরআন হচ্ছে আল্লাহর সে আদেশনামা এবং সেই কিতাব যেই কিতাবের শিক্ষক হিসেবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কে আল্লাহ তায়ালা নিযুক্তি দিয়েছেন।

রাসূল [সা]-এর জীবনের অসংখ্য দিক রয়েছে। মানব জীবনের সকল দিক ও আদর্শ তাঁর জীবনেই পাওয়া যায়। তিনি যা কিছু মানুষকে শিখিয়েছেন, তাকে যদি দুই ভাগে ভাগ করা যায়– তার একটি হচ্ছে– ইবাদত, অপরটি হচ্ছে– মুয়ামালাত। ইবাদত হচ্ছে– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এগুলো। আর মুয়ামালাত হলো– মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে চলাফেরা, ওঠা-বসা, পারিবারিক জীবনে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক সূত্র। পরিবারের বিভিন্ন লোকদের সাথে কার কি সম্পর্কের দাবি, তার কি পাওনা তার কাছে আছে বা তার কি কর্তব্য কার প্রতি আছে। সমাজে মানুষের প্রতি কার কি দায়িত্ব আছে, প্রতিবেশীর প্রতি কি দায়িত্ব রয়েছে, লেনদেন কিভাবে হবে, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি– এসব বিষয়ে যেসব জ্ঞানগুলোকে মুয়ামালাত বলে।

এই দিকটা হলো নবী-রাসূলদের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং সেজন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনে আমরা দেখেছি তিনি একই সাথে একজন ব্যক্তি মানুষ ছিলেন, পিতা ছিলেন। অন্যদিকে তিনি স্বামী ছিলেন, তিনি সন্তান ছিলেন এবং তিনি সমাজের মানুষের প্রতিবেশী ছিলেন এবং তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাষ্ট্র গঠন করেছেন। তিনি একটি সুন্দর অর্থনীতি উপহার দিয়েছেন দুনিয়াবাসীর জন্যে। সুদের অর্থনীতি যা মানুষের শোষণ করতো তা পরিবর্তন করে সেখানে তিনি একটি ব্যবসাভিত্তিক অর্থনীতি উপহার দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি ইসলামী অর্থনীতি যেখানে যাকাত নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। সুদ মানুষকে শোষণ করে এবং সুদে অর্থ-সম্পদ নিচের-ওপরের দিকে নিয়ে যায় অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ গরীবদের থেকে নিয়ে ধনীদের হাতে তুলে দেয়। সম্পদ কুক্ষিগত করে দেয়। অন্যদিকে যাকাত ধনীরা দেয়, গরীবরা পায়। এভাবে অর্থ-সম্পদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং এ দ্বারা মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। আর ক্রয় ক্ষমতা বাড়লে বাজারে উৎপাদন বাড়ে। আবার উৎপাদন বাড়লে এর সুফলটা যাকাত প্রদানকারীরাই পেয়ে যায়। এভাবে সম্পদ মানে অর্থ ধনী থেকে গরীব, গরীব থেকে ধনীদের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই অর্থনীতি রাসূল [সা] মানুষকে উপহার দিলেন। সুদের অর্থনীতি যা কিনা মানুষকে আরও ধনী ও গরীবকে আরও গরীব করে দিচ্ছিল সে অবস্থার অবসান ঘটে গেল এবং ওমর বিন আব্দুল আজিজের সময় এ এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে, মানুষের সচ্ছলতা আলহামদুলিল্লাহ সকলই এসে গেল, সবাই যাকাত দিতে পারেন কেউ যাকাত নেয়ার অবস্থায় নেই। এর মূল কারণ হলো সমাজ থেকে শোষণ বন্ধ হয়ে গেল এবং সবচেয়ে বড় শোষণ হচ্ছে

www.bjilibrary.com

সুদের শোষণ বন্ধ হয়ে গেল। ধনীরা যাকাত দিতে লাগলো। অর্থনীতি ওপর থেকে নিচে নামতে লাগলো। আল্লাহর রহমত হয়ে দেখা দিল এটি এবং এভাবে দুর্নীতি সমাজ থেকে চলে গেল। নৈতিকতার গুণসম্পন্ন মানুষ তৈরি হলো নামায দ্বারা। "নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে, আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।" তাহলে মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান একদল মানুষ তৈরি হলো, ব্যক্তি তৈরি হলো। তার মানে ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হলো। সুতরাং সেখানে দুর্নীতি থাকলো না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসলো, অর্থনৈতিক মুক্তি এসে গেল মানুষের কাছে। বুভুক্ষু মানুষেরা ডাস্টবিনে ধনীদের ফেলে দেয়া খাবার খাওয়ার জন্য কুকুরের সাথে লড়াই করতো, কুকুর যখন খেতে যায়, ক্ষুধার্ত মানুষেরা কুকুরের আগে গিয়ে সেগুলো খাবার চেষ্টা করতো। এই যে করুণ অবস্থার এ অবস্থার অবসান ঘটে গেল মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়ে গেল। নৈতিক মুক্তি ও অর্থনৈতিক মুক্তি মানুষের এসে গেল, এভাবে একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]।

মুয়ামালাতের দিকটা আমরা বড় করে দেখছি এজন্য যে, রাসূল [সা] নিজে নামায পড়েছিলেন, নামায পড়িয়েছিলেন। তিনি রোযা রেখেছিলেন, রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি হজ্জ করেছিলেন, হজ্জের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন। ঠিক তেমনি তিনি যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একটি চরিত্রবান সমাজ গড়েছিলেন। ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়েছিলেন। সেখানে ন্যায়বিচার সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অন্যায়, অবিচারের অবসান ঘটেছিল এমন সমাজ তিনি গড়েছিলেন। তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এতিমদের সহায়ক হয়েছিলেন। তিনি মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ভিক্ষার হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করেছিলেন। দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করে তিনি এক অসাধারণ কৃতিত্ব রেখেছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

নারীদের অবস্থা ছিলো সেই সমাজে খুবই কঠিন। নারীদেরকে খেলার সামগ্রী মনে করা হতো, চরমভাবে অবহেলিত হতো নারী সমাজ। একজন মানুষ অসংখ্য বিয়ে করতো। এক শ' জন পর্যন্ত ছিলোই তাদের স্ত্রীর সংখ্যা। এভাবে পনের, বিশ, পঞ্চাশ, ষাট এরকম তো ছিলো! সেখানে ইসলাম একটি সীমারেখা দিয়ে দিলো, তোমরা স্ত্রী কমিয়ে অন্তত চার-এ নিয়ে আসতে হবে। চার-এর বেশি বিয়ে করা যাবে না। আর চার বিয়েও একজন করতে পারে যদি সে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ইনসাফ করতে পারে। আবার আল্লাহ এও বললেন, ইনসাফ করা খুবই কঠিন কাজ। তোমরা সবাইকে কি সমান করে দেখতে পারবে? এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, বরং অসম্ভব কাজকে নিরুৎসাহিত করা হলো এবং একাধিক বিয়ের অনুমতি রাখা হলো কিন্তু উৎসাহিত করা হলো না। অনুমতি রাখা হলো এর অনেক কারণ আছে। অনেক স্ত্রী বিধবা হয়ে গেলেন ওহুদের ময়দানে, অনেক সন্তান এতিম হয়ে গেল যুদ্ধের ময়দানে। তখন এদের পুনর্বাসন করার জন্য, তাদের আশ্রয়ের জন্য এবং বিধবাদের আবার সাংসারিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য একাধিক স্ত্রীর অনুমতি দিয়ে আয়াত নাযিল হলো। একের অধিক বিয়েকে উৎসাহিত করার জন্য

www.bjilibrary.com

করা হয়নি, বরং একাধিক বিয়েকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

সুদ নির্মূলে রাসূল [সা] যুগান্তকারী অবদান রাখলেন যে কারণে নারীরাও মুক্তি ও সম্মান পেল। সেখানে দেখা গেল মাকে এমনভাবে সম্মান দেয়া হলো পিতার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে অন্যদিকে নারীর সম্মান বেড়ে গেল। ইসলাম বলেছে– তোমাদের মধ্যে সাদা-কালো নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণের ভিত্তিতে কে বড় কে ছোট এর নির্ধারণ হবে না। আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও বংশ সৃষ্টি করেছি তোমাদের চিনবার সুবিধার্থে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা রয়েছে আরও বেশি যার তাকওয়া বেশি।

তাকওয়া মানে হচ্ছে আল্লাহভীতি। সততা গুণগুলো যত বেশি বিকশিত হয়, ততই ভাল। মানুষের প্রতি দরদী হবার শিক্ষা দেয় তাকওয়া যেখানে স্বার্থপরতা নেই, হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই এবং পরশ্রী কাতরতা নেই। মিথ্যা বলে না, বরং মানুষের প্রতি দরদ রাখে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় নিজে না খেয়ে, এমন কি সন্তানদের না খাইয়ে মেহমানদের খাইয়ে দেয়ার গুণ যাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, যারা অন্যের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য নিজের পেট ভরার চেয়ে গুরুত্ব দিতো বেশি। এটি হয়েছিল সেই সমাজে, যেই সমাজের লোকেরা এক সময় মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতো। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই মানুষেরা ইসলামের সংস্পর্শে এসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর আখলাক, চরিত্র, তাঁর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে এই গুণের অধিকারী হয়েছিল। সেই সমাজ তিনি গড়েছিলেন।

আজকে আমরা নামাযের কথা শুধু বলব না, বরং তার সাথে সমাজে ইসলাম কি অবদান রাখে সে কথাও বলবো। মহানবী [সা]-এর গোটা জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, চেষ্টা ও সাধনা ব্যক্তিমানুষের ওপর পড়ে, সমাজের ওপর পড়ে। মানুষের উপকারে, মানুষের অর্থনৈতিক উপকারে, মানুষের রাজনৈতিক সংস্কারে এবং সবক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল? নারী মুক্তিতে, অর্থনৈতিক মুক্তিতে, বিমোচনে, মানুষের মর্যাদা রক্ষায় রাসূলের [সা] কর্মপ্রবাহ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সুফলও সেই সমাজ ভোগ করেছিল। যে মানুষের মর্যাদা ফেরেশতার চেয়ে বেশি সেটা কিভাবে দৃশ্যমান হয়েছিল জগতের বুকে সেটিও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর নির্মিত এবং পরিচালিত সেই ইসলামী সমাজ তথা মদিনার সমাজ না দেখলে তা বোঝা যাবে না। সেটি আমাদের দেখা দরকার। আজকে ফিরে তাকানো দরকার ইতিহাসের সেই আলোকস্তম্ভে যাতে করে আমরা আবার একটি সোনালি সমাজ সেভাবে বিনির্মাণ করতে পারি ঐ প্রক্রিয়ায়, যে প্রক্রিয়া তিনি অবলম্বন করেছিলেন। কুরআন ও হাদীসে তা সুরক্ষিত রয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে আবার আমরা অবলম্বন করে আমরা আমাদের সন্তানদের সেভাবে গড়ে তুলতে পারি, নিজেরা সে শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারি, দীক্ষিত হতে পারি এবং তাহলেই কেবল আজকে আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, একটি মাদকাসক্তিমুক্ত একটি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, একটি দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ, ডিসক্রিমিনেশন বা বৈষম্যমুক্ত সমাজ, ইনসাফপূর্ণ সমাজ, সুবিচারপূর্ণ সমাজ উপহার দিতে পারি। সেটি সম্ভব, সেটি খুবই সম্ভব। তবে এর জন্য

www.bjilibrary.com

সেখানেই আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং আদর্শ হিসেবে রাসূলের [সা] জীবনাদর্শকেই গ্রহণ করতে হবে। তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। আর যে কিতাবকে আমাদের Source of knowledge জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে সেটি হচ্ছে 'আল কুরআন'।" এসব হচ্ছে আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় করণীয়। আমাদের পরবর্তী বংশধরকে যদি আমরা সত্যিই ভাল কিছু উপহার দিতে চাই, তাহলে এর চেয়ে ভাল উপহার আর কিছু দিতে পারি না। আমরা তাদেরকে আল কুরআন ও আল হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করব। আমরা তাদেরকে রাসূল [সা]-এর জীবনী উপহার দেব। আর রাসূলের [সা]-এর জীবনের সাথে সংগতিশীল জীবন গড়তে সাহায্য করবো। রাসূলের [সা] আদর্শ অনুসারে যে জীবন সেটি যাতে গড়ে ওঠে সেজন্য আমরা আপনাদেরকে বেশি বেশি আহ্বান করতে চাই, পরামর্শ দিতে চাই– চলুন, আমরা প্রতিদিন কুরআন ও হাদীসের কিছু অংশ অন্ততপক্ষে শিখি এবং আমরা অর্থসহ কুরআনের আয়াতগুলো পড়ি, রাসূলের [সা] হাদীসগুলো পড়ি, এজন্য প্রতিদিনের একটি সময় নির্ধারণ করি ও সেই সাথে আমরা মহানবী [সা]-এর জীবনী গ্রন্থ পড়ি এবং তাঁর জীবনকে আমরা জানি। এর মধ্যে আমাদের পার্থিব কল্যাণ ও আখেরাতের অনন্তকালের মুক্তি নিহিত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা সকলকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন এবং জান্নাতের শান্তি লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ দিন, তৌফিক এনায়েত করুন! এই দোয়াই করছি।■

অনুলিখন : এস, এম, হাসানুজ্জামান

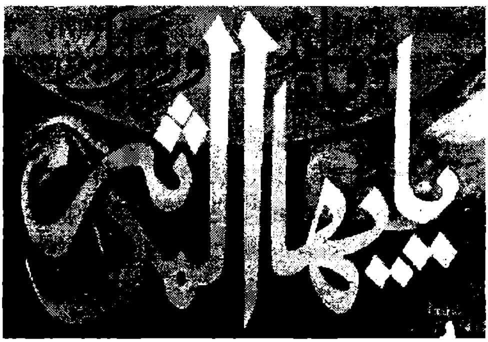

www.bjilibrary.com

হেরার মশাল

মোঃ আবদুর রহমান

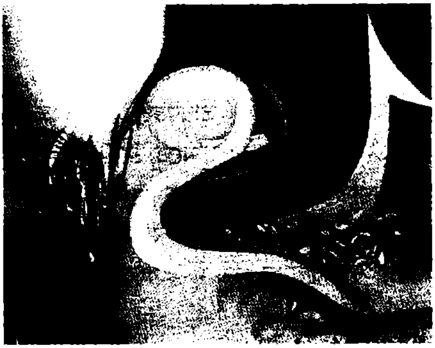

নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন একদল দক্ষ জনশক্তি পেতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাসূলুল্লাহ [সা] প্রদর্শিত তাওহীদভিত্তিক শিক্ষাই পারে মানুষকে দেহ ও প্রাণসর্বস্ব প্রাণীর সীমা থেকে আত্মিক উৎকর্ষমণ্ডিত বিবেকসম্পন্ন প্রকৃত মানুষের সীমানায় উন্নীত করতে। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর আদর্শই দিতে পারে নৈতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ একদল আলোকিত মানুষ। কেননা রাসূলুল্লাহ [সা]- এর আদর্শ ব্যক্তি মুহাম্মাদের মনগড়া কোন গতানুগতিক আদর্শ ছিল না। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আদর্শের স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তার চেয়ে সৃষ্টির কল্যাণ বেশী কেউ বোঝে না। তাই মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর জন্য যে বাণী সর্বপ্রথম প্রেরণ করলেন তাতে বলা হলো,

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন... যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"

রাসূল [সা] তাঁর নবুওয়াতী জিন্দেগীর পুরা সময়টাতে মানুষকে যে শিক্ষাগুলো দিয়েছেন তাকে মোটাদাগে তিনটি শিরোনামে ভাগ করা যায় : তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত।

www.bjilibrary.com

তাওহীদের চেতনা মানুষের মন থেকে অন্যায়-জুলুমের সমস্ত প্রেরণা নিঃশেষ করে দেয়। আল্লাহ প্রতি অনুরাগ ও ভয় মানুষের হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকলে মানুষ অপরাধ প্রবণতার হাত থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কেউ যদি মনে এ বিশ্বাস রাখে যে, তার সীমালঙ্ঘনের প্রতিবাদ পৃথিবীর কোন মানুষ করতে না পারলেও আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকে একদিন ধরা দিতেই হবে, তাহলে তার পক্ষে কোন অন্যায়-দুর্নীতি বা সন্ত্রাস করা স্বাভাবিক হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"আপনি বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, যে বুদ্ধিমান, আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা মুক্তি পাও।" [সূরা মায়েদাহ-১০০]

আখেরাতে বিশ্বাস ও পরকালীন জবাবদিহিতার তত্ত্বটি বর্বর আরব জাতির জীবনে এনে দিয়েছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সন্ত্রাসের বধ্যভূমিতে উড়েছিল শান্তির শ্বেত কপোত। মৃত্যু মানুষের এক অনিবার্য পরিণতি, যার হাতে থেকে এ পৃথিবীর কেউ মুক্তি পাবে না। তাই আখেরাতের ওপর অবিচল বিশ্বাস ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় যার মনে জাগরূক থাকবে সে কখনও অন্যায় ও সন্ত্রাসের মত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে বলেন :

"আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।" [মুমিনুন ২৩ : ৭৪]

পার্থিব জীবন ক্রীড়াকৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস আল্লাহভীরুদের জন্য শ্রেষ্ঠতর স্থান।■

www.bjilibrary.com

জান্নাত ফেলে : ফিরোজা গম্বুজের নিচে ॥ জু ল ফি কা র সা ই দু ল

জান্নাত ফেলে যিনি ধূসর মৃত্তিকার আকর্ষণে, ফিরোজা গম্বুজের নিচে,
ফিরে এসে দাঁড়ালেন। তিনি আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
এক অর্পিত অসামান্য গুরুভারের কথা ভেবে ভেবে
এবং একটা প্রত্যাদিষ্ট অসামাপ্ত স্বপ্নের সোনালী প্রেরণায়,
পৃথিবীতে রেখে যাওয়া অভিন্ন হৃদয় উম্মতের সমুদ্র ভাবনায়–
স্নেহশীল পুষ্পের ভালোবাসা বুকের দরদী বাষ্পে ঢেলেছিলো তাপ।
পৃথিবীর জমিনে সেই সোনালী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায়
আল্লাহর সান্নিধ্য ছেড়ে জান্নাতের উপমাহীন অনি:শেষ প্রশান্তি রেখে–
সূর্যের আগুনে পোড়া মরুভূমির বালুকার দরিয়ায় এসে দাঁড়ালেন তিনি।

যেখানে গাঢ় কাকমন অনেক মানুষ। ছিলো মানুষের স্তূপ।
হত্যার ষড়যন্ত্র নিয়ে শায়বা, ওৎবা, আবু সুফিয়ান অবিরাম আতাতায়ী।
রাতের কালো কুৎসিত ফেনায়িত তিমির অন্ধকারে
এবং সেই বিশ্বের তিমির ভেজা জমিনে যারা ছিলো নক্ষত্র প্রদীপ
সোনালী সূর্যের আলোর তৃষ্ণা বুকে বেঁধে যারা হাঁটি হাঁটি উম্মাত
হয়েছিলো দিগন্তে জ্যোতির্ময়।
তাদেরই মুহাব্বাতে জান্নাত ফেলে তিনি এলেন ফিরোজা গম্বুজের ছায়ার নিচে
বুকের দরোজা খুলে, বুকের বাষ্প নিতে, সোনালী মানুষের ভিড়ে
তিনি জান্নাত ফেলে এসে দাঁড়ালেন মরুমরীচিকা নদীটির তীরে।

যেখানে হত্যার ভয়!
যেখানে পথে পথে কাঁটা বুড়ি মা-র।
যেই বালুকার পথ ভেঙে ভেঙে পবিত্র কদম মুবারকের গাঢ় লাল রক্ত শিশির
অকাতরে ঝরালেন নির্ভয়
এবং সেই পথ চলাটাই ছিলো সিরাতে মুস্তাকিম।
সেই পথের কিনারে উদ্বাস্তু মানুষের পাশে দাঁড়াবার অক্লান্ত বাসনায়
আল্লাহর জমিনে বাঁধতে আল্লাহর বাসনার ঘর,
যিনি এলেন ফিরে ফিরোজা গম্বুজের নিচে। জান্নাতের বর্ণনাহীন সুখ অবহেলা করে।
কী অবিচ্ছেদ্য আকর্ষণ মাটি আর মানুষের, পর।
তিনি এসেছিলেন ফিরে এই ধূসর মৃত্তিকায় ফলাতে সোনালী ফসল,
নির্যাতিত মানুষকে দিতে সন্তানের অর্থে সমুদ্র আদর।
নারীর সোনালী সম্পদের ভাস্কর্যে দিতে নিরাপদ দুর্ভেদ্য পাহাড় প্রাচীর।

www.bjilibrary.com

তিনি দেখেছিলেন জান্নাত-জাহান্নাম, সিদরা বৃক্ষ, আরশে মোয়াল্লাহ–
তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন সাক্ষীর মুখোমুখি : ঠিক দুই ধনুকের কাছাকাছি
আপন জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়।
গভীর রাতে তাহাজ্জুদে ঝরিয়ে চোখের লবণাক্ত বেতফল, শিশিরের ফোঁটা,
সকলের মুখেই একমাত্র উচ্চারণ : হে আরশের মালিক! হে পরওয়ার!
আপনার জান্নাত চাই।
একমাত্র জান্নাত করুন কবুল ও মঞ্জুর।
কিন্তু ইনছানে কামিল যিনি : তিনি ছায়াহীন।
নি:সংগ একাকী তিনি নি:সীম আকাশের অবরুদ্ধ সমস্ত দরোজা খুলে খুলে,
আল্লাহর আতিথেয়তা ও সান্নিধ্যের অনন্ত সাগরে সমাহিত হয়েও একটা অশান্তি ও অতৃপ্তির দহনে দগ্ধ হন তিনি।
তাই তিনি নি:সংগ জান্নাতের প্রশান্তির চেয়ে উম্মাতের সংগ পেতে,
জান্নাত ফেলে ফিরে এলেন ধূসর মৃত্তিকার, পর ফিরোজা গম্বুজের নিচে
ফলাতে ফসলের দানা এবং সোনালী ফসল।

একটা সোনালী পুষ্পনীল সমাজ। একটা শাশ্বত সংস্কৃতি এবং একটা কল্যাণময় রাষ্ট্র।

না'তে রসূল ॥ নূ র- ই আ উ য়া ল

এই জীবনের আমলে নেই সুন্নতে রসূল;
শুধু নবী প্রেমে গজল গেয়ে মিটবে কি সে ভুল?

দায় মেটাতে কোথায় নেকী?
নিজের সাথেই মুনাফেকি
নাফরমানি জিন্দেগানি কাটাতে মশগুল।

ঈমানদারি মূলে কোন আমলদারি নেই;
ষড় রিপুর শয়তানিতে নিত্য হারাই খেই।

কোরান হাদিস মেনে জেনে
চলার পথে হদিস এনে
সুরে সুরে একিনে গাও নিখাঁদে বুলবুল।

www.bjilibrary.com

ওড়াও সঠিক তরীর পাল ॥ গো লা ম ন বী পা ন্না

সালের পরে সাল
ভুলের পথে আর কতো কাল?
ওড়াও সঠিক তরীর পাল।

তাই বুঝে নে পথ
জানো আমরা কার উম্মত
যাঁর চলার পথটি সৎ।

তাঁর দেখানো পথে
জীবন গড়া তাঁর মতে
ওরে থেকো না অমতে।
তাই করো না ভুল,
তিনি মোহাম্মদ রাসূল
তাঁকে ডেকে পাবিরে সব কূল।

হাযমাতে জিবরাঈল ॥ র ফি কু ল ই স লা ম ফা রু কী

হৃদয়-লোবান পুড়ে পুড়ে অঙ্গার
নফসে আম্মারা ডাকে হাওয়ার ভেলায়
ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ে নফসে লাউয়্যামার আফসোস;
কেনো ছুঁইতে গেলি মন-কামনার অরণ্য-বন
কেনো রিপুর তাড়নায় তস্কর সুঁতোয় বাজে নফসের একতারা?

আমি যাঁকে চাই তাঁর পথ অবরোধ করে রাখে ইবলিস রোষানল
বার বার পুড়ে যায় ক্ষয়য়ে যাই পিঞ্জর মনপাখি;
নি:শ্বাসে-প্রশ্বাসে দিন যায় রাত আসে
মেধার জোস্‌নায় প্লাবিত হাসি—কেঁদে ভাসি, কোথায় ঠিকানা?
এই তো রাহ্‌বার; ডাকে বারবার
হেরার মিঠেল হাওয়া কাবার গিলাফ ছুঁয়ে উড়ে আসে তাঁর সুর!

আমি হেঁটে যাচ্ছি–যাবোই কামনার নিষিদ্ধ অরণ্য মাড়িয়ে
ইবলিস রোষানল তাড়িয়ে হাওয়াই দুলকির মতো

www.bjilibrary.com

হেরার ঠিকানায়...
কাবার গিলাফ ছুঁয়ে কাঁদবো–
দাও খোদা! নফসে মুতমাঈন্নার প্রশান্তি
দাও সুমতি রাসূলকে ভালোবাসার
দাও জান্নাতের ইয়াকুত পাথর পরশে পাপের মুক্তি!

আমি বুকফাঁটা আকুতি প্রেমের ভাষায় বলবো,
বার বার বলবো...
পান করাও খোদা–শরাবে আবরার
কিংবা হাযমাতে জিবরাঈল নাকরাতুল গুরাবের
মিঠা পানি।
বরফকুঁচির মতো সাদা হয়ে যায় হৃদয়ের তলদেশ।

মানবতার জয়গান ॥ নজরুল ইসলাম শান্ত

যদি মানবতা হারায় বিশ্ব
জানি সেই দিন হবে সবই নিঃস্ব
এই সাগর-পাহাড়-মরুভূমি–
মুছে যাবে সবুজের দৃশ্য।

শুধু কোরান-হাদীছ মতে চললে
অসতের বিরুদ্ধে লড়লে
রয়ে যাবে পৃথিবীটা অম্লান,
থাকো যদি সুপথের মিত্র।

যদি কালেমার বাণী থাকে অন্ত্রে
রাসূলের কথা বাকযন্ত্রে
অন্তরে ঈমানের বুনিয়াদ,
গেঁথে যাবে যতো সাদৃশ্য।

যদি পৃথিবীকে চাও ধরে রাখতে
নতুন দিনের ছবি আঁকতে
সত্যের বাণী দাও পৌঁছে,
হও সবে রাসূলের শিষ্য।

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবী ॥ এ না ম   শে খ

ছোট শিশু জন্মেছিলো মা আমেনার কোলে,
সারা জাহান আলো হলো নূরের দুয়ার খুলে।
ফুটেছিলো পবিত্র ফুল মরু-সাহারাতে,
ফেরেস্তারা ছিলেন সদা তাঁরই পাহারাতে।
শিশুকালেই হয়েছিলেন পিতা-মাতাহারা,
তখন থেকেই শুরু হলো দু:খ-ব্যথার ধারা।
দুখের মাঝেই বড়ো হলেন এ পৃথিবীর কোলে,
প্রভুর কথাই ভাবতেন তিনি সকল ব্যথা ভুলে।
দিবা-যামি মশগুল থাকেন স্রষ্টার ইবাদতে,
তাইতো তিনি পেরেছিলেন আল্লাহর প্রিয় হতে।
সত্য-ন্যায়ের পথে ছিলেন তিনি জনম ভরে,
শত্রু-মিত্র ডাকতো তাই আল-আমিন নাম ধরে।
তিনি হলেন সেরা মানুষ রাসূল এবং নবী,
কাফের ফাসেক বেদীন যতো চমকে গেলো সবি।
তাঁরই ওপর নাজিল হলা সত্য কোরআনখানি,
যাতে আছে সব সমাধান সেই তো খোদারবাণী!
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারা মুখর নবীর গুণে,
নদী-জলে শাপলা হাসে তাঁরই বাণী শুনে।
দোজাহানের সেরা নবী তিনি নূরের ছবি,
খোদা তা'লার প্রিয় হাবীব আমার প্রিয় নবী।

রাসূলের প্রতি ॥ ই ক বাল মু জা হি দ

রাসূল, তুমি পেয়ারা নবী, দরুদ ও সালাম
তোমার নামে দরুদ পড়ি, পড়ি হাজার কালাম।
রাসূল, তুমি হীরে মতে নূরেরও জ্যোতি
আলোয় আলোয় আলোকিত দুনিয়া প্রকৃতি।

রাসূল, তোমার নামটি জপে হৃদয় করি আলো
তোমার নামের রোশনিতে দূর করি সব কালো।
রাসূল, তুমি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলে দ্যুতি
আঁধার রাতের পর্দা ছিঁড়ে জ্বেলেছে আশার বাতি।

www.bjilibrary.com

সৃষ্টির ধরা ॥ সৈ য় দ আ শ রা ফ হো সে ন মি ল ন

এ ধরা সৌন্দর্যে ভরা
চন্দ্র সূর্য আকাশ মাটি
সবই আছে পরিপূর্ণ গড়া
তুমিও আছো চিরখাঁটি।

গড়েছো আদম– নর-নারী
সৃষ্টির রহস্য ধরি
জীবজন্তু তরুলতা ঘাস
সকলকে করেছো তোমার দাস।

তোমার তরে ইবাদত করি
ইবাদতে পড়ে কিঞ্চিৎ কম
জিবরাঈলকে পাঠাও তুমি
কেড়ে নিয়ে যায় দম।

ধরাকূলে পড়ে কান্নার রোল
মাটির দেহ অন্ধ গুহায়
নিজ কর্মের হিসাব নিকাশ
ত্বরিত মেলানো বড়ো দায়!

তুমি স্বয়ং শ্রেষ্ঠ কাজী
আমি তো প্রভু হাজির আজি
তোমার করুণা বোঝা দায়
রোজ হাশরে তরিও আমায়।

www.bjilibrary.com

মহানবী [সা] ও বিশ্বসংস্কৃতি

শেখ আবুল কাশেম মিঠুন

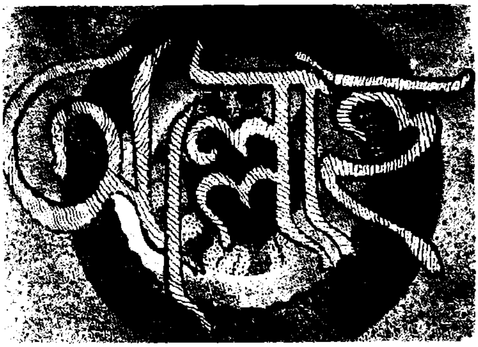

আমরা জানি অজ্ঞতা ও অশিক্ষা মানুষকে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাধরদের আজ্ঞাবহ করে রাখে। অজ্ঞতা ও অশিক্ষার ফলে মানুষের মানসিক বিকাশ সাধিত হয় না, চিন্তাধারা প্রসারিত হয় না এবং নৈতিক বলবীর্য হারিয়ে মানুষ নিজেকেই বস্তুসদৃশ করে তোলে। অর্থবিত্তের লোভ, চোখ রাঙানি, দাপট অথবা আদর-ভালোবাসা, মমতা দিয়ে তাকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষের বহুবিধ পাওয়া না পাওয়ার অতি আবেগগ্রস্ত মনস্তাত্ত্বিকতাই ব্যক্তিপূজার জন্ম দেয়। অর্থ, দাপট অথবা ভালোবাসা প্রেম দিয়েও যা পাওয়া যায় না, সেই 'পূজা' পাওয়ার জন্য ধুরন্ধর ক্ষমতাধররা পূজারীর অন্তরাত্মায় বসবাসের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এবং দয়া-দাক্ষিণ্য ও অতিমানবিক আবেদনের বিভিন্ন আঙ্গিকের অভিনয় দিয়ে একটা দেবত্বের স্বরূপ তার অন্তরে মুদ্রিত করে রাখতে প্রয়াস পায়। অতি কাছের তোষামোদী চক্র তাতে বাতাস করে নরমকে শক্ত অথবা গরমকে ঠাণ্ডা করে তোলে।

অন্যদিকে হিংস্র বর্বর খুনপিয়াসী মানুষকেও অশিক্ষিত অজ্ঞ লোক পূজা করে প্রতিপক্ষের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার শক্তি সরবরাহের অস্ত্র হিসেবে। এরূপভাবে অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তি ও ধুরন্ধর ক্ষমতাধরদের সমন্বয়েই মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে। বিশ্বখ্যাত

www.bjilibrary.com

ঐতিহাসিক, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও গবেষক আল বিরুনী মূর্তিপূজার উদ্ভব সম্পর্কে তার বিশ্ববিখ্যাত 'ভারততত্ত্ব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "আমাদের পয়গম্বর ও কাবাগৃহের যদি একটি ছবি বানানো হয় এবং কোন অশিক্ষিত নারী ও পুরুষের সামনে তা পেশ করা হয় তাহলে তা দেখে তো তারা আহ্লাদিত হবেই। সেই সাথে সেই ছবিতে তারা চুমু খাবে, তাকে গালে গলায় সব জায়গায় রেখে আদর করবে এবং সমানে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, যেন তারা কোন ছবি দেখছে না, বরং মূল ব্যক্তিকেই দর্শন করছে এবং এমন অনুভব করবে যেন মক্কা-মদিনায় হজ্জের ছোট-বড় হুকুম-আহকামগুলো পালন করছে। ...এটাই তাকে মূর্তি তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করে আর কিছু অত্যধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, পয়গম্বর, মুণি-ঋষি, ফেরেশতা ইত্যাদির সম্মানে স্মারক [ভাস্কর্য] নির্মাণ করে, যার উদ্দেশ্য অনুপস্থিতির সময়ে বা মরণের পরে তাদের স্মৃতি নিয়ে মানুষের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেয়া। ...এভাবে তাদের চিত্র ও স্মৃতিচিহ্নগুলোকে [ভাস্কর্য] সম্মান করাটা তাদের ধর্মবিশ্বাসের অনিবার্য অঙ্গ বানিয়ে দেয়া হয়।"

আল-বিরুনী আরো লিখেছেন; "...এ ধরনের ধ্যান-ধারণা কেবল অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। ...যারা মুক্তি পথের পথিক বা যারা দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং যারা বিমূর্ত সত্যকে লাভ করতে ইচ্ছুক যাকে তারা 'সারসত্তা' বলে, তারা ঈশ্বর ছাড়া আর কারোরই উপাসনা করে না। আর তারা ঐ ঈশ্বরকে মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করে তার উপাসনা করার কথা কল্পনাও করতে পারে না।"

হিন্দুরা বলে যে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে মূর্তি নির্মাণ ও পূজা শুরু হয়েছে :

'ইন্দ্র রাজা অম্বরীশকে বলেছিলেন, যখন মানবসুলভ বিস্মরণশীলতা তোমাকে অভিভূত করে তখন তোমাকে নিজের জন্য এমন একটি প্রতিমা বানিয়ে নেয়া উচিত যেমনটি আমি তোমার ওপর প্রকাশ করেছিলাম, মূর্তিবেদির ওপর সুগন্ধ ও ফুল ছড়িয়ে তেমনই তুমি আমাকে আরাধনা করবে। এভাবে তুমি আমাকে স্মরণ করবে।"

উপরোক্ত বিবরণগুলো থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, অজ্ঞতা ও অশিক্ষার ফলে মানুষ অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে ধাবিত না হয়ে প্রকাশমানরূপে ঝলক ও চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তা অনুসরণ ও অনুকরণ করে। সত্যের দিকে অগ্রসর না হওয়ার কারণে মানুষ অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ, সঙ্কীর্ণ মানসিকতা ও স্বার্থান্ধ হয়ে ওঠে। আর এই দোষগুলোর ভিত্তি হলো অহঙ্কার। অহঙ্কার মানুষকে স্বার্থ উদ্ধারকারী ব্যক্তিকে পূজা করতে শেখায় এবং যে স্বার্থ উদ্ধারকারী নয়, সে যতই সত্যপথের পথিক হোক বা মহামানব হোক তাকে তারা সহ্য করতে পারে না।

অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কারণে মানুষ যাতে পথভ্রষ্ট না হয়, হানাহানি না করে, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী না হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথম সৃষ্ট মানুষকে নবী হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন। নবীর মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করে করণীয় কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অবহিত করেন। প্রথম মানুষ আল্লাহর নবী হযরত আদম [আ]-কে দুনিয়াতে পাঠাবার সময়েই আল্লাহ বলেছিলেন, "আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে [আইন ব্যবস্থা সম্পর্কিত]

www.bjilibrary.com

হেদায়াত আসবে, অত:পর যে আমার বিধান মেনে চলবে তার কোন ভয় নেই, তাদেরকে কোনো প্রকার উৎকণ্ঠিত হতে হবে না। আর যারা [আমার আইন-কানুন] অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে [লাগামহীন জীবন যাপন] করবে তারা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।" [সূরা আল-বাকারা : ৩৮-৩৯]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়ে তাঁর হেদায়েত দিয়ে মানুষের অজ্ঞতা দূর করেছেন। অজ্ঞতা ও অশিক্ষা একটি অভিশাপ- একটি ভয়াবহ মারাত্মক অপরাধ। এখানে অজ্ঞতা ও অশিক্ষা বলতে এটা নয়, "আমি ডাক্তারি বিদ্যা জানি না তাই আমি অভিশপ্ত বা অপরাধী অথবা আমি দীর্ঘ জীবন একজন পারিবারিক সদস্য হয়েও রন্ধন প্রণালী জানি না তাই আমি অভিশপ্ত বা অপরাধী।" বিষয়টি মোটেই তা নয়। অজ্ঞতা ও অশিক্ষা হচ্ছে এমন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও জ্ঞান থাকলে মানুষ আর অজ্ঞ থাকে না। তার অন্তর্লোক কষ্টি পাথরের মতো সঠিক স্বর্ণ চিনে নিতে পারে অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুগত সমাহারে সে নিজের চিন্তা ও কর্মকে কিভাবে পরিচালিত করবে সে বিষয়ে জ্ঞান। সেই জ্ঞানই মানুষকে সঠিক পথে চলার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেয়। সঠিক মানুষ চেনার মনশ্চক্ষু খুলে দেয়। হযরত আলী [রা] বলেছেন, "কোন বস্তু বা মানুষকে দিয়ে সত্য বিচার করো না, আগে সত্যকে জানো, সঠিক বস্তু বা সঠিক মানুষ আপনাতেই তোমার চোখে ভাস্বর হয়ে উঠবে।" সেই জ্ঞান হচ্ছে [ক] মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক কি অর্থাৎ তৌহিদ সম্পর্কে জ্ঞান। [খ] পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা কি, সৃষ্টিকর্তা কি কি কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, এসব জ্ঞান নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ রিসালাত সম্পর্কে জ্ঞান। [গ] এই পৃথিবীতে মানুষ যে সব চিন্তা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে এবং তারই আলোকে কর্ম সম্পাদন করবে মৃত্যুর পর স্রষ্টা তারই আলোকে বিচার ফয়সালা করবেন। মানুষ তখন ভালো কাজের ভালো ফল, খারাপ কাজের খারাপ ফল পাবে অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞান।

তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা মানুষের জন্য ফরযে আইন। পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষকে আল্লাহ তা'আলা উক্ত জ্ঞান অর্জন করার কঠোর তাগাদা দিয়েছেন। এই জ্ঞান অর্জন না করলে মানুষ তার কাজকর্মে ভুল করবে, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে, স্বার্থান্ধ হবে, অন্য মানুষকে অমানবিকভাবে ব্যবহার করবে, বস্তুর অকল্যাণকর ব্যবহার করবে এবং নৈতিক চরিত্র হারিয়ে অপরাধী কর্মে লিপ্ত হবে। তাই ফরযে আইন বিষয়ক উক্ত জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। নবী-রাসূলদের উম্মতগণ উত্তরাধিকারসূত্রে উক্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাই অন্যের কাছে এই জ্ঞান কথার মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে এবং আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া মুসলমানদের জন্য ফরযে আইন। যাদের কাছে উক্ত জ্ঞান আছে এবং সরল বিশ্বাসে খুশি মনে যারা তা মান্য করে ও পালন করে তারাই মুসলমান নামে অভিহিত। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "এখন দুনিয়ার সেই সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের

www.bjilibrary.com

হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে, তোমরা ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ করো, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে চলো।" –মুসলমানরাই আল্লাহর দেয়া আইন-বিধান প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়াতে কল্যাণ স্থাপন করতে পারে। অন্য মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা অথবা তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের খবর পৌঁছে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে আইন যাতে কেয়ামতে অপরাধী ব্যক্তি বলতে না পারে, উক্ত জ্ঞান তো আমাদের কাছে ছিল না। তাই আমরা অপরাধ করেছি।" [সূরা আলে ইমরান-১১০] আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টিও পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, "আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং পরিণতির ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছেন, যাতে করে মানুষ তার কাছে এরূপ বিতর্ক তোলার সুযোগ না পায়, আমরা তো বেখবর ছিলাম। আর আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আন-নিসা-১৬৫]

এখন সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীর বুকে অন্ধকারে আল্লাহ ছেড়ে দেননি বা ফেলে রাখেননি। তাকে সঠিক পথ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তার মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তার করণীয় সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন। প্রথম মানুষ হযরত আদম [আ] থেকে শুরু করে শেষ নবী [সা] পর্যন্ত যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী পাঠিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ [সা] শেষ নবী হওয়ার তাৎপর্য তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন, "পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে আমার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে একটি সুরম্য, পূর্ণাঙ্গ ও সুশোভিত প্রাসাদ নির্মাণ করলো কিন্তু একটি ইটের স্থান পরিত্যক্ত [অসম্পূর্ণ] রেখে দিল। জনতা প্রাসাদটি প্রদক্ষিণ করতো এবং তাতে বিস্মিত হয়ে বলতো, তার নির্মাতা যদি ঐ ইটের স্থানটি পূর্ণ করতো! অতএব, আমি নবীগণের মধ্যে সেই ইটের স্থান সমতুল্য।" –উবাই ইবনে কা'ব [রা] বর্ণিত।

অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার উন্মেষ ঘটে গেছে। আবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতিকস্বরূপ একটা নির্দিষ্ট অবয়ব পেয়েছে। শুধু সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতি-নিয়মের অধীনে একটি কল্যাণময় পৃথিবী তৈরি করতে হলে হযরত মুহাম্মদ [সা] আনীত কুরআন ও তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করলেই তা সম্ভব। আর নতুন কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব হবে না সেটা নয়, তবে যা-ই ঘটুক, তা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতেই সঠিক পথে চালনা করা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির স্বরূপ বিচার করতে হলে নবীর [সা] আগমনের প্রাক্কালে পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির রূপ কেমন ছিল তা আমাদের সামনে থাকা দরকার। স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার পাঠানো নবী ও রাসূলরা যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছেন তা মানুষ এক সময় বিকৃত করে ফেলেছে, জনপদ আবার অকল্যাণের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা নবী পাঠিয়েছেন। এভাবে লক্ষ লক্ষ নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। আর তাঁদের আনীত আইন ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়েছে। শেষ নবী [সা] যখন আগমন করেন তখন সমস্ত পৃথিবীর

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ছিল এবং বিকৃতির শিকার। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ ব্যবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতি ছিল অমানবিক ও অশ্লীল পন্থার অনুসারী। আজকের পৃথিবীতে যত জনগোষ্ঠী বিদ্যমান তাদের মধ্যে যতটুকু কল্যাণ ও মানবিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করা যায় তা একমাত্র ইসলামেরই অবদান এটা অকাট্যভাবে সত্য। শেষ নবী [সা] আনীত জ্ঞান উপযুক্ত মানুষের মাধ্যমে সার্বিকভাবে অর্থাৎ সত্যিকার মুসলমানদের ছাড়া কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৌছানোর অব্যাহত চেষ্টা থাকবে বলেই নতুন করে নবী পাঠানোর কোন যুক্তি থাকে না, আর তাই কোন নবীর আগমন ঘটবে না।

নবী [সা] আগমনের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অবস্থান নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ আলোচ্য প্রবন্ধে নেই, তবে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের খোদ মক্কা নগরীতে রাসূলের [সা] একটি ঘটনা তাবৎ মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরে।

মদিনার খাযরাজ গোত্রের একজন নেতা নাম আসআদ বিন যুরারাহ মক্কায় গেল কুরাইশদের কাছ থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য নেবার জন্য, যাতে মদিনায় তাদের দুশমন আওস গোত্রকে পদানত করতে পারে। আসআদ কুরাইশ নেতা উতবাহ বিন রাবীয়ার বাড়িতে গেল। উতবাহ বললো, আমরা তোমাকে কোন সাহায্য আপাতত করতে পারবো না। কারণ এক কঠিন সমস্যায় পড়েছি আমরা। আমাদেরই এক ব্যক্তি [রাসূল সা] আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে কটূক্তি করছে। মিষ্টি মধুর ব্যবহার আর ভাষা দিয়ে আমাদের একদল যুবককে তার দলে ভিড়িয়েছে। এভাবে সে আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। হজ্জের মৌসুমে আগত লোকদেরকে সে তার ধর্মের দিকে আহ্বান জানায়। এসব নিয়ে আমরা খুব বিপদে আছি। আসআদ অগত্যা মদিনায় ফিরে যাবার মনস্থ করে। কিন্তু কাবা তাওয়াফ ও যিয়ারত না করে মদিনায় ফিরে যাওয়া শোভনীয় নয়। যদিও উতবাহ বলেছে, কাবাঘর যিয়ারত করতে গেলে লোকটির [রাসূল সা] কথা শুনে তুমি কিন্তু বদলে যেতে পার। তাই কাবা যিয়ারত করতে গেলে কানের ভেতর তুলো দিয়ে রেখো।

আসআদ মসজিদুল হারামে যায়। তাওয়াফ করার সময় মহানবীকে [সা] দেখে তিনি হুজরতে ইসমাঈলে বসে আছেন। সে তাঁর সামনে গেল না। কিন্তু শেষে কৌতূহল দমন করতে না পেরে মহানবী [সা]-এর সামনে গিয়ে আরবদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সম্ভাষণ জানালো, "আপনার প্রাত:কাল মঙ্গলময় হোক। সম্ভাষণটি যদি আমাদের রেডিও, টিভি ও চ্যানেলের সম্ভাষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় তবে আমাদের বর্তমান সময়ের সংস্কৃতি ও সে সময়ের আরবদের সংস্কৃতির একটা সেতুবন্ধন আমরা খুঁজে পাই। আমাদের সংস্কৃতির এখন যারা বাহক তাদের বিশ্বাস, তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি বুদ্ধিবৃত্তিও এ সবের সংস্কৃতির স্বরূপ জাহিলি সংস্কৃতির আধুনিক সংস্করণ ছাড়া কিছুই নয়। সুদ, জুয়া, মদ, অশ্লীলতা, বর্ণপ্রথা, শোষণ-শাসন পদ্ধতি সব কিছুর বহি:প্রকাশ তাদের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। যা-ই হোক, আসআদের সম্ভাষণের জবাবে মহানবী [সা] বললেন, "আমার মহান প্রভু আল্লাহ এর চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ ও সালাম অবতীর্ণ

www.bjilibrary.com

করেছেন। আর তা হচ্ছে, "আসসালামু আলাইকুম"– আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! আসআদ আকৃষ্ট হলো। সে মহানবীর [সা] লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। মহানবী [সা] সূরা আন'আমের ১৫১ ও ১৫২ নম্বর আয়াত পড়ে শোনালেন। আসআদের অন্তরে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করলো এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আসআদ [রা] কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন? কি ছিল দু'টি আয়াতের মধ্যে ? তাঁর নিজের জীবন, মন-মস্তিষ্ক, তাঁর রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল ? হঠাৎ তার গতি পরিবর্তন হলো কেন? এসবের জবাব হয়তো ব্যাপক বিস্তৃত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করা। উক্ত আয়াতে ছিল, "তোমার সব কিছুর মালিক, রব, প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ– তাঁর কোন শরিক নেই, তোমরা শিরক করো না।" অর্থাৎ শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, সমস্ত পৃথিবীর জনবসতি তখন শিরকে লিপ্ত ছিল। আর এর একমাত্র কারণ ছিল অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। আয়াতের মধ্যে আরো ছিল, "তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। আমাদের জেনে রাখতে হবে যখন একটা বিষয়ের অনুপস্থিতি থাকে তখনই বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়।" অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ তখনকার পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল। উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমরা তোমাদেরকে এবং তাদেরকে জীবিকা দান করি। তোমরা গোপন ও প্রকাশ্য পাপাচারের নিকটবর্তী হয়ো না।" এ ছাড়াও রয়েছে অন্যায় হত্যা নিষিদ্ধকরণ, অনাথের সম্পত্তি হস্তগত না করা, ন্যায়পরায়ণতার সাথে ওজন করা, নিকটাত্মীয় হলেও ন্যায্য কথা বলা, আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার [অর্থাৎ আল্লাহর আইন- বিধান মেনে চলা] পূর্ণ করা ইত্যাদি।

একটি সূর্যই সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করে। তেমনি আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত বাণী সূর্যের আলোর চেয়েও চিরন্তন, চিরভাস্বর–সমস্ত জনগোষ্ঠীর অন্ধকার জীবনে আলোস্বরূপ। তাই অন্ধকারের বাসিন্দা আসআদ [রা] আলোর সন্ধান পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ত্যাগ করলেন। মহানবীর [সা] আগমনের পূর্ব থেকেই সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা তৎকালীন আরবদের চেয়ে কোন অংশে কম জাহিলি ছিল না, বরং কোন কোন জনপদে আরো বীভৎস ভয়ঙ্কর অবস্থা বিদ্যমান ছিল! যেমন সমগ্র আফ্রিকার মানুষ মানুষের গোশত খেত। দাস ব্যবসা ছিল অবারিত। বেশির ভাগ এলাকার মানুষ উলঙ্গ থাকতো। তাদের আচার-আচরণ ছিল অসভ্য বর্বরসুলভ। নোংরামি ছিল তাদের সহজাত। মাত্র তিন শত বছর পূর্বেও তাদের অবস্থা এমন ছিল। কিন্তু ইসলাম প্রবেশের পর তাদের জীবনধারা বদলে যায়। জনৈক ইউরোপীয় পর্যটকের উদ্ধৃতি মাওলানা মওদূদী [রহ] উল্লেখ করেছেন, "আমি [পর্যটক] যখন মধ্যসুদানের নিকট পৌঁছলাম তখন উপজাতীয় গোত্রগুলোর জীবনে আমি প্রগতির নির্দশনাবলী দেখতে পেলাম, যা দেখে আমার ধারণা পাল্টে যেতে লাগলো। আমি দেখলাম, সেখানে মানুষ খাওয়ার প্রবণতা নেই, মূর্তিপূজারও অস্তিত্ব নেই, মদখোরী, নেশাখোরীও বিলুপ্ত প্রায়। সকল গোত্রের লোক

www.bjilibrary.com

কাপড় পরে। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার ও পবিত্র রাখে এবং আচার-আচরণে ভদ্রতা রক্ষা করে। ....নিগ্রো প্রকৃতি যেন কোন উন্নততর প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আর এ সবই হচ্ছে ইসলামের কল্যাণে। 'লোকোজা' নামক জায়গাটা অতিক্রম করার পর আমি ইসলামী প্রচার কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলাম এবং সেখানে এক অতি উচ্চাঙ্গের শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রশাসন সক্রিয় দেখলাম। চারদিকের লোকবসতিতে সর্বত্র সভ্যতার নিদর্শন পরিস্ফুট। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারিগরির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে এবং আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন একটি সুসভ্য দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি! শুধু সুদান নয়, সমগ্র আফ্রিকার সেনেগাল, গায়েনা, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া, লাগোস, ঘানা, নাইজেরিয়া ইত্যাদি এলাকার জনবসতি ইসলামের আইনের আলোয় আলোকিত হয়েছে।"

সমগ্র চীনে ছিল প্রকৃতি পূজা, পুরোহিত পূজা, পূর্বপুরুষ পূজা। পরবর্তীদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে চীনের জনসমষ্টি নাস্তিক হয়ে পড়ে। বুদ্ধের মূর্তি পূজাই ছিল তাদের সারধর্ম। বনু উমাইয়ার যুগে চীনে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ১৩ শতকে মার্কোপেলো লিখেছেন, 'প্রায় সমগ্র উনান প্রদেশে মুসলমান হয়ে গেছে।' দক্ষিণ চীন সম্পর্কে ইবনে বতুতা লিখেছেন, 'সব শহরতে মুসলিম মহল্লা রয়েছে।' ১৫শ শতকে আলী আকবর নামক জনৈক মুসলিম বণিক লিখেছেন যে, পিকিং-এ [বেইজিং] প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলিম পরিবার বাস করে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। জাভা দ্বীপ, সুমাত্রা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মরক্কো দ্বীপপুঞ্জ, বোর্নিও দ্বীপ, ফিলিপাইন, নিউগিনি এসব এলাকায় পৌত্তলিকতার অভিশপ্ত জনপদ ছিল, কোথাও ছিল হিন্দু পৌত্তলিকতা, কোথাও ছিল 'যিশু ও মেরি' পৌত্তলিকতা। আর শিরক উদ্ভূত যাবতীয় সংকীর্ণতা, বর্ণপ্রথা, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, অশ্লীলতা, অবিচার-অনাচার তার শিকড় বিস্তার করেছিল সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

ভারতবর্ষের কথা তো সবার জানা। অসভ্যতা আর অপসংস্কৃতি ভারতীয় জনপদকে অমানবিকতার নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। চুরির অপরাধে এক এক জাতিগোষ্ঠীর এক এক শাস্তির বিধান ছিল। এখানেও বর্ণবাদ মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে ছিল। হত্যার অপরাধেও বর্ণভেদে শাস্তির বিধান ছিল। ব্রাহ্মণের শাস্তি ছিল– তাকে অন্ধ করে দেয়া হতো। ক্ষত্রিয়দেরকে অন্ধ করা হতো না, তাদেরকে বিকলাঙ্গ করা হতো। শূদ্র, বৈশ্য ও অন্য জাতিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। ব্যভিচারিণীকে দেশ ছাড়া করা হতো। যুদ্ধবন্দীরা দেশে ফিরলে তাদেরকে কয়েকদিন উপবাসে রাখা হতো। তারপর গোবর, গোমূত্র ও গো-দুগ্ধ খাওয়ানো হতো। এতেই অনেকে বমি করতে করতে মারা যেত। শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং প্রজাদের বশীভূত করার জন্য রাজানার প্রচলন করেন। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধকরণ ও সহমরণ প্রচলিত ছিল। সন্তানের জাত বিচার হতো মায়ের দিক থেকে। ধর্ম গ্রন্থ পাঠ বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কেউ পাঠ করলে তার জিহ্বা কেটে দেয়া হতো, কেউ শুনলে তার কানে গরম সীসা ঢেলে হত্যা করা হতো। তারা শরীরে কোন অংশের কেশ মুণ্ডন করতো না। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে গোসল করতো। তারা ঘরে প্রবেশের অনুমতি নিত না, কিন্তু বেরোনোর সময় অনুমতি নিত। থুথু ফেলা

www.bjilibrary.com

বা নাক ঝাড়ার সময় আশপাশের লোকদের পরোয়া করতো না। তারা তাদের পুস্তকের শিরোনাম গ্রন্থের শুরুতে দেয় না, নিচে দেয়। মৃতের ব্যাপারে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতো তারাও ধারণা করে যে, মৃত্যুর আত্মা মৃতের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে। নারীকে তারা দাসী হিসেবে গণ্য করত। হিন্দু শাস্ত্রকার মনু বলেন, "মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোকের সংস্কার হয় না। এ কারণে তাদের অন্ত:করণ নির্মল হতে পারে না।" তৎকালীন পৃথিবীতে পারস্য [ইরান-ইরাক] ছিল সভ্যতার লীলাভূমি। তাদের ধর্ম ছিল অগ্নি পূজা, মূর্তি পূজা, প্রকৃতি পূজা ইত্যাদি। সমাজ ছিল নিষ্ঠুর শ্রেণী বৈষম্যের শিকার। সম্পদের মালিকানা ও স্বত্বাধিকার সাতটি পরিবার বা বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ জনগণ ছিল বঞ্চিত। অভিজাত সাতটি পরিবার শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রাখত। সাধারণ জনগণ শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। সম্রাট খসরু পারভেজের ছিল তিন হাজার স্ত্রী, বারো হাজার গায়িকা দাসী। এছাড়াও তার হেরেমে কয়েক হাজার নারী, দাসী ও নর্তকী ছিল।

পারস্য ও রোম বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। এছাড়াও ছিল অভ্যন্তরীণ কোন্দল, যার পরিণতিতে চার বছরের মধ্যে চৌদ্দ বার ক্ষমতা বদল হবার ইতিহাসেও রয়েছে। প্রশাসনের ইতিহাস হত্যার ইতিহাস। পুত্র পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে। তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। ইহুদিরা ছিল রোমের ঘোর শত্রু। রোমে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতো। ইহুদিরা একবার ইরান থেকে আশি হাজার খ্রিস্টানকে ক্রয় করে দুম্বার মতো জবাই করেছিল। রোম সাম্রাজ্য খ্রিস্টে বিশ্বাসী হলেও তারা মূলত যিশুর মূর্তি পূজা করতো। তাদের সমাজ বন্ধন একেবারেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল, দুর্নীতি ও কুসংস্কারে ডুবে গিয়েছিল। অশ্লীলতা ও পাপ পঙ্কিলতায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল রোম সাম্রাজ্যে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে শাসকবৃন্দ সিংহের খাঁচায় ফেলে দিয়ে তার নারকীয় বীভৎস মৃত্যু দর্শন করে তৃপ্ত হতো। সে সময়ে ইউরোপের অবস্থা শুধু একটি উদাহরণেই যথেষ্ট মনে হবে। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ফ্লামারীয়োন ইউরোপের একটি পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন যেটি চার শ' বছর ধরে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ইউরোপে পঠিত হতো। উক্ত পুস্তকে আলোচনা হয়েছে, "একটি সুঁইয়ের অগ্রভাগের সরু ছিদ্রের মধ্যে কতজন ফেরেস্তা অবস্থান করতে পারে?" আর একটি আলোচনা এসেছে, "চিরন্তন পিতার বাম চোখের পুতুলী থেকে ডান চোখের পুতলী পর্যন্ত দূরত্ব কত ফারসাখ?" [১ ফারসাখ = প্রায় ৬ কিলোমিটার]। এখন অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তখনকার ইউরোপীয় সমাজে পুরোহিতরা কী দাপটের সাথে তাদের প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। তাদের গির্জাকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা কী নিস্পেষণ, নির্যাতন ও অশ্লীল সংস্কৃতির জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল সাধারণ মানুষকে। অজ্ঞতা, মূর্খতা, সংকীর্ণ জীবনযাত্রা, হিংস্রতা, পাশবিকতা, স্বার্থান্ধতা, অবিচার, বর্ণপ্রথা এবং আরো অন্যান্য চারিত্রিক ও নৈতিক দোষ-ক্রটির ন্যায় বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমগ্র পৃথিবীর জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছিল যা অন্যায়

www.bjilibrary.com

তা ছিল ন্যায়, যা ছিল লজ্জাজনক এমন স্বাভাবিক ও বৈধ হয়ে যায় যে, সেসব কাজ মানুষ প্রকাশ্যে সমাধা করতো।

মক্কা ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভিন্ন কিছু ছিল না। তাদেরও দাস ব্যবস্থা ছিল, তবে ইউরোপের মতো অত্যাচার নির্যাতন এবং ভারতের মতো শোষণ আরবরা করতো না। দাস মুক্তির ব্যবস্থা তারা রেখেছিল। তারা নরখাদক ছিল না। কিন্তু অবুঝ কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত।

আরব সমাজে অন্যান্য দেশের মতো নারীদেরকে পণ্যের মতো কেনাবেচা করা হতো। নারীরা সমস্ত সামাজিক অধিকার ও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের জঘন্য কুঅভ্যাস ছিল মদ্য পান। পানশালা ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকতো। পানশালার ছাদের ওপর বিশেষ ধরনের পতাকা উড়াতো। তাদের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল মদ। লুটতরাজ, জুয়া, সুদ ও মানুষকে বন্দী করে দাস হিসেবে কেনাবেচা করা ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আরবরা সহাস্য ছিল, দানশীল ছিল, অতিথিপরায়ণতা, আমানতদারি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করা, আকিদা বিশ্বাসের জন্য আত্মোৎসর্গ করা, স্পষ্টভাষী, অশ্ব চালনা, তীর নিক্ষেপে সিদ্ধহস্ত– এসব ছিল তাদের সহজাত গুণ, পলায়ন, শত্রুর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা তারা গর্হিত কাজ বলে মনে করতো।

তবে বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র, এমন কি বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতো ঐসব সৎ গুণের ভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল আরবদের। যেমন সাহসের অর্থ ছিল ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত ঘটানো। আত্মসম্ভ্রমবোধ বলতে তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করা বুঝাতো। তাদের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ততা ও সংহতি ছিল নিজ গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ মিত্রদেরকে সমর্থন করা, তা সত্যই হোক, অন্যায়ই হোক। মদ, নারী ও যুদ্ধের প্রতি তারা তীব্রভাবে আকৃষ্ট ছিল।

তারা কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। তারা উলঙ্গ হয়ে কাবা তাওয়াফ করতো। এত সব সত্ত্বেও তারা সাহিত্য চর্চায় ছিল উন্নত। বৈদেশিক বাণিজ্যে ছিল অগ্রসর। তারা রোমান জাতির আবির্ভাবের আগে উন্নত শহর ও নগর স্থাপন করেছিল যা অবস্থিত ছিল ইয়েমেনে। তারা ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ভাষা "আরবি ভাষা"র অধিকারী। তাদের ছিল ৩৬০টি মূর্তি। তারা মনে করতো প্রতিদিনের ঘটনা ঐ ৩৬০টি মূর্তির যে কোন একটির সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন বস্তুর পূজা করতো। চিন্তাশীলরা চাঁদের পূজা করতো, কিনানাহ্ গোত্র চাঁদ, তাঈ গোত্র শুকতারা, লাখম গোত্র "বৃহস্পতি", হিময়ার গোত্র "সূর্য" আসাদ গোত্র "বুধ গ্রহের" পূজা করতো। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বোঝা গেল যে, জীবনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু ভোগ বিলাস আর স্বার্থ উদ্ধারের মানসিকতা মানব সমাজকে কী গভীর পঙ্কিল আবর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এমন নিষ্পেষণ, হানাহানি, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতা আর অরাজকতার কারণ ছিল মানুষের অজ্ঞতা। আর অজ্ঞতার কারণেই মানুষ ছিল সংকীর্ণ চিন্তার অধিকারী, সঠিক কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। হতাশা, দুর্বলতা, হীনতার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে তারা নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে তারই মধ্যে আরাধ্য বস্তুর সন্ধান

www.bjilibrary.com

করতো। এই পৌত্তলিকতা ও শিরকবাদিতা মানুষের অন্তরে নিকৃষ্টতম দোষ 'অহঙ্কারে'র ভিত্তি স্থাপন করে। আর অহঙ্কার মানুষকে তার অন্তর্দৃষ্টি সত্যের দিকে ধাবিত হতে দেয় না। এই নিকৃষ্ট দোষ "অহঙ্কার"কে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার একমাত্র অস্ত্র হলো কালেমা তৈয়্যবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। রাসূল [সা] সেই কালেমা তাইয়্যেবা নিয়েই এলেন যার অর্থ আমরা হয়তো সংক্ষিপ্ত আকারে বুঝি, কিন্তু আবু জেহেল, আবু লাহাব তার যথাযথ মর্মার্থ বুঝতো বলেই চরম বিরোধিতা করেছিল। কালেমা তাইয়্যেবা যথার্থ অর্থ মাওলানা মওদূদী [রহ] বর্ণনা করেছেন, "মানুষ আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও নিজের পৃষ্ঠপোষক, কার্য সম্পাদনকারী প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী এবং সাহায্যদাতা ও রক্ষাকর্তা মনে করিবে না। কেননা তিনি ব্যতীত আর কাহারো নিকট ক্ষমতা নাই।"

"আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও কল্যাণকারী মনে করিবে না, কাহারও সম্পর্কে অন্তরে ভীতি অনুভব করিবে না, কাহার ওপর নির্ভর করিবে না, কাহার প্রতি কোন আশা পোষণ করিবে না এবং এই কথা বিশ্বাস করিবে না যে, আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত কাহারও ওপর কোন বিপদ মুসিবত আপতিত হইতে পারে। কেননা সকল প্রকার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই।

আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নিকট দোয়া প্রার্থনা করিবে না, কাহারও নিকট আশ্রয় খুঁজিবে না, কাহাকেও সাহায্যের জন্য ডাকিবে না এবং আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় কাহাকেও এতখানি প্রভাবশালী বা শক্তিমান মনে করিবে না যে, তাহার সুপারিশে আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তিত হইতে পারে। কেননা তাহার রাজ্যে সকলেই ক্ষমতাহীন প্রজামাত্র।

আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও সম্মুখে মাথা নত করিবে না এবং কাহারও উদ্দেশে মানত মানিবে না। কেননা এক আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত [দাসত্ব আনুগত্য ও উপাসনা] পাইবার অধিকারী আর কেহই নাই।

আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও বাদশাহ, রাজাধিরাজ ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানিয়া লইবে না, কাহাকেও নিজস্বভাবে আদেশ ও নিষেধ করিবার অধিকারী মনে করিবে না, কাহাকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানদাতা ও আইন প্রণেতা মানিয়া লইবে না এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর দেয়া আইন পালনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন সকল আনুগত্য মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে। কেননা স্বীয় সমগ্র রাজ্যের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও সৃষ্টিলোকের সার্বভৌমত্বের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও আসলেই নাই।"

কালেমা তাইয়্যেবার উক্ত অর্থই নির্ধারণ করে দেয় ক্ষমতাধররা নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য মনগড়া আইন তৈরি করে তার প্রচলন করে এবং তার প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তোলে। আর মানুষের মনগড়া নীতি-নিয়ম, আইন-কানুন, রসম-রেওয়াজই সমস্ত অনিষ্টের মূল। হতে পারে তা একজন সংসারের কর্তারূপী ক্ষমতাধর অথবা ছোট্ট মুদি দোকানের কর্তারূপী ক্ষমতাধর অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর। আসলে সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং সমস্ত আইন বিধানের উৎস একমাত্র এক আল্লাহ তায়ালা। কারণ তিনিই স্রষ্টা।

www.bjilibrary.com

যারা এই সত্যকে মেনে নিল তারা কল্যাণময় এক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিবাসী হলো। এই সত্যকে যারা মেনে নিতে পারে না তারাই অহঙ্কারী।

হযরত সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শামমাস [রা] আরজ করলেন, "ইয়া রালূলাল্লাহ, আমি স্বভাবগতভাবে রূপ সৌন্দর্য পছন্দ করি এবং নিজে সাজসজ্জা গ্রহণ করে থাকি এটা কি অহঙ্কার? মহানবী [সা] বললেন, "না, এটা অহঙ্কার নয়, বরং অহঙ্কার হচ্ছে হক ও সত্যকে অপছন্দ করা, অস্বীকার করা এবং লোকদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, অথচ তারা তোমারই মতো আল্লাহর বান্দা অথবা তারা তোমার তুলনায় শ্রেষ্ঠও হতে পারে।" আজ আমাদের দেশেই শুধু নয়, সারা পৃথিবীতে যে সংস্কৃতির প্রচলন, যাকে অপসংস্কৃতি বলা হয় তা সেই সত্য অস্বীকারকারী অহঙ্কারীদের সৃষ্ট যা রসূল [সা]-এর আগমনের প্রাক্কালে সারা পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের দেশে রাম ও বামপন্থী এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাম ও জড়বাদীরা হয়তো বই পড়ে লেখাপড়া শিখেছে, হয়তো বস্তুর ব্যবহারে ধনী ও চাকচিক্যময় জীবনের অধিকারী হয়েছে কিন্তু আসলে তারা অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। তাদেরই অজ্ঞতা ও অশিক্ষার ফসল হিসেবে বর্তমান পৃথিবীর যে জাহিলিরূপ আমরা দেখছি যা পনের শত বছর পূর্বে সমস্ত পৃথিবীতে বিরাজ করেছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমস্ত লোকালয়ে যে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত আছে তা মহানবী [সা] আনীত সত্যজ্ঞান থেকে উদ্ভূত।

মহানবীর [সা] নবুয়ত প্রাপ্তির সূচনা থেকে আজ অবধি প্রথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে কালেমা তাইয়্যেবা এবং ঈমান থেকে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক রূপরেখা। যে খ্রিস্ট ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে, পুরোহিতদের গির্জাকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা যা সমস্ত ইউরোপকে দোযখ সমতুল্য করে ফেলেছিল সে বিকৃত কর্মও সংশোধিত হয়েছে ইসলামের পরশে। গির্জাকেন্দ্রিক অত্যাচার তিরোহিত হয়েছে।

বাথরুম ব্যবহার, ঘরে প্রবেশের অনুমতি, সেচ ব্যবস্থা, হাসপাতাল ইত্যাদি থেকে শুরু করে মানুষের জীবনের সমস্ত দিকগুলোতে যে কল্যাণময়তার স্বরূপ সমস্ত পৃথিবীতে আমরা দেখেছি তা ইসলামেরই অবদান। আর যত অকল্যাণ তা সবই পৌত্তলিক, শিরক উদ্ভূত ও নাস্তিকতা থেকে সৃষ্ট।

পরিবার ব্যবস্থা, পিতামাতার অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, সন্তানের অধিকার, এতিম ও বৃদ্ধদের প্রেমময় নিরাপত্তা– তথা দুর্নীতির উচ্ছেদ, মানব-সেবা, বৈধ-অবৈধ পন্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, ভালো-মন্দের স্বরূপ, এসবই ইসলামের দেখানো— মহানবী [সা] আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে আরবদের কাছে সাহস, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি কী অর্থ বহন করতো। সমস্ত দুনিয়াবাসীর কাছে প্রতিটি সৎ গুণের অর্থ এভাবে কদর্য পন্থায় ব্যবহৃত হতো। আজ যেমন আমাদের দেশের মিডিয়া বা চলচ্চিত্রে যে অশ্লীলতা তা বাম ও রামদের কাছে শ্লীল যা গোপন ব্যবহারে সুন্দর রাম-বামরা তা প্রকাশ্যে ব্যবহার করে যা সাধারণভাবে লজ্জার বিষয় তা বাম ও রামদের কাছে লজ্জাই নয়। লগি-বৈঠা দিয়ে প্রকাশ্যে হত্যাযজ্ঞ তারা সমর্থন করে। তিল তিল করে গড়ে তোলা কোন সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কলমের কয়েকটি

www.bjilibrary.com

খোঁচায় তারা কলঙ্কিত করে দিচ্ছে। তারা অপরাধীর শাস্তির কথা বলেছে কিন্তু যে আইন ব্যবস্থা অপরাধী তৈরি করে সেই আইন ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলছে না। কারণ তারা জানে কোন আইন ব্যবস্থা অপরাধ ও অপরাধী নির্মূল করে। আর জানে বলেই তারা ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে ব্যান করার পাঁয়তারা করেছে। কারণ তারা চায় অপরাধী তৈরির কারখানাটি থাকুক, তবেই তাদের রাজত্ব স্থায়ী থাকবে। এসবই পনের শত বছরের পূর্বেকার পৌত্তলিক ও জাহিলি সমাজের চিন্তাধারা। তারাই 'ভাস্কর্য' নামের মূর্তি ব্যবস্থা জারি রেখেছে। ইন্দ্র যেমন রাজা অশ্বরীশকে তার মূর্তির বেদিতে ফুল ছড়াতে বলেছিল রাম ও বামরা সে ব্যবস্থা চালু রেখেছে। এসব কিছুই অজ্ঞতা থেকেই সৃষ্ট। এর ফলে হচ্ছে শিরকবাদিতা। মূর্তি পূজা থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার পূজা, ব্যক্তিপূজা, নফসের পূজা, ক্ষমতাধর ব্যক্তির পূজা [যা থেকে ঘুষ প্রথার সৃষ্টি] নিজস্ব স্বার্থের পূজা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আজকের বিশ্বসংস্কৃতির যত কল্যাণময় রূপ তা মহানবীর [সা] দেখানো পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রুসেডের যুদ্ধ এসে ইউরোপীয়রা ইসলামের অনেক কিছুই গ্রহণ করে নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই বলা হয় ইউরোপে ইসলাম আছে কিন্তু মুসলমান নেই অর্থাৎ তাদের আইন ব্যবস্থার বেশির ভাগই ইসলাম থেকে নেয়া।

বিশ্বসংস্কৃতির যে কল্যাণময় উজ্জ্বল দিকগুলো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মহানবীর [সা] সাহাবী [রা], পরবর্তীকালের তাবেঈ, তাবে-তাবেঈন ও আলেম-উলামা ও মুসলিম সৈনিকরাই তার বাহক।

মহানবীর [সা] উম্মত হিসেবে আল্লাহ ঘোষিত শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে আজ আমাদেরকে আমাদের সমস্ত তৌহিদী জ্ঞান নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে– শুধু পরকালে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার আশায়– 'আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদের দান করুন!■

লেখক পরিচিতি : সাবেক চলচ্চিত্র অভিনেতা

www.bjilibrary.com

কবির স্বপ্ন পূরণ

জুবায়ের হুসাইন

'স্বাগতম! সু-স্বাগতম হে তুফাইল! মক্কা নগরীতে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এসে সর্বোত্তম সম্ভাষণ জানালো তুফাইলকে।

ইয়ামনে বসবাসকারী একটি শক্তিশালী গোত্র দাওস। এই গোত্রের সরদার তুফাইল ইবনে আমর। ব্যবসা-বাণিজ্যই তাঁর পেশা। এ কারণেই মক্কায় আগমন। আর তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেই কুরাইশ নেতারা তাঁকে ওইরূপ সম্ভাষণ জানায়।

তুফাইল বললেন, 'ধন্যবাদ। আমি আগেই আপনাদের আতিথেয়তার খবর পেয়েছিলাম। আজ তা স্বচক্ষে অবলোকন করছি। শুকরিয়া আপনাদের!'

তুফাইলকে তারা তাদের সর্বাধিক সম্মানিত বাড়িতে থাকতে দিল। মক্কায় তখন দীনের নবীজী [সা] ও কুরাইশদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব চলছে। রাসূল [সা] আহ্বান জানাচ্ছেন মানুষকে মহান সত্তার দিকে। আল্লাহর দিকে। অন্যদিকে কাফিররা সব ধরনের উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

কুরাইশরা তাই চেষ্টা করল তুফাইলকে রাসূলের [সা] সাহচর্য থেকে দূরে রাখার। তাঁর কানে কুমন্ত্রণার বিষ ঢেলে দিতে লাগল। তাদের

www.bjilibrary.com

নেতৃবৃন্দ ও জ্ঞানী-গুণীরা তুফাইলের কাছে এসে বলল, 'তুফাইল, আপনি এসেছেন আমাদের এ আবাসভূমিতে। আমরা সেজন্য গর্বিত। কিন্তু এই লোকটি, যে নিজেকে নবী বলে মনে করে, আমাদের সকল ব্যাপারে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, আপনিও তার কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন এবং আপনার নেতৃত্বে আপনার গোত্রেও আমাদের মতো একই সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে!'

তুফাইল অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ। বললেন, 'আমি তো বাণিজ্যের উদ্দেশে এখানে এসেছি। মুহাম্মাদের [সা] ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'তারপরও আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।' বলল কুরাইশরা। 'আপনি এই লোকটির সাথে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করবেন না, এমন কি তার কোনো কথায় কান দেবেন না। কারণ তার কথা যাদুর মতো কাজ করে। সে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয় পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।'

'আচ্ছা, তাই হবে আপনারা যা বলছেন।'

তুফাইল সিদ্ধান্ত নিলেন, মুহাম্মাদের [সা] সাথে কথা বলা বা তাঁর কোনো কথা শোনা তো দূরের কথা, তাঁর কাছও ঘেঁষবেন না।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা যে অন্যরকম! তাই তো তুফাইল সিদ্ধান্ত নিলেও তা রক্ষা করতে পারলেন না।

রেওয়াজ অনুযায়ী কা'বার তাওয়াফ ও মূর্তি পূজার জন্য মসজিদের উদ্দেশে বের হলেন তুফাইল। অবশ্য দু'কানে তুলো ভরে নিয়েছেন ভালো করে যেন কোনোভাবেই মুহাম্মাদের কথা তার কানে না ঢোকে!

মসজিদুল হারামে ঢুকেই পুলকিত হয়ে উঠলেন তুফাইল। কা'বার পাশেই নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন সুদর্শন এক পুরুষ। সে এক ব্যতিক্রমী ইবাদতে মগ্ন লোকটি। অভিভূত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক পা দু'পা করে তাঁর কাছে গেলেন তুফাইল। কানে তুলো ভরা থাকলেও তাঁর কিছু উত্তম বাণী তিনি শুনতে পেলেন। তখন মনে মনে বললেন, 'তুফাইল, তুই একজন বুদ্ধিমান কবি, ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা তোর আছে। এ লোকটির কথা শুনতে তোর বাধা কিসে? ভালো লাগলে গ্রহণ করবি, ভালো না লাগলে প্রত্যাখ্যান করবি।'

নামাযরত লোকটি আর কেউ নন, তিনিই হচ্ছেন দয়ার নবী মুহাম্মাদ [সা]। রাসূলুল্লাহ [সা] নামায শেষে বাড়ির পথ ধরলেন। তুফাইলও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁকে অনুসরণ করলেন। এক সময় পৌঁছুলেন তাঁর বাড়িতে। তারপর দীনের নবীর কাছ থেকে কিছু বক্তব্য শোনার আশা ব্যক্ত করলেন। মুহাম্মাদ [সা] তাঁর বক্তব্য বললেন। পাঠ করে শোনালেন সূরা ইখলাস ও সূরা আল-ফালাক।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন তুফাইল। তাঁর সচেতন মন বুঝল এটা কোনো ব্যক্তির বানানো কথা নয়। এটা অবশ্যই আসমানী বার্তা। আর এই ব্যক্তি নবী না হয়েই যান না!

www.bjilibrary.com

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন তিনি। হ্যাঁ, সত্যকে গ্রহণ করতে বাধা নেই। এটাই পরম সফলতা।

সেই মুহূর্তে তুফাইল ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলেন।

বদলে গেলেন তুফাইল সম্পূর্ণ। মক্কার কুরাইশদের ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে তাদের নিন্দা, আল্লাহর একত্ব ও রাসূলুল্লাহর [সা] প্রশংসা করে রচনা করলেন সুন্দর কবিতা। সে কবিতার কাছে পরাজয় বরণ করল কুরাইশ কাফেররা।

এরপর তুফাইল তাঁর গোত্রে ফিরে এলেন। এখন তিনি কুরআনের কিছু অংশের হাফেযও বটে।

তুফাইলের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে তাঁর বৃদ্ধ পিতা ছুটে এলেন। পুত্রের মুখ দর্শনে উদগ্রীব পিতাকে তিনি বললেন, 'আব্বা, আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। এখন আপনার ও আমার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কেন এ কথা বলছ বেটা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন পিতা। আহত হলেন মনের মধ্যে ভীষণভাবে!

তুফাইল বুকটা একটু উঁচু করে জবাব দিলেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, মুহাম্মাদ [সা]-এর দীনের অনুসারী হয়েছি।'

পিতা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আমাকেও তবে মুসলিম বানাও। তোমার দীনই আমার দীন।'

'আমি যা শুনেছি ও জেনেছি, আপনাকেও তা বলব।' খুশি হয়ে বললেন তুফাইল।

'তবে আগে গোসল করে পবিত্র পোশাক পরে আসুন।'

পিতা পরম আনন্দে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এবার এগিয়ে এলেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী। তুফাইল বললেন, 'না, তুমি আমার কাছে আসবে না। ইসলাম তোমার ও আমার মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে।'

স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, হে প্রিয়তম স্বামী। এক্ষুণি আমাকেও সেই ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নাও।'

'ঠিক আছে, যুশ-শারা ঝরনার পানি দিয়ে গোসল করে পবিত্র হয়ে এসো।'

যুশ-শারা হচ্ছে দাওস গোত্রের দেবী-মূর্তি। তার পাশেই পাহাড় থেকে প্রবাহিত ঝরনাটিই যুশ-শারা ঝরনা।

স্ত্রী বললেন, 'ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে আপনি কি যুশ-শারাকে একটুও ভয় পাচ্ছেন না?'

'যুশ-শারা ও তুমি নিপাত যাও!' দীপ্ত কণ্ঠে বললেন তুফাইল। 'যাও, সেখানে গিয়ে মানুষের ভিড় থেকে একটু দূর হতে গোসল করে এসো। ওই বধির প্রস্তর-মূর্তি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আমিই সে যিম্মাদারী নিলাম।'

একটু পর পবিত্র হয়ে ফিরে এলেন তুফাইলের স্ত্রী। তুফাইল তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তিনি সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তুফাইলের অন্তরটা প্রশান্তিতে ভরে উঠল। 'আহ্! বাঁচা গেল। পিতা ও স্ত্রীর বিয়োগ-ব্যথা আর সইতে হলো না।'

www.bjilibrary.com

আরশের দিকে দু'হাত তুলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন তুফাইল।

কিন্তু তুফাইল এতেই পরিতৃপ্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। প্রকৃত মুসলমান বসে থাকতে পারেও না। শুরু করলেন তাঁর দাওয়াতী মিশন। দাওস গোত্রের সকল মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরলেন তুফাইল। খুব তাড়াতাড়ি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন আর এক সাহসী যুবক– আবু হুরাইরা। ব্যস! তুফাইলের বুকে সাহস আরোও দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

সময় বয়ে চলল। ইতিমধ্যে ওফাত হয়েছে দীনের নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর। ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা]। দিকে দিকে ইসলামের শত্রুরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। নিজেকে নবী বলে দাবি করে বসল এক পাপী– মুসায়লামা আল-কাজ্জাব। এই ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি বাহিনীর অগ্রসৈনিক হিসেবে পুত্র আমরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তুফাইল। দু'চোখে তাঁর আগুন জ্বলছে। মুসায়লামাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য অস্থির তাঁর হৃদয়।

তুফাইল [রা] যখন ইয়ামনের পথে, তখনই তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানতে পারলেন। তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর মাথা ন্যাড়া করা হয়েছে, একটি পাখি বের হয়ে গেল তাঁর মুখ থেকে, তাঁর স্ত্রী তাঁর পেটের মধ্যে তাঁকে ঢুকিয়ে নিল, পুত্র আমর তাঁকে টেনে বের করতে চাইছে; কিন্তু কোত্থেকে এক প্রাচীর এসে খাড়া হয়ে গেছে তাদের মধ্যে!

তুফাইল তাঁর সঙ্গীদের বললেন এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা। তারপর তার ব্যাখ্যা করলেন এভাবে– 'ন্যাড়া মাথার অর্থ ঘাড় থেকে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হবে। মুখ থেকে পাখি বের হওয়ার অর্থ আমার রূহটি বের হয়ে যাবে। স্ত্রীর পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার অর্থ মাটি খুঁড়ে কবর তৈরি করে আমাকে দাফন করা হবে। আমার প্রবল বাসনা, আমি যেন শহীদের মৃত্যু বরণ করতে পারি। আর আমার পুত্র আমর, সেও আমার মতো শাহাদাত চাইবে; কিন্তু একটু দেরিতে সে তা লাভ করবে।'

কী চমৎকার স্বপ্ন! আর কী চমৎকার তার ব্যাখ্যা! সাথীরা অভিভূত হয়ে গেলেন। দু'চোখে অশ্রু টলমল করে উঠল সবার, তুফাইলের মতো স্বপ্ন যদি তারাও দেখত! আহ্! একেই বলে ভাগ্য।

তুফাইলের স্বপ্ন সত্য হলো। হিজরি ১১ সনে ইয়ামামার যুদ্ধে এই মহান বীর, খ্যাতিমান কবি বীরত্বের সাথে লড়াই করে যুদ্ধের ময়দানেই শাহাদাত বরণ করেন। আর হিজরি ১৫ সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হন প্রাণপ্রিয় পুত্র আমর।

তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সহজাত কাব্য প্রতিভা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী ছিলেন হযরত তুফাইল [রা]। ভাষার মধুরতা, তিক্ততা ও ভাষার ইন্দ্রজাল সম্পর্কে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ। শাহাদাত ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। তাই তো আল্লাহপাক স্বপ্নের মাধ্যমে আগেই তাঁর শাহাদাতের খবর জানিয়ে দেন তাঁকে।

কবির সেই স্বপ্ন অবশেষে পূরণ হলো।■

www.bjilibrary.com

"ওঠে এ কী ঘন-রোল– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"

শফি চাকলাদার

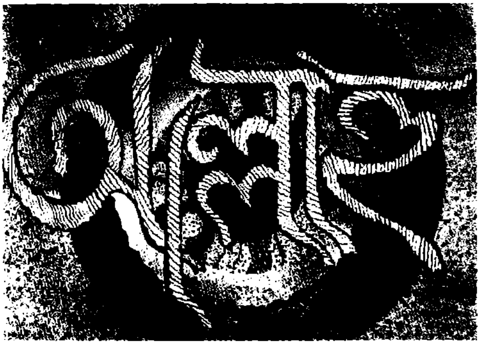

হিজরী সনের ১২ রবিউল আউয়াল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্মদিন। প্রতিবারের মতো এবারেও এসেছে মহান সেই পবিত্র দিনটি। একই দিনে ৬৩ বছর পর ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই একই দিনে প্রিয় নবী [সা]-এর জন্ম এবং ওফাত দিবস সারা বিশ্বে আন্তরিকতার সাথে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। ইংরেজী ৫৭০ সালে এই মহামানবের জন্ম হিসেবে এবারে তাঁর ১৪৩৭তম জন্মদিন এবং ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ওফাত হিসেবে এ দিনে তাঁর ১৩৭৪তম ওফাত দিবস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় নবী [সা]-এর মূল্যায়ন যেভাবে হয়েছে তাতে এইটুকু বলা যায় যে, এর চেয়ে উৎকৃষ্টভাবে মানুষের মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত এর আগেও হয়নি, পরেও হয়নি, পরবর্তীতে হবে কিনা সন্দেহ। এমন কোন দিক নেই মানুষের কল্যাণের জন্য যা তিনি করে যাননি, দেখিয়ে যাননি, নির্দেশ দিয়ে যাননি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। আজ পর্যন্ত অসংখ্য জ্ঞানীগুণীজন এসেছেন যাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোচ্চ অবস্থান নিয়ে। নবী করীম [সা]-এর এমন একজন প্রিয় উম্মত বাংলা সাহিত্যের কাব্য জগতের

www.bjilibrary.com

অন্যতম দিকপাল কবি ফররুখ আহমদ। তিনি "সিরাজাম মুনীরা"-তে তাঁর প্রিয় মানুষটির প্রশংসা কিভাবে করেছেন তার সামান্য উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরলাম :

মানব মুক্তি পণ নিয়ে তুমি ওঠো দুর্গম শিলা শিখরে,
প্রতি পাথরের প্রাকার পারাতে আহত তোমার রুধির ঝরে,
হে নবী! সেখানে পাথরের মতো অটল তোমার পদক্ষেপ,
শিলা পার হয়ে পীড়িতের বুকে ঝর্ণাধারার দাও প্রলেপ
যেদিন শোনালে সাকার শিখরে সত্য হে নবী মুহাম্মদ
সেদিন তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো হাজার শোণিত নদ।

"আল্লা ব্যতীত নাই উপাস্য, মুহাম্মদ যে তাঁর রাসূল।"
জানালে যেদিন, তিমিরাবর্তে বজ্র যেদিন ভাঙালো ভুল।

আমরা আরবের ইতিহাস পড়ে জেনেছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বের ঘটনাবলী। কী ভীষণ অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার সারা আরব জাহানকে ঘিরে রেখেছিল! দয়াহীন, মায়াহীন, মানবতাহীন একটি সমাজ– যেখানে প্রতিটা মুহূর্ত কাটত অরাজকতার বিষাক্ত নিঃশ্বাস প্রতি নিশ্বাসে। হিংসা-জিঘাংসায় ভরে থাকত মানুষে মানুষে। এলেন নবী করিম [সা]। কবি ফররুখ আঁকলেন তারই একটি চিত্র। ফররুখের লাইন ক'টি থেকেই আমরা 'নবী [সা] এলেন' এর পরবর্তী রূপটি উপলব্ধি করতে পারি :

কোথায় গেল সে দুর্নীতি আর ক্লেদ ব্যভিচার ভরা পুরীষ।
কোথায় গেল সে মানবতাহীন যাত্রীদলের বুকের বিষ।
জিঞ্জীর ভার খসে পড়ে গেছে লুটায় বেহেশ্‌ত পায়ের তলে
জীবন্ত শিশু কোলে নিয়ে নারী ভাসে আনন্দ অশ্রুজলে;
আসে দলে দলে নবীন নকীব, উজ্জীবিত সে মানবদল,
ভরে তকদির পুণ্য ধ্বনিতে শূন্য নীলিমা জলস্থল,
ধর্মবিহীন তার্কিকও আজ সাক্ষ্য দেয় সে লা'-শরীক,
'আল্লার নাই অংশী মুহাম্মদ তাঁর দাস জেনেছি ঠিক'
বুঝেছে সত্য মরুর দুলাল সঙ্গী সুফ্‌ফা মহামানব,
আবহায়াতের ধারায় জেগেছে শতাব্দীরও প্রাচীন শব।
জ্বলে ভঙ্গুর মৃত শামাদানে চিরন্তনের অভিজ্ঞান
আকাশে আকাশে তারি আহ্বান, পাতায় শিয়রে তারি আজান।

এতক্ষণ কবি ফররুখের তুলিতে নবী করিম [সা]-এর আগমনের পরবর্তীতে একটি সুন্দর চিত্র থেকে জানা গেল কতটা পরিবর্তন এসেছিল। কী অসাধারণের কাজ তিনি করে গেছেন। সামান্য ক'টা বছরেই তিনি শুধু আরব জাহানকেই পরিবর্তনের সূচিতে নিয়ে আসেননি! সারা বিশ্ব-জাহান আজো সে পরিবর্তনের স্বাদ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

www.bjilibrary.com

নজরুলের একটি অতি বিখ্যাত গানে আমরা এই পরিবর্তনের সুন্দর এক মহিমান্বিত রূপ দেখতে পাই। কবি নবী করিম [সা]-কে নিয়ে উপলব্ধি করলেন এমন প্রকাশে–

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে জন
'এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই' কহিল যে জন
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ ধরিল যে জন
বাদশা-ফকিরে এক শামিল করিল যে জন।

আজ মানবতা ভূ-লন্ঠিত। কেন? কেন মানবতার এমন বলিষ্ঠতর রূপটি আজ পরাজিত হতে বসেছে। কেন? কারণ 'মানবতা' শব্দটি বাস্তবে হারাতে বসেছে। শোভা পাচ্ছে ঠোঁটের বলিহারি শব্দ-আওয়াজে। বক্তৃতা-বিবৃতিতে। টেবিলের চারিপাশের টেবিল-কনফারেন্স-এর দামী দামী পোশাকে আবৃত মানুষগুলোর 'এ্যারিস্ট্রোকেটিক' বলন ভঙ্গিতে আটকা পড়ে আছে মানবতা। নজরুল বিদ্রূপ করে বলতেন 'আড়ষ্টকাক'। হযরত ওমর [রা] রাতের অন্ধকারে চলতেন ছদ্মবেশে– কে কোথায় কিভাবে রাত কাটাচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখার জন্য। আর বর্তমানে আমরা দেখতে পাই কি করে 'মানবতা'র অবমাননা চতুষ্পাশে হয়ে চলেছে। নবী করিম [সা] 'শুকনো রুটিরে সম্বল করে যে ঈমান আর যে ত্যাগের বলে' মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন অথচ আমরা তাঁরই উম্মত হয়ে "সুগন্ধী খাবার' খেয়ে খেয়ে সে মানবতাকে তুচ্ছ স্বার্থপরতার পোশাকে আবৃত করে ফেলেছি। বাংলা সাহিত্যের অপর শ্রেষ্ঠতম কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী তাঁর বিখ্যাত অমর কাব্য 'অনল-প্রবাহ'র 'মরক্কো সঙ্কটে' তাঁর প্রিয় নবী [সা]-কে তাই মনে করেন পুনর্বার এসে জাগিয়ে যেতে এই মানবতাহীন অচেতন সমাজটাকে। তিনি আহ্বান করেন এভাবে–

কোথা আর্য্য মোহাম্মদ! শত সূর্য তেজে দীপ্ত,
মর্ত্যে আসি হের আজি কি বিপদ ঘনীভূত।
সর্ব্ববিঘ্ন-বিমর্দ্দিনী-সঞ্জীবনী-শক্তি দানে;
জাগাও জাগাও তাত! নিদ্রিত মোসলেমগণে।
স্বরগ হইতে আজি কর দেব! এ ঘোষণা,
নামায রোযায় শুধু মুক্তি আর হইবে না।
গাজী ভিন্ন কোন জন এ যুগে পাবে না ত্রাণ;
প্রাণ-দানে অশক্ত যে,– সেত নহে মুসলমান।
শত্রুন্তপ মহাযোদ্ধা ব্রজ-দৃঢ় তেজঃ-দীপ্ত,
যে হইবে, সেই বটে ঈশ্বরের মহাভক্ত।

এমন এই মহান মহামানবটি যদি এ ধরায় না আসতেন তবে বিশ্বে আজ যে 'অগ্রসর' আমরা দেখতে পাই তার ছোঁয়াটি পর্যন্ত হত না। চতুর্দিকে আলোকিত মহিমা। আকাশে বাতাসে। প্রতিটি মুহূর্তের অগ্রসর-এর কেন্দ্র-বিন্দু আমাদের প্রিয় নবী [সা]। বিশ্ব-

www.bjilibrary.com

ভ্রাতৃত্ববোধ এনেছেন তিনি। নারীরে প্রথম তিনিই মুক্তি দিয়েছেন, দিয়েছেন নর-সম অধিকার। আজও এই আলোচিত যুগেও যে সম্মান কোন জাতিই দিতে পারেনি নারীদের ক্ষেত্রে। মানুষে মানুষের অধিকার তিনিই রক্ষিত করে গেছেন। বিশ্বটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার শক্তি তিনিই মানুষকে শিখিয়েছেন। সমাজ ব্যবস্থায় সমান অধিকার তিনিই প্রচলন করেছেন। সকল মানুষকে ভালোবাসতে তিনিই শিখিয়েছেন। তিনিই মানুষকে নির্লজ্জতা পরিহার করার প্রতিটি ক্ষেত্র সৃষ্টি ও প্রচলন করে গেছেন। অপরকে সঠিক হবার পথ দেখাবার পূর্বে নিজেকে সঠিক হওয়ারও পথ তিনিই করেছেন। কোন্ কাজটা তিনি না করেছেন এ জগতের সুশৃঙ্খল-অগ্রগতির লক্ষ্যে? এমন মানুষটির জন্য আমাদের বাংলা সাহিত্যের অপর শ্রেষ্ঠ কবি গোলাম মোস্তফা'র ইসলাম কবিতাটিকে এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছে হলো–

খোদার নূর মোহাম্মদ মহান সেই রাসূল
বেদ্বীন্ ভাই সবাই কর তারই দ্বীন কবুল।
এ দ্বীন ভাই খোদার খোদ্ হাতের দান দেওয়া
এ দ্বীন ভাই ধরার পর বেহেশতের মেওয়া।
এ দ্বীন ভাই নিশার শেষ ঊষার প্রাণ পুলক
আলোক যার হাসায় দূর দ্যুলোক আর ভূলোক।
হৃদয় মন সরস হয় মধুর তার পরশ
ঘুচায় তাপ ঘুচায় পাপ জাগায় সুখ হরষ
কেহই তার হেলার নয়, সবাই তার আপন
ছোটোর দুখ হিয়ায় তার জাগায় ঘোর কাঁপন।
পতিত আর দুখীর সব ব্যথার দাগ মুছায়
পরশে-মন হাসায় তার, বাঁধন সব ঘুচায়।
কোথায় কোন্ ব্যথিত আর পতিত জন কাঁদিস!
হরষ-হীন হৃদয়-মন দুখের ভার বাঁধিস!
হেথায় আয়, ঘুচুক তোর সকল দুখ পাওয়া,
সুধার এই ধারায় তোর নীরস দীল নাওয়া।

শেষ করব এই বলে যে, এমন মহান মানুষটির আগমন হওয়ার ফলেই আজ মানব জাতি আলোকের পথে এগিয়ে চলেছে। অন্ধকারকে দূরে সরাতে পারছে। নিকষ কালো রাত্রির ঘোর কাটিয়ে এক সুশৃঙ্খল আলোক রশ্মির পথে এগিয়ে চলেছে। শুধু মুসলমান জাতির জন্য নয়, মানব জাতির কল্যাণে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি শিক্ষা বয়ে এনেছে সুফল। 'সাম্প্রদায়িক' শব্দে'র অস্তিত্ব নেই তাঁর শিক্ষায়, অথচ এ দেশেই এক

www.bjilibrary.com

ধরনের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর উদয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যারা কথায় কথায় 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটির ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার করে থাকে। লক্ষ্য করা গেল ফাল্গুনকে গ্রহণ করা হচ্ছে 'রং ছিটিয়ে'– ঘোষণায় বলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এখানে নেই। কিন্তু রং ছিটানোতে যে ধরনের আনন্দ প্রকাশ করা হয় প্রকাশ্যে তা কি সত্যি প্রগতি? এই প্রগতি কি গ্রহণযোগ্য বাঙ্গালীর আড়ালে? সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথকে এরা টেনে আনবেই? সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডগুলো কোন পর্যন্ত প্রকাশ্যে করা যাবে কিংবা 'ইসলাম' কতটুকু অনুমতি দেয় সে শিক্ষাটাও থাকা দরকার। তাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত দিবসে এসব মনে রেখে এগিয়ে চলতে হবে। নবী করিম [সা]-এর তিরোভাবে নজরুলের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' থেকে ক'টি লাইন উদ্ধৃত করে শেষ করছি এ লেখাটি–

বেহেশ্‌ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধুম-ধাম,
গাহে হুর পরী যত, "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"।
কাতারে কাতারে করজোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়,–
ধরিতে না পেরে ধরা-মা'র চোখে দর দর ধারা বয়।
এসেছে আমিনা আবদুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী?
আজ জননীর মুখে হারামণি– পাওয়া- হাসা হাসে জগপতি!
"খোদা, একি তব অবিচার!"
বলে কাঁদে সুত ধরা-মা'র।
আজ অমরার আলো আরো ঝলমল, সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এলো অমা-রাশি! ■

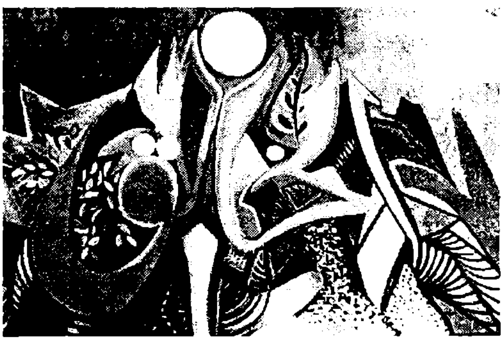

www.bjilibrary.com

আরবি গীতি-কবিতার বিকাশধারা : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ

আরবি কাব্য-সাহিত্যে গীতি-কবিতা আরব কবিদের অমর কাব্য-কীর্তি। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের এবং প্রদীপ্ত নিদর্শন হিসেবেও কাব্য-সাহিত্যে গীতি-কবিতা এক বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। প্রিয়জনের প্রশংসা কিংবা শত্রুর নিন্দায় বিরচিত এসব গীতি-কবিতার জন্য ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব কবিগণ পথিকৃতের মর্যাদায় অভিষিক্ত। স্ব-গোত্রের প্রশংসা ও শত্রুদের নিন্দা করা গীতি-কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু হলেও আরবি গীতি-কাব্যে সৌন্দর্য, প্রেম, সময়ের উত্থান-পতন, বসন্ত ও উদ্যান, নৈতিকতা ও জ্ঞান ও দোয়া-প্রার্থনা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। গীতি-কাব্য রচনার মাধ্যমে ব্যক্তি কিংবা গোত্র বিশেষের গুণ-কীর্তন করে বিশেষ পুরস্কার ও বিরল সম্মান লাভের ঘটনাও কম নয়। ইসলামের আবির্ভাবের মাত্র এক শত কি এক শত পঁচিশ বছর পূর্বে রচিত গীতি-কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। ভাষা, ভাব ও আলঙ্কারিক সৌকর্যের দিক থেকে এসব কবিতা শ্রুতিমধুর, সুষমাময়, সাবলীল ও সুসম্পন্ন। সুদীর্ঘকালের চর্চা ও উৎকর্ষের ফলে গীতি-কবিতার এ পরিপূর্ণতা এসেছে। আরবি সাহিত্যের কাব্যচর্চার এ ধারাটি অতীব

www.bjilibrary.com

প্রাচীন হলেও আধুনিকতম কাব্যিক বিচার-বিশ্লেষণে কাব্য সাহিত্যের এ ধারাটি অধুনাকালেও এক বিশেষরূপে বিদ্যমান। ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর উৎসরূপে এর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণিকতা রয়েছে সমভাবে। আরবি গীতি-কবিতার বিচিত্র প্রসঙ্গ, সাহিত্য-সৌন্দর্য ও বিকাশধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন আরবি কবিতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কাসিদা বা গীতি-কবিতা [দীর্ঘ কবিতা] ও কিত'আ বা খ কবিতা। গীতি কবিতায় শ্লোক সংখ্যার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সীমা নেই। ইবন মানযুর [মৃ. ৭১১ হি.] আবুল হাসান আলআখফাস-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তাঁর মতে তিনটি শ্লোক হলেও গীতি-কবিতা হতে পারে। কিন্তু ইবন জিন্নী মনে করেন যে, তিন থেকে দশ বা পনের পর্যন্ত সংখ্যার শ্লোকসমষ্টিকে কিত'আ বলা হয়, আর পনেরের অধিক হলে গীতি-কবিতা বলা হয়। তাহানাবী মাজমাউল ফুসাহার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, আরব পণ্ডিতগণের মতে গীতি-কবিতার শ্লোক সংখ্যা পাঁচ শতেরও অধিক হতে পারে। শ্রেষ্ঠ আরব কবিদের কাসিদায় শ্লোক সংখ্যা ষাট থেকে এক শতের কাছাকাছি হয়। তবে গীতি-কবিতায় সাধারণত পঁচিশ শ্লোক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন আরব কবিদের গীতি-কবিতায় বিষয়বস্তুর ভিন্নতা রয়েছে। কোন কবির কবিতায় কোন বিষয়ের কিংবা দৃশ্যাবলীর চিত্রণ সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রেমিকার বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা অথবা নিজের বাহন, ভ্রমণ ও শিকার কিংবা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্রণ। এক্ষেত্রে ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিদের মধ্যে ইমরাউল কায়েস [মৃ. ৫৪০ খ্রি.]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরবি গীতি-কবিতায় উল্লেখ্যযোগ্য অংশ এই বর্ণনামূলক কবিতা অথবা দৃশ্যাবলীর বর্ণনা জুড়ে আছে। এ ছাড়াও গৌরব, বীরত্ব, প্রশংসা, শোকগাথা, প্রেম-বিরহ, শিল্প-সাহিত্য, চিন্তা-দর্শন ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রাচীন গীতি-কবিতার উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু।

আরব কবিগণ মূলত গীতি-কবিতার কাঠামো ও বিন্যাস-পদ্ধতিতে একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করতেন। তারা একটি প্রণয় চিত্রের সাহায্যে গীতি-কবিতার সূচনা করতেন। আর জ্ঞানীসুলভ কোন সারগর্ভপূর্ণ বক্তব্য বা পরামর্শ দ্বারা কবিতার পরিসমাপ্তি টানতেন। কেননা তারা মনে করতেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনে কোন না কোনভাবে প্রেম আসে। প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরেই প্রেম, ভালোবাসা এবং আবেগ ও টানাপোড়েন বিদ্যমান থাকে। তাদের অতীত প্রেম কাহিনীর বর্ণনায় সাধারণত প্রেমিকার পুরাতন স্মৃতি ও তার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাস্তুভিটার উপাদান তথা পানির কূপ, তাঁবু, বাসস্থান প্রভৃতির আলোচনা স্থান পেত। কবিগণ প্রিয়জন ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার কাল্পনিক অভিযাত্রার পথের ক্লান্তি, দু:খ-কষ্ট, নিদ্রাহীনতা ও অস্থিরতা, রাত্রির অন্ধকার ও ভয়াবহতা, দিনের রৌদ্র ও তাপের প্রচণ্ডতা কিংবা প্রিয়জন দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ধাবমান বাহনটির ক্লেশ ও ক্লান্তির চিত্র তুলে ধরতেন। এছাড়াও কবিগণ গীতি-কবিতায় প্রিয়জনের প্রশংসা তার গুণাবলী মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনা দিতেন। প্রশংসার পাত্র কখনও কোন ব্যক্তি [রাজা-বাদশা], কখনও কোন গোত্র বা সম্প্রদায় হতো। কখনো বা যুদ্ধ তৎপরতার প্রশংসা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত,

www.bjilibrary.com

লুটতরাজ, কৈফিয়ত ও সতর্কীমূলক বক্তব্যের বিবরণ উপস্থাপিত হতো। প্রাচীন আরব কবিদের কবিতায় আরো একটি অভিন্ন স্টাইল চোখে পড়ে, তা হচ্ছে– সকল গীতি-কবিতার ধ্বনি একই রকমের, একই রকমের পদ্ধতি ও বর্ণনাভঙ্গি এবং একই রকম শব্দ ও গঠন প্রণালী। একজন কবি যে ধরনের শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতেন, পরবর্তীকালের কবিদের কবিতায় তা যেন একটি প্রচলনরূপে ব্যবহৃত হতে থাকত। এ কারণে তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিগণ এ গতানুগতিক প্রচলিত ধারার সমালোচনা করতেন। অবশ্য অনেক কবি এই গতানুগতিকতার ধারা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইসলাম-পূর্ব যুগের একজন দিওয়ান রচয়িতা কবি উরওয়া ইবনুল ওয়ারদ-এর দিওয়ানে একটি গীতি-কবিতায় কেবল একটি কথারই উল্লেখ আছে যে, তার স্ত্রী তাকে অভাব ও দারিদ্র্যের জন্য তিরস্কার করে থাকে। স্বয়ং মুআল্লাকা কবিদের মধ্যে আমর ইবন কুলসুম [মৃ. ৬০০ খ্রি.]-এর কবিতাটি বিজন বাড়ি-ঘর ও প্রেমিকের পতিত ও বিধ্বস্ত স্মৃতি চিহ্নের নিকট কান্নাকাটির পরিবর্তে সুরাপাত্রের উল্লেখ দ্বারা সূচনা হয়েছে যদিও মুআল্লাকাতের অধিকাংশ গীতি-কবিতা প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিতে রচিত। ইসলামের আবির্ভাব ও পবিত্র কুরআন নাযিলের পর আরবি গীতি-কবিতায় কিছু নতুন বিষয়বস্তুর সংযোজন ছাড়া আঙ্গিক কিংবা বিন্যাসে বড় কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিদের প্রণয়মূলক কবিতায় যেমন নগ্ন অশ্লীলতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দৃশ্যাবলীর চিত্রণ লক্ষ্য করা যায় সেক্ষেত্রে ইসলামের প্রারম্ভকালীন কবিগণ তাদের কাব্যে অশ্লীলতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ব্যবহার পরিহার করে গাযাল ও প্রণয় কাব্যেও শালীনতার ব্যবহার অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা ও ইসলামি চিন্তা-বিশ্বাসের সম্প্রসারণের ন্যায় নব নব বিষয়বস্তুর অবতারণাও করেছেন।

ইসলাম-পূর্ব যুগে যেখানে গীতি-কবিতায় ওয়াযন ও ছন্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সেখানে ইসলামি যুগে কবিগণ পূর্বের এসব পদ্ধতি বহাল রেখে 'রাজায' ছন্দের নবধারায় কাব্য রচনা করেন। অবশ্য ইসলাম-পূর্ব যুগে 'রাজায' ছন্দে কবিতা রচনাকে নিম্নমানের কবিতা মনে করা হতো।

আরবি গীতি-কবিতার বিকাশধারার ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত খুব কমই পাওয়া যায়। তাই আরবি সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে কোনরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এ সম্পর্কে অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। তবে আরব ঐতিহাসিকগণ অবশ্য দু'টি বিষয়ে একমত যে, আরবি কবিতা যেভাবে 'সাজা' ও 'কাফিয়া' এবং পরে 'রাজায' হতে কবিতার স্তরে পৌঁছেছে, আরবি গীতি-কবিতাও একইভাবে সংক্ষিপ্ত খণ্ড কবিতা হতে বিকাশ লাভ করেছে। অথবা আরবি সাহিত্যের সংরক্ষিত ইতিহাস অনুযায়ী 'তাবীল' ছন্দে সর্বপ্রথম গীতি-কবিতা রচনা করেছিলেন মুহালহিল ইবন রাবিআ তাগলিবী [মৃ. ৫৩১ খ্রি. আনুমানিক]। তিনি তার ভাই কুলায়ব ইবন রাবিআর মৃত্যুতে ত্রিশ শ্লোকবিশিষ্ট একটি শোকগাথা রচনা করেছিলেন। তবে একথাও সত্য যে, আরবি গীতি-কবিতা মুহালহিলের হাতে একবারে জন্মলাভ করেনি। বিভিন্ন প্রকার বাহর, ওয়াযন ও কাফিয়া ছাড়াও মার্জিত পদ্ধতি,

www.bjilibrary.com

বহুমুখী বিষয়বস্তু এবং চমৎকার উপমা ও রূপকসমূহ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, আরবি গীতি-কবিতা মুহালহিল বিন রাবিআ ও তৎপরবর্তী কবি ইমরাউল কায়েস [মৃ. ৫৪০ খ্রি.], আলকামা [মৃ. ৫৬১ খ্রি.], উবায়েদ ইবনুল আবরাস [মৃ. ৫৫৪ খ্রি.] প্রমুখের বহু পূর্বে পরিচ্ছন্নতা ও দৃঢ়তার স্তর অতিক্রম করেছিল।

ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিদের মধ্যে মুহালহিল [মৃ. ৫৩১ খ্রি.] সর্বপ্রথম গীতি-কাব্য রচয়িতা। এ যুগের গীতি-কবিতায় প্রণয়-উপাখ্যান, স্বপক্ষের গৌরব, বীরত্ব, প্রতিপক্ষের নিন্দা-বিদ্রূপ ও সহজাত আবেগ-অনুভূতির বর্ণনা পাওয়া যায়। কবিগণ গীতি-কবিতার মুখবন্ধে সৌন্দর্য ও প্রেম, বসন্ত ও উদ্যান প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র তুলে ধরতেন। উট, ঘোড়া কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা কবিতার প্রধান অংশ জুড়ে থাকত। প্রাচীন আরব কবিদের কবিতায়, শ্লোকে ধারাবাহিকতা অনুক্রম কিংবা পারস্পরিক সাদৃশ্যের প্রতি তেমন কোন মনোযোগ দেয়া হতো না। প্রতিটি শ্লোক এক একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এককরূপে রচিত হতো। ফলে গীতি-কবিতার শ্লোকগুলোকে আগে-পরে স্থাপন করলে কিংবা কোন সংযোজন বিয়োজন করলে তাতে বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটত না। এজন্য সমালোচকগণ ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব কবিদের গোটা গীতি-কবিতাকে একক মনে করে সমালোচনা করেননি, বরং এক একটি শ্লোককে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একক বিবেচনা করে সমালোচনা করতেন। নাবিগা যুবিয়ানীর [মৃ. ৬০৪ খ্রি.] একটি গীতি-কবিতা সম্পর্কে সমালোচকগণ নানা অভিযোগ তুলে সমালোচনা করেছেন।

ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব কবিদের গীতি-কবিতায় প্রণয় উপাখ্যান সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। কবি ইমরাউল কায়েস [মৃ. ৫৪০ খ্রি.] বলেছেন :

নওজওয়ানীর প্রেমের মোহ হতে মুছলো সবে
হায়রে আমার হৃদয় হতে তোমার সে প্রেম মুছবে কবে?

তিনি আরো বলেন :

জীবনের বহুদিন অজস্র নারীর মায়া জুড়ে
নিজেকে বেঁধেছি আমি। কিন্তু সেই 'জুলজুল' দিন...

কবি যুহাইর বিন আবি সুলমা [মৃ. ৬০৯ খ্রি.] বলেন :

সেই শোভাতে আকুল পরান রূপ-জহুরীর লাগায় নেশা
সে রূপ সুধায় চাতক নয়ন আড় নয়নে মিটায় তৃষা।

গীতি-কবিতা চর্চার ধারাবাহিকতায় উমাইয়া যুগে [৬৬১–৭৫০ খ্রি.] আরব কবিগণ কাব্য চর্চা অব্যাহত রাখেন। ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকে উমাইয়া শাসনামলের শেষভাগ পর্যন্ত আরবি গীতি-কবিতার ছন্দ ও অন্ত্যমিল বিষয়ে কোন রীতিগত পরিবর্তন হয়নি। প্রাচীন আরবদের ব্যবহৃত যেসব ছন্দ স্বভাবতই উন্নতির চরম শিখর অতিক্রম করে প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল, পরবর্তী আরব কবিগণ সেসব ছন্দেই গীতি-কবিতা রচনা করতে থাকেন। উমাইয়া যুগের গীতি-কাব্যে ইসলাম-পূর্ব ও প্রারম্ভিক ইসলামি যুগের কবিদের ভাবধারা অবশিষ্ট থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনও সাধিত হয়েছিল। যেমন

www.bjilibrary.com

ঐ যুগের নাকায়িদ সাহিত্যের কথা বলা যেতে পারে। সাহিত্যের এই ধারার মাধ্যমে একজন কবি প্রতিপক্ষ কবির গীতি-কবিতার জওয়াব দিয়ে যুক্তি খণ্ডনের প্রয়াস পেতেন। এতে আরবি গীতি-কবিতার এক বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত হয়। নাকায়িদ সাহিত্যে কবি জারীর [মৃ. ১১০/১১১ হি.], ফারাযদাক [মৃ. ৭২৮ খ্রি.] ও আখতালের [মৃ. ৭১৩ খ্রি.] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা তারা আরবি সাহিত্যের নাকায়িদ সাহিত্যকে বহু গুণে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন গোত্র, রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় সম্প্রদায় নতুন নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সাথে গীতি-কবিতায় এক নতুন ধারার চালিকাশক্তি সঞ্চারিত করেছেন। ইতোপূর্বে গাযাল [প্রণয় প্রসঙ্গ] কেবল গীতি-কবিতার ভূমিকায় স্থান পেতে এবং একই সাথে কবির কাব্য-প্রেরণা জাগ্রত করতে এবং শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করত। কিন্তু উমাইয়া যুগে এই গাযাল গীতি-কবিতার ধারাটি একটি বিশেষ ধারা হিসেবে স্বতন্ত্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। এই ধারার মাধ্যমে একদিকে উমার বিন রবিআর মতো স্বাধীনচেতা কবির সৃষ্টি হয়। যিনি নিজের ইন্দ্রিয়ানুভূতি চরিতার্থ করার জন্য গাযালকে ভাব প্রকাশের মাধ্যম বানিয়েছিলেন। অন্যদিকে জামিল, বুছায়না, কুসায়্যিব ও আযযার ন্যায় কবিরও আবির্ভাব হয়েছিল, যারা পবিত্রতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার প্রেরণায় গাযাল রচনা করেছিলেন।

আব্বাসীয় যুগে আরবি গীতি-কাব্য

আরবি কাব্য-সাহিত্যের বিকাশধারায় আব্বাসীয় যুগের [৭৫০-১২৫৮ খ্রি.] অবদান অবিস্মরণীয়। এ যুগে আরবি সাহিত্যের ভাষা, বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর এক নব চেতনার সূচনা হয়, বিশেষত আরবি গীতি-কবিতায় যুক্ত হয় এক নতুন ধারা। এ সময়ে আরবি গীতি-কবিতায় শব্দ প্রয়োগ-পদ্ধতি, ভাব ও বিষয়বস্তুসহ ছান্দিক পরিবর্তন আসে। কবিগণ প্রাচীন আরব কবিদের দুর্বোধ্য ও অপরিচিত শব্দের ব্যবহার বর্জন করে তদস্থলে আরবি ভাষাবহির্ভূত শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার শুরু করেন। এছাড়াও তাদের শব্দ ব্যবহার পদ্ধতিতে সাবলীলতা ও সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে থাকে। সুন্দর সুন্দর উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও রূপক ব্যবহারের সাথে সাথে কল্পনা-মাধুর্যও ব্যাপকতা লাভ করে। গীতি-কবিতার বিষয়বস্তুতে শাসকশ্রেণীর স্তুতি ও প্রশংসার আতিশয্য, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পক্ষপাত, গৌরব প্রকাশ, মদের বর্ণনা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা এবং জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি বর্জনের চিন্তা-ভাবনা ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ছন্দের ক্ষেত্রেও প্রাচীন আরব কবিগণের ব্যবহৃত ছন্দের ধারা প্রবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে কবি আবু নুওয়াস [মৃ.৮১৩ খ্রি.] ও আবুল আতাহিয়ার নাম স্মরণীয়। কেননা তারা তাদের গীতি-কবিতায় ছন্দের এমন স্টাইল ব্যবহার করেছেন, যা পূর্বে প্রচলিত কিংবা পরিচিত ছিল না। কবি আবু নুওয়াসকে আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মনে করা হয়। তিনি পাহাড়-পর্বতের বর্ণনা দ্বারা গীতি-কবিতা শুরু না করে মদ ও সম্ভোগ-প্রীতি দ্বারা কবিতা শুরু করে গীতি-কবিতায় নতুন রীতি প্রবর্তন করেন। এছাড়া শিকারের দৃশ্য বর্ণনায় তার রাজায ছন্দে রচিত গীতি-কবিতাসমূহ বেশ প্রসিদ্ধ। এভাবে ইবন কুতাইবার [মৃ. ৮৮৯] কবিতায় পাহাড়-পর্বতের ধ্বংসাবশেষ ও পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ির উল্লেখসহ যাযাবর জীবন-

www.bjilibrary.com

পদ্ধতির স্থলে নাগরিক জীবন-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে দেখা যায়। আবুল আতাহিয়ার গীতি-কবিতায় ধার্মিকতা ও সুফীবাদ, দুনিয়ার নিন্দা ও সংসার ত্যাগ এবং উপদেশ প্রদানের ধারা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে আবুল আলা আল মাআররী [মৃ. ১০৫৭ খ্রি.] তার গীতি-কবিতায় এসব বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ সাধন করেন। স্পেনের কবিগণ আরবি গীতি-কবিতার বিষয়বস্তুতে পূর্বাঞ্চলীয় আরব দেশের কবিদের অনুসরণ করলেও তাদের কবিতায় এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুদৃশ্য লীলাভূমিসমৃদ্ধ স্পেনের কবিগণ তাদের বর্ণনামূলক কাব্যে তুষারাবৃত পর্বতরাজি, বন-জঙ্গল ও উদ্যানরাজি এবং সুন্দর সুন্দর উপত্যকা, সামুদ্রিক তরী ও অনুপম জনপদের চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। মুসলমানদের বহিষ্কারের পর স্পেনীয় কবিগণ পরিত্যক্ত শহর ও অঞ্চলসমূহের স্মরণে মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেন, তা আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এ ক্ষেত্রে সালেহ আর রানদীর 'নূন' অন্ত্যমিলযুক্ত অনবদ্য গীতি-কবিতাটির বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। এছাড়াও স্পেনীয় কবিদের কবিতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক কাব্য-সাহিত্যে বিন্যস্ত করতে দেখা যায়।

পূর্ববর্তী যুগসমূহে গীতি-কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের যে স্থবিরতা ছিল, তা আধুনিক আরবি কবিতার নব জাগরণের কবিগণ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ সময়ের কবিগণ যেখানে শাব্দিক কারুকার্য ও সাজসজ্জায় লৌকিকতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সেখানে নব জাগরণের কবিগণ গীতি-কবিতায় নতুন কমনীয়তা ও শোভা দানের মতো মহান ঐতিহ্যের সঞ্চার করেছেন। কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী বেক [মৃ. ১৯৩২ খ্রি.] প্রশংসা কাব্যে আর হাফিয ইবরাহিম [মৃ. ১৯৩২ খ্রি.] শোকগাথা রচনায় নতুন ধারা প্রর্বতন করেন। এঁদের কবিতায় প্রাচীন আরব কবিদের ন্যায় প্রেমিকার প্রণয়-বিরহ কিংবা পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার জন্য ক্রন্দন বিলাপের ধারা পরিদৃষ্ট হয় না। আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ [মৃ. ১৯৬৪ খ্রি.], আবদুল কাদির আল-মাযিনী মৃ. [১৯৪৯ খ্রি.}, আবদুর রহমান শুকরী প্রমুখ কবি আরবি গীতি-কবিতায় এক নতুন সৌষ্ঠব দান করেন। তারা প্রাচীন কবিদের বিশুদ্ধ অলঙ্কারপূর্ণ রচনা পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইংরেজি ভাষার কবিদের কবিতার সাথে সমন্বয় সাধন করেছেন। গতানুগতিক কবিতার ধারা পরিহার করে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। লেবাননের খ্রিস্টান কবিগণ প্রাচীন কবিদের পুরাতন স্মৃতিচারণ ও ক্রন্দন-বিলাপের কবিতা অপছন্দ করতেন। পুরাতন রীতির কবিতার বিরোধিতার জন্য তারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। তারা পুরাতন ধারা বর্জন করে পাশ্চাত্যের কাব্য-রীতি গ্রহণের জন্য জোর দাবি করেন।

আরবি ভাষায় গীতি-কবিতার যেমন চর্চা হয়েছে, তেমনি ফার্সি, তুর্কি ও উর্দু ভাষায়ও গীতি-কবিতার চর্চা হয়েছে যুগে যুগে। এসব ভাষায় গীতি-কবিতার সূচনা মূলত আরবদের অনুকরণেই হয়েছিল। ফার্সি কাব্যের প্রভাব তুর্কি ও উর্দু কাব্যে সুস্পষ্ট। এ দুই ভাষাতেই ফার্সি কাব্যের প্রভাব সমানভাবে লক্ষ্যণীয়। ফার্সি কাব্যে মুখবন্ধ [তাশবীব], স্তুতি [মাদাহ], প্রসঙ্গ পরিবর্তন [তাখাল্লুস], কামনা-বাসনা [তালাব] ও প্রার্থনা

www.bjilibrary.com

[দোআ] এই পাঁচটি রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এ কারণে ফার্সি গীতি-কাব্য নান্দনিক শিল্পকলার এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। যুগ পরিক্রমায় অনেক কবি ফার্সি গীতি-কাব্যে অম্লান অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে সামানী যুগে [৯৭৪-৯৯৯ খ্রি.] কবি রাওদাকী, গাযনবী আমলে [৯৬২-১১৮৬] উনসুরী [মৃ. ১০৩৯ খ্রি.], ফাররুখী [মৃ. ১০৩৭ খ্রি.], সালজুকদের যুগে [১০৩৭-১১৫৭ খ্রি.] নাসির খুসরাও [মৃ. ১০৮৮], মাসউদ সাদ সালমান [মৃ. ১১২১], পাকভারত মুঘল যুগে ফায়দী [মৃ. ১৫৯৫], মুসদী মাশহাদী [মৃ. ১৬৪৬], আধুনিক যুগে [১৭৯৭-১৮৪৮] আবদুল ওযাহ্হাব নিশাত [মৃ. ১৮২৮], মির্যা শাফী বিসাল [মৃ. ১৮৪৫], হাবিবুল্লাহ ফাআনী [মৃ. ১৮৫৩] প্রমুখ কবিদের অবদান স্মরণীয়। ভারতবর্ষের খ্যাতিমান কবি আসাদুল্লাহ খান গালিব [মৃ. ১৮৬৯ খ্রি.]-এর পর গীতি-কাব্য চর্চার প্রায় সমাপ্তি ঘটে। ইংরেজ যুগে গোলাম কাদির গারামী ও শিবলী নুমানী [মৃ. ১৯১৪] গীতি-কবিতায় অবদান রাখেন। বর্তমান ইরানের মালিকুশ শুআরা বাহার [মৃ. ১৯৫১]-এর অবদানও কম নয়। তিনি দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাকামী কবি ছিলেন।

ফার্সি গীতি-কবিতার ন্যায় তুর্কি কাব্য ও মুখবন্ধ [তাশবীব] ও কামনা-বাসনা [তাখাল্লুস] এই দু'টি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ফার্সি কাব্যের সাথে যথেষ্ট মিল থাকলেও তুর্কি কাব্যের কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এবং তাতে আনাতোলী ও ইস্তাম্বুলে বিকশিত তুর্কি সভ্যতার প্রতিফলন ঘটেছে। তুর্কি ভাষায় বিশাল শব্দভাণ্ডার, কোন বাক্যের ব্যাকরণিক বিন্যাসে প্রয়োজনমত পরিবর্তনের অবকাশ এবং তুর্কি শব্দসমূহের সুরেলা ধ্বনি-ব্যঞ্জনাকে গীতি-কবিতা রচয়িতা তুর্কি কবিগণ সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। তাদের বিখ্যাত গীতি-কবিতাগুলো শাব্দিক আড়ম্বর, সুন্দর গঠন, গতিশীল রচনা-রীতি ও হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য চিত্রণের দিক দিয়ে ফার্সি ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তুর্কি ভাষায় গীতি-কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে নাফঈ, ওয়ায়সী, নাবী [মৃ. ১৭১২], সাবরী, ফাহিম, জাওরী, নাইলী [মৃ. ১৬৬৬ খ্রি.], ছাবিত নাদীম [মৃ. ১৭২৭ খ্রি.], সাইয়েদ ওয়াহবী [মৃ. ১৭৩৬ খ্রি.] ও সুনবুল যাদ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এসব কবি মাসনাবী, তারকীবানদ, তারজীবান্দ ও মুসাদ্দাস পদ্ধতিতে কাব্য-রচনা করতেন।

উর্দু গীতি-কাব্যেও ফার্সি গীতি-কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উর্দু গীতি-কাব্যে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তা ফার্সি কাব্যের প্রভাবেই হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে এই কাব্যের সূচনা হয়। দাক্ষিণাত্যের গীতি-কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে গাওয়াসীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। দীর্ঘ কবিতা ও সুন্দর গীতি-কাব্য রচনার জন্য তার বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। অন্যান্য কবি গীতি-কাব্য রচনা করলে তাদের কাব্যে শৈল্পিক সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ তার কাব্যে শৈল্পিক সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিল। উর্দু ভাষায় গীতি-কাব্য রচনার প্রথম যুগ হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের ওয়ালী হতে হাতিম ও আবরূ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে সাওদার যুগ। এ সময়ে মীর তাকী ও মাফতুন আওরাঙ্গাবাদী গীতি-কাব্যে অবদান রাখেন। তবে সাওদাই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। এর পরে ইনশা ও মাসহাফী গীতিকাব্য রচনা করেন। এঁদের কাব্যে নিপুণ রচনাশৈলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের কাব্য

www.bjilibrary.com

কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করতে পারেনি। মধ্যযুগীয় কবি আতাশ ও নাসিখ কাব্য চর্চায় তেমন মনোযোগী ছিলেন না। তবে দিল্লীর যাওক, গালিব ও মুমিন এই তিনজন কবি কাব্য চর্চায় সকলের শীর্ষে ছিলেন। তাদের কাব্যে বর্ণনার সৌন্দর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষার ব্যবহার বিদ্যমান ছিল। যাওকের সমসাময়িকদের মধ্যে মির্যা গালিব ছিলেন খ্যাতিমান গীতি-কাব্য রচয়িতা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যাঙ্গনেও পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়ে হালী ও আযাদ কাব্য রচনা করে আধুনিক ধারার কাব্য রচনার পথিকৃতের মর্যাদা কুড়িয়ে নেন।

অতএব, বলা যায়, গীতি-কবিতা আরবি সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে বিবেচ্য। আরবি সাহিত্যের স্বনামখ্যাত কবিগণ এই ধারায় কাব্য রচনা করে ইতিহাসে তারা অমর হয়ে আছেন। কাব্য-সাহিত্যের এ ধারাটি অতীব প্রাচীন হলেও অধুনাকালেও এর চর্চা নিজস্ব ধারায় অব্যাহত আছে। খ্যাতিমান কবিগণ নিজ নিজ ভাষায় গীতি-কাব্য চর্চা করে কাব্য-সাহিত্যের এ ধারাটিকে আজও স্বরূপে সমুজ্জ্বল রেখেছেন। সাহিত্যামোদীদের মতে : ভাষা, ভাব ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের দিক বিচারে এর আরো উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং সমৃদ্ধ হবে যুগে যগে এর বিকাশধারা।■

www.bjilibrary.com

শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবীর [সা] ভূমিকা

মো: আতিকুর রহমান

নিরক্ষরতা বা মূর্খতা একটি জাতির জন্য বিরাট অভিশাপ। নিরক্ষরতা জাতিকে সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতির পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অক্ষর জ্ঞান না থাকলে ব্যক্তি তার কর্মপন্থা ও মানুষ হিসেবে জীবন যাপনের প্রণালী, নিয়মনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে যথার্থ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয় না। আর এ কারণেই বর্তমানে আমাদের দেশেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। মহানবীর [সা] এ ধরায় আগমন ঘটেছিলো বিশ্ব-মানবতার শান্তি ও কল্যাণের বাহক হিসেবে বিশ্ববাসীর উন্নতি ও অগ্রগতির সকল পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য। আর এ মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি নিজেকে একজন সফল নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মানবীয় সফলতার সকল ক্ষেত্রে যথাযথ দিকনির্দেশনা দানের মাধ্যমে তিনি গোটা উম্মতকে একটি ফলপ্রসূ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়ে গেছেন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই মহানবী [সা] শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সাথে সাথে আদর্শ শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণেও জাতিকে যথার্থ দিকনির্দেশনা দান করেছেন। বক্ষমাণ নিবন্ধে আমরা শিক্ষা বিস্তার

www.bjilibrary.com

ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবী [সা]-এর ভূমিকা ও বহুবিধ অবদানের কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

মহানবী [সা] নিজে ছিলেন উম্মি বা নিরক্ষর। মনে রাখা দরকার যে, উম্মি আর মূর্খ কখনো এক কথা নয়। উম্মি বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেননি। মূলত এটিও মহান আল্লাহ তায়ালার হিকমত যে, তিনি মহানবীকে [সা] উম্মি বা নিরক্ষর হিসেবে প্রেরণ করেছেন যাতে পবিত্র কুরআন তাঁর রচিত বলে কেউ সন্দেহ পোষণ করতে না পারে এবং দুনিয়ার কোন মানুষ যাতে তাঁর উস্তাদ হয়ে তাঁর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে না পারে। তাই বলা যায়, দুনিয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে লেখাপড়া করেননি বলে তিনি উম্মি হলেও স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছিলেন তাঁর সরাসরি শিক্ষক। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ তায়ালার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সফল ছাত্র। আল্লাহপাকের দেয়া সে শিক্ষার আলোকেই মহানবী [সা] শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে নবী! আমি আপনাকে এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি যা আপনি জানতেন না এবং আপনার পূর্বপুরুষরাও জানতো না।" [সূরা আন'আম-৯২] প্রিয় নবী [সা] নিজেই ইরশাদ করেন, "আমি বিশ্ববাসীর শিক্ষকরূপে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছি।"

শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে মহানবীর [সা] অসাধারণ ভূমিকায় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শুধু তাঁর অনুসারী ভক্তবৃন্দের মুখ-নিঃসৃত বক্তব্য থেকেই নয়, বরং ইসলামের ঘোর বিরোধী এবং ইসলামের প্রতিপক্ষদের সারিতে অবস্থানকারী অনেক নিরপেক্ষ গবেষকদের স্বীকারোক্তিতেও এর প্রমাণ মেলে। এক্ষেত্রে টমাস কারলাইলের একটি উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। টমাস কারলাইল বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন একজন নিরক্ষর মানুষ। কোন শিক্ষকের সামনে তিনি বসেননি কোনদিন, প্রচলিত পন্থায় তিনি কোন আক্ষরিক জ্ঞান অর্জন করেননি, অথচ তাঁরই মুখ-নিঃসৃত প্রতিটি বাক্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসাধারণ ও বৈচিত্র্যময় উপকরণ। প্রয়োজন ছাড়া তিনি কোন কথাই বলতেন না এবং তখন তিনি নীরব থাকতেন। যখন কোন কথা বলতেন তখন তা হতো বুদ্ধিদীপ্ত ও বিচক্ষণতাসমৃদ্ধ।" [Life of the holy Prophet]

শিক্ষার প্রতি মহানবীর [সা] অনুরাগ ও তা বিস্তারে তিনি কতটুকু আগ্রহী ছিলেন, বদর যুদ্ধ-পরবর্তী একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বদর যুদ্ধে যেসব কাফির সৈন্য মুসলিম সৈন্যদের হাতে বন্দী হয় তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলো যারা লেখাপড়া জানতো, নবী করীম [সা] তাদের মুক্তিপণ স্থির করলেন, দশটি ছেলেকে অক্ষর জ্ঞান দান করা অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে দশজন করে মুসলিম সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লেখাপড়া শেখাবে। এরপর তারা মুক্ত হয়ে যাবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মহানবী [সা] মুক্তিপণ হিসেবে মোটা অংকের অর্থ-সম্পদ বা অন্য

www.bjilibrary.com

কিছুও নির্ধারণ করতে পারতেন, বিশেষ করে মুসলমানদের আর্থিক সঙ্কটের সে মুহূর্তে এমনটা করাই ছিলো স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুসলিম জাতির মহান শিক্ষক বিশ্ববাসীর মুক্তির মহান বার্তাবাহক প্রিয়নবী [সা] অর্থের লোভ করেননি। শিক্ষাকে তিনি অর্থের ওপর প্রাধান্য দিলেন, এমন কি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি কট্টর ইসলাম বিদ্বেষীদেরকেও শিক্ষকের মহান মর্যাদা দানে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলেন না বরং জীবনের সর্বপ্রথম সুযোগেই তিনি শত্রুদের দ্বারা মদিনার প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সকলকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করলেন। মূলত শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে নবী করিমের [সা] এ অসাধারণ ভূমিকার ফলেই তৎকালীন আরবের চরম মূর্খ ও বর্বর জাতিকে তিনি বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা মানে হচ্ছে সুশিক্ষা বা আদর্শ শিক্ষা। তৎকালীন আরব সমাজে মূলত এই আদর্শ শিক্ষারই অভাব ছিলো প্রকট। তাই সে যুগে ইমরুল কায়েসের মতো প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তা ইতিহাসের পাতায় জাহিলি যুগ হিসেবেই খ্যাতি লাভ করে। কারণ তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আদর্শ ও নৈতিকতার কোন বালাই ছিলো না। মহানবী [সা] এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং বুঝতে পারলেন এ অধঃপতিত জাহিলি জাতিকে একমাত্র নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলেই তারা একটি সভ্য সমাজে পরিণত হতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি মূলত দু'টি ধারায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন। প্রথমত শিক্ষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত বর্ণনা করার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরব জাতিসহ অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত হয়ে গড়ে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন। দ্বিতীয়ত বহুবিধ বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করার মাধ্যমে শিক্ষার আলোবঞ্চিত একটি জাতিকে সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা

শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী করার জন্য এবং শিক্ষার প্রতি জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মহানবী [সা] পবিত্র কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, "যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহাকল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে।" [সূরা বাকারা-২৬৯] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে আর যে জ্ঞান রাখে না এ দু'ব্যক্তি কি সমান হতে পারে?" আরো ইরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের মাঝে যারা জ্ঞানী মহান আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।" [সূরা মুজাদালাহ-১১] এ ছাড়াও শিক্ষার গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী [সা] হাদিস শরীফে ইরশাদ করেন :

"পৃথিবীতে জ্ঞানী [আলিম] ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আকাশের তারকার ন্যায় যা পানি ও স্থলভাগকে করে আলোকিত।"

"জ্ঞান [ইলম] অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয।"

www.bjilibrary.com

"রাতের কিছু সময় জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত জেগে ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।"

মূলত শিক্ষাকে ব্যাপক করার মাধ্যমে একটি সভ্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গড়াই ছিলো নবী করিমের [সা] উপরোক্ত বাণীসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শিক্ষা বিস্তারে মহানবীর [সা] বাস্তব কর্মসূচি

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের লক্ষ্যে বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক মহানবী [সা] যেসব বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেন তা নিম্নে অতি সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো :

শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন : পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য মহানবী [সা] ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত দারুল আরকামকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করেন এবং সেখানে দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইতিহাসে এটিই ছিলো সর্বপ্রথম বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্র। এমনিভাবে হিজরতের পূর্বে মদিনার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য নবী করিম [সা] হযরত মূসা ইবনে উমাইরকে [রা] শিক্ষক হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করেন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর [রা] মদিনায় আবু উসামা ইবনে যুরারার বাড়িতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে নবীজির [সা] নির্দেশমত সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। মদিনায় এটিই ছিলো সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র।

হিজরতের পর প্রিয় নবী [সা] দীর্ঘ আট মাস যাবৎ আবু আইউব আনসারীর [রা] দ্বিতল ভবনের নিচতলাকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তথায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। এটি ছিলো মদিনার দ্বিতীয় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র।

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : নবী করীম [সা] শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর ব্যাপক ও সার্বক্ষণিক করার জন্য সাহল ও সুহাইল নামের দুই ভাই থেকে একটি জমি খরিদ করে সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন, যা সুফ্‌ফা নামে সর্বাধিক পরিচিত। সেখানে তিনি সার্বক্ষণিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন। সে শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রদেরকে বলা হতো আহসাবে সুফ্‌ফা। নিরক্ষর লোকদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ছিলো সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই শিক্ষাকেন্দ্রে মহানবী [সা] নিজে শিক্ষাদানসহ সার্বক্ষণিক শিক্ষক হিসেবে হযরত সাঈদ ইবনে আ'স [রা] কে নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক আল্লামা বালাজুরীর বর্ণনামতে হিজরি দ্বিতীয় সনে মহানবী [সা] দারুল কুররা নামে আরো একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, শুধু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, বরং দাওয়াত ও জিহাদি কর্মসূচির শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মহানবী [সা] নিয়মিত এসব শিক্ষাকেন্দ্রের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে কোন বেমানান কাজ পরিলক্ষিত হলে কিংবা কোন বিষয়ে তাদেরকে তর্ক-বির্তকে লিপ্ত দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তা বন্ধ করে দিতেন এবং এ জাতীয়

www.bjilibrary.com

কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হবার উপদেশ দিতেন। একবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে অকারণে হাসাহাসি করতে দেখে প্রিয়নবী [সা] সাথে সাথে তাদের মৃত্যু-পরবর্তী কঠিন অবস্থার কথা বলে হাসাহাসি থেকে বিরত থাকতে বলেন।

শিক্ষা দান পদ্ধতি : মহানবীর [সা] শিক্ষা দান পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীকে কয়েকবার উচ্চারণ করে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রদেরকে বিষয়টি কণ্ঠস্থ করিয়ে দিতেন। আবার কখনো লিখে রাখার পরামর্শ দিতেন এবং ছাত্ররা তা লিখে রাখতেন। নবী করিম [সা] যাঁদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতেন তাঁদেরকেও তিনি এ বলে উপদেশ দিতেন, তোমরা শিক্ষার্থীদের মেধানুযায়ী বিষয়াবলী উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক প্রেরণ : নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে অশিক্ষিত ও মূর্খ জাতিকে একটি সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার জন্য মহানবী [সা] প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি ভ্রাম্যমাণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দূর-দূরান্তে শিক্ষক প্রেরণ করেন যার ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। হিজরি ১১ সালে মহানবী [সা] হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে [রা] ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করেন এবং একজন ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। এমনভাবে হযরত আবু মূসা আশ'আরী [রা]-কেও একটি এলাকায় পাঠানো হয়। [বুখারী]

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : যারা অন্যদেরকে শিক্ষা দেবেন তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া অতীব জরুরি। তাই মহানবী [সা] মদিনার কেন্দ্রীয় শিক্ষালয়ে একটি প্রশিক্ষণ সেল স্থাপন করেন। দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহ থেকে মেধাবী যুবকদেরকে বাছাই করে মদিনায় এনে তিনি তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। অত:পর তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেন।

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা : নবী করিম [সা] সাহাবায়ে কেরামকে নিজ নিজ এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেসব মসজিদকে ভিত্তি করে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করার নির্দেশ প্রদান করেন। ওমানের নওমুসলিমদেরকে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়ে নবী করিম [সা] যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বুখারী শরীফসহ নির্ভরযোগ্য হাদিস সংগ্রহসমূহে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাষা শেখা : প্রিয়নবী [সা] মাতৃভাষার লিখন ও পঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লোক নির্বাচিত করে তাদেরকে অন্যান্য রাষ্ট্রের ভাষা শিক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা করেন। হযরত যায়েদকে [রা] নবী করিম [সা] হিবরু ভাষা শেখার নির্দেশ দেন এবং মাত্র সতের দিনে তিনি হিবরু ভাষা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অনুরূপভাবে হাবশী, ফার্সি, সুরইয়ানী, গ্রিক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষারও তিনি ব্যবস্থা করেন।

www.bjilibrary.com

এ ছাড়াও মূর্খতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে তিনি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বহুমুখী বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেন। [যেমন বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ, কাব্য ও সাহিত্য চর্চা, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ, শিশু শিক্ষা ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।]

উপসংহার : বলবো, মহানবী [সা] এক বিশেষ হিকমতের জন্য উম্মি হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হলেও ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে তিনি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই গণ্ড-মূর্খতায় আচ্ছাদিত আরব জাতি অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করে সুশিক্ষার সম্মানজনক আসনে সমাসীন হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিতের হার কম না হলেও আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতের অভাব যথেষ্ট যার ফলে গোটা দেশ আজ নানাদিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত। তাই আসুন, আমরা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মহানবী [সা]-এর নীতি ও আদর্শের অনুসরণে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হই এবং অশিক্ষা, কুশিক্ষার ফলে বিরাজিত দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে দেশকে রক্ষা করি।■

লেখক : চেয়ারম্যান, ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

স্বপ্নের বেড়াজালে

মূল : এস.এস. লাই

তরজমা : এস. এম. জহির উদ্দীন

যে লেখাটি আমি লিখছি এটি ছিলো এখন থেকে ৫ বছর ১১ মাস আগের ঘটনা। যখন আমি ইসলামের অর্থ সম্পর্কে মোটামুটি বুঝি। আমি ইসলামে ফিরে এসেছি ৫ অক্টোবর ১৯৯১। আমি বিশ্বাস করতাম যে, প্রতিটি শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় জন্ম নেয় এবং তারা কি চিন্তা-চেতনার হবে তা তাদের বাবা-মায়ের ওপর নির্ভর করে। সাথে সাথে এও বিশ্বাস করতাম যে, শিশুদের ভালো চিন্তা-চেতনার একমাত্র পথ খুব সম্ভবত তাদের বাবা-মা-ই দেখাতে পারে।

আমার অতীত ইতিহাস চাইনিজ। আমার পরিবারের সকলেই আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের ও দেব-দেবীর পূজায় বিশ্বাসী ছিলো। বাল্য জীবনের পুরাটা সময় আমি অনেক প্রভু, অনেক সম্পদ ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি।

প্রতি বছর আমার উচ্চ আশা ও প্রবল উৎসাহ থাকতো দাদার সাথে মন্দিরে আসার ব্যাপারে।

আমাকে যেখানে নেয়া হতো সেখানে বিভিন্ন রকম খাবার দেখতাম। [আমার ধারণা ছিলো খাবারগুলো অবশ্যই সুস্বাদু ও মজাদার হবে। কারণ তাদের নিকট তাদের পূজ্যরা ছিলো অতি মহান।]

www.bjilibrary.com

প্রভুগুলো দর্শনমাত্রই ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগতো। কিছু কিছু প্রতিমা সম্পর্কে আমার সুধারণা এবং কিছু কিছু দেখতে বেশ সুন্দরই লাগতো।

ঐ সময় আমরা কাগজের টাকা পুড়িয়ে ফেলতাম এবং আমাদের প্রভুদের জন্য ধূপ শিখা জ্বালাতাম। অত:পর এগুলো নীরবে অনুধাবন করতাম। প্রভুদের উদ্দেশে ম্যাজিক পাথর নিয়ে নানা রকম ছল-চাতুরী করা হতো। আমার তরুণী মনে এগুলো সংঘাত বাঁধিয়ে দিতো।

বাড়িতে আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের ছবি ছিলো। প্রতি পূর্ণিমায় আমি উৎসুক মনে আমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করতাম : দু'টি কয়েন নিক্ষেপ করলেই কি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়ে যায়? যদি কয়েন দু'টির দু'টিই মাথার দিক প্রদর্শন করতো বা দু'টিই যদি লেজের দিক প্রদর্শন করে তাহলে তারা [মৃত পূর্বপুরুষগণ] খাবার গ্রহণ করবেন না।

এক সময় আমি একটি মুসলিম দেশে আসি যার নাম ব্রুনাই। আমি যে স্কুলে আসি তার অধিকাংশ ছাত্রীই ছিলো মুসলিম। আমার মনে পড়ে একদিন এক বান্ধবী একটি বই নিয়ে আসে যাতে জাহান্নামের আগুনের শাস্তির ছবি ছিলো। তখন ব্যাপারটি আমি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারিনি। তবে তখন একটি শিক্ষা পেয়েছিলাম, কখনই এ পৃথিবীতে সুখকর কিছু পাওয়ার জন্য চোখের পানি ঝরাবো না, তাহলে পরজগতে ঐ রকম শাস্তি পেতে হবে।

আমি বাড়ি ফিরে আসি মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে। আমার মামাকে জিজ্ঞাসা করি কেন এমন হয়। আমার মামা আমাকে উপদেশ দেন কেন আমি সর্বদা "কেন" এই প্রশ্নের পিছে ছুটছি। আমি আর তাকে কোনদিন এই প্রশ্ন করিনি।

১৯৮৮ সাল। ইউ.কে.-তে অধ্যয়নের জন্য আমি স্কলারশিপ পাই। এটি ছিলো আমার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য যার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমার জীবনের অন্যতম লক্ষ্যই ছিলো সম্পদশালী হওয়া, তা যথেচ্ছ ব্যবহার করা আর বাবা-মা'য়ের গর্বের ধন হওয়া। আমি তখন একটি মাত্র পথ খুঁজছিলাম কিভাবে ডাক্তার হওয়া যায়।

আমি এ লেভেল পড়েছি একটি বালিকা বিদ্যালয়ে। তখন ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতাম। আমার অনেক মুসলিম বান্ধবী ছিলো যারা মুসলিম দেশেই বাস করতো। যারা কখনোই শূকরের মাংস গ্রহণ করে না, রমাদান মাসে রোযা পালন করে, তারা ছিলো ত্যাগী।

মুসলিমদের সম্পর্কে এ সকল অভিজ্ঞতা আমাকে তেমন আকর্ষণ করেনি যদিও সাত বছর বয়সের সময় আমার অদ্ভুত এক অনুভূতি ছিলো যে, আমি আমার মামার মতো মুসলিম হবো।

মুসলিমদের সম্পর্কে এ রকম ধারণাও ছিলো, তারা ভয়ঙ্কর জাতি, সর্বদা উত্তেজিত থাকে, আতঙ্ক সৃষ্টি করে ইত্যাদি যেগুলো আজ আমার শুধু লজ্জাবোধকেই বৃদ্ধি করে।

ঐ কলেজে আমি এক রাতে এক স্বপ্ন দেখি, "আমি উচ্চ স্বরে আযান শুনতে পাচ্ছি,

www.bjilibrary.com

এবং সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। সেখানে বৃহৎ এক দরজায় গিয়ে দাঁড়াই যার ওপর আরবী হরফ অঙ্কিত। আমি এর অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। তখন আমি আরবী লেখা বুঝতাম না। অত:পর আমি বিশাল নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অনুভব করি। হঠাৎ রুমটি আলোয় পূর্ণ হয়ে যায়। আমি দেখলাম ধূসর কেউ একজন প্রার্থনায় মগ্ন।"

তখনকার অনুভূতি আমার পক্ষে লেখা বা বর্ণনা করা সাধ্যের বাইরে। বাধ্য হয়ে পরদিন আমি আমার এক মালয়েশীয়ান বান্ধবীর নিকট এসব বর্ণনা করি এবং এর অর্থ জানতে চাই। সে আমাকে যা বোঝাতে চেষ্টা করলো তা হলো– এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে আমার মনে নানাবিধ প্রশ্ন আসতে থাকে এবং প্রথমবারের মতো আমার ইসলাম গ্রহণ করার কথাও মাথায় আসতে থাকে। ইসলাম সম্পর্কে এতো দিনের ভাবনাগুলোর [মুসলিমরা খুব মন্দ লোক, তারা অন্যায়ভাবে লোকদেরকে অত্যাচার করে ইত্যাদি।] পরিবর্তন হতে থাকে।

আমি ব্রুনাই থেকে ফিরে আসি এবং আমার পরিবারকে জানিয়ে দেই বিগত এক বছর আমার মন স্বাভাবিক ছিলো না। আমি আমার জীবনের যা লক্ষ্য [ডাক্তার হওয়া] সেদিকে পূর্ণ মনযোগ দিতে পারিনি। আমি অনুভব করতে সক্ষম হয়েছি, যে কোন কিছুর চেয়ে ইসলামে কল্যাণকর অনেক কিছু রয়েছে।

আমি পরিবার থেকে সহানুভূতি বা কোন রকম সহযোগিতা পাইনি, বরং তারা আমার মনকে পূর্বের দিকে রাখতেই সচেষ্ট হয়। দিন-রাত আমি অনেক কেঁদেছি। কারণ একমাত্র আমিই আযানের ধ্বনি শুনেছি এবং তা হৃদয়ে ধারণ করেছি। আমার নিকটতম বান্ধবীরা [অমুসলিম] ভেবেছিলো আমি পথহারা হয়েছি।

প্রকৃত মুসলিম হিসেবে চলার শুরুতেই পাই আমার এক বান্ধবীকে। সে ইসলামী বিশ্বাসে অবিচল ছিলো। আমি তার নিকট অনেক কিছু শিখে নিই। মুসলিমদের কর্ম-নিষ্ঠা সম্পর্কে তার কাছেই আমি প্রথম জ্ঞান অর্জন করি অর্থাৎ মুসলিমরা যে অন্যের কল্যাণার্থে কাজ করে সেগুলো শিখতে থাকি।

আমি রোযা পালনের চেষ্টা করতে থাকি। অবশ্য ইসলাম গ্রহণের ২-৩ বছর পূর্ব থেকেই আমি হালাল খাবার গ্রহণ করতে থাকি।

আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট ছিলো সেদিন, যেদিন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন বিষয়ে পড়া থেকে আমি বঞ্চিত হই।

আমি আল্লাহ'তে বিশ্বাস স্থাপন করি। বিশ্বাস করি তিনি সর্বদা বিরাজমান, তিনি সব কিছুই শোনেন।

পরদিন আমি বান্ধবীদের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও ঘোষণা করি, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপরই বলি, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।"■

www.bjilibrary.com

প্রসঙ্গ : মুজিযা

ফখরুদ্দীন আহমদ

১.

আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবী-রাসূলদের [আ] দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহকে মুজিযা বলা হয়। মুজিযাকে আল-কুরআনে আয়াত বা নিদর্শন বলা হয়েছে। এই আয়াত বা মুজিযার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনে ঐ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করা যিনি একক ও মহাক্ষমতার অধিকারী যিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু 'হও' বললেই তা হয়ে যায়।

নবী-রাসূলগণ [আ] বিভিন্ন কারণে মুজিযা দেখিয়েছিলেন। ইউসুফ [আ] তাঁর ভাইদের বললেন, "তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটা আমার আব্বার চেহারার ওপর রাখলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।" -সূরা ইউসুফ : ৯৩

আইয়ূব [আ]-কে বলা হলো, "তোমার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত কর। এ হচ্ছে গোসল ও পান করার জন্য ঠাণ্ডা পানি।" -সূরা আস সোয়াদ : ৪২

"ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে মেনে নাও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে জেলখানার

www.bjilibrary.com

কয়েদী করবো। মূসা বলল, যদি আমি তোমার সামনে সুস্পষ্ট কোন বিষয় নিয়ে আসি? সে বলল, বেশ তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তা নিয়ে এসো। মূসা তাঁর হাতের লাঠিটি ছুঁড়ে মারলে সঙ্গে সঙ্গে তা স্পষ্ট অজগর সাপ হয়ে গেল এবং হাত [বগল থেকে] বের করলে লোকদের দৃষ্টির সামনে তা জ্বল জ্বল করতে লাগালো।" -সূরা আশশুআরা : ২৯-৩৩

"যখন মূসার কওম তার কাছে পানি দাবী করলো, তখন আমি ওহীর মাধ্যমে বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর। ফলে সেখান থেকে বারটি ঝরনা বইতে লাগলো।" -সূরা আল আরাফ : ১৬০

"আমি মূসাকে ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, সমুদ্রের ওপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর। তারপর সাগর ফেটে গেল এবং এর এক একটি ভাগ বিশাল পাহাড়ের ন্যায় [উঁচু] হয়ে গেল।" -সূরা আশশুআরা : ৬৩

ঈসা [আ] রাসূল হিসেবে বনী ইসরাঈলের কাছে এসে বলেন, "আমি তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। তোমাদের সামনে আমি মাটি দিয়ে পাখির মূর্তি বানিয়ে তাতে ফুঁ দেবো। তারপর তা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যাবে। আমি আল্লাহর হুকুমে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিই এবং মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদেরকে বলে দেবো, তোমরা কী খাও এবং কী জমা করে রাখ।" -সূরা আলে ইমরান : ৪৯

অলৌকিক বিষয়ের প্রতি মানুষের কৌতূহল তীব্র। সকল নবীর কাছেই লোকেরা অলৌকিক কিছু দাবি করেছে। বলেছে, অলৌকিক কিছু দেখাতে পারলে তারা ঈমান আনবে। তাই নবী-রাসূলগণ [আ] আল্লাহর অনুমতিতে মুজিযা দেখিয়েছেন। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি; তারা ঈমান আনেনি, বরং বলেছে, এ তো প্রকাশ্য যাদু!

"[হে ঈসা ইবনে মারইয়াম!] যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে বনী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছলে তখন তাদের মধ্য থেকে সত্য অস্বীকারকারীরা বলল, এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। -সূরা আল মায়িদা : ১১০

"[ফিরাউনের কওম] বলল, আমাদের ওপর যাদু করার জন্য যত নিশানা নিয়েই আস, আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না।" -সূরা আল আরাফ : ১৩২

"আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি। তোমরা বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখ। যখন সে তাদের কাছে গেল, ফিরাউন তাকে বলেছিল, হে মূসা! আমার মনে হয় তোমার ওপর যাদুর আছর পড়েছে।" -সূরা বনী ইসরাঈল : ১০১

"ফিরাউনের কওমের নেতারা বলল, নিশ্চয়ই এ লোকটি বিজ্ঞ যাদুকর। সে তোমাদেরকে তোমাদের জমিন থেকে বেদখল করতে চায়।" -সূরা আল আরাফ : ১০৯-১১০

কেন তারা মুজিযাকে যাদু বলতো এই আয়াতে তাদের মুখ থেকেই তা শোনা গেল। মানুষ যদি মূসা [আ]-এর কথা মেনে নেয় এবং সমাজে ইসলামী জীবন বিধান চালু হয়ে যায় তাহলে তাদের ক্ষমতা খতম হয়ে যাবে। এই আশঙ্কাই ছিল তাদের মিথ্যাচারের কারণ।

www.bjilibrary.com

মূসা [আ] যা দেখিয়েছেন তা যে যাদু নয়, বরং মুজিযা! তার প্রমাণ হল তখন সেখানে দুনিয়ার সেরা যাদুকরগণ উপস্থিত ছিলেন। যাদু কি জিনিস তা তাদের চেয়ে আর কে বেশি জানে? যাদুকররা বুঝতে পারলো যে, মূসার [আ] ছুঁড়ে দেয়া লাঠি এত বড় সাপে পরিণত হওয়া কিছুতেই যাদু হতে পারে না, বরং মহাক্ষমতার অধিকারী রবেরই নিদর্শন। মূসার [আ] রবের প্রতি তাদের মাথা সিজদাবনত হয়ে গেল এবং তারা সবাই তখনই তাঁর প্রতি ঈমান আনলো।

"যাদুকররা বলল, হে মূসা! তুমি আগে ছুঁড়বে, না আমরা ছুঁড়বো? মূসা বললেন, তোমরাই আগে ছুঁড়ো। যখন তারা ছুঁড়তে লাগলো তখন চোখে যাদুর ধাঁধা লেগে লোকেরা দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তারা বিরাট যাদু দেখালো। আমি মূসাকে ইশারা করলাম, তোমার লাঠি ছুঁড়ে মার। সাথে সাথেই তা তাদের তৈরী মিথ্যা ভেলকিবাজি গিলে ফেলতে লাগলো। এভাবেই যা সত্য তা প্রমাণিত হলো এবং তারা যা কিছু বানিয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেল। [ফিরাউন ও তার সঙ্গীরা] ময়দানে পরাজিত ও অপমানিত হলো। আর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান আনলাম, যিনি মূসা ও হারুনের রব।" -সূরা আল আরাফ : ১১৫-১২২

২.

মুহাম্মদ [সা]-কে অন্য নবীদের মতো প্রকাশ্য মুজিযা দেয়া হয়নি। কারণ অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুজিযার সাথে মানুষ যথার্থ আচরণ করে না। দেখার জন্য অতি উৎসাহী হলেও মুজিযা দেখানোর পর তারা সেটাকে মোটেও পাত্তা দেয় না, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

"তারপর সে যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ পেশ করলো তখন তারা তা নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকে।" -সূরা আয যুখরুখ : ৪৭

মুজিযার সাথে যথার্থ আচরণ না করলে এবং মুজিযা দেখানোর পর ঈমান না আনলে আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে পড়ে।

"আমি একটি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা হিসেবে পাঠাচ্ছি। তুমি একটু ধৈর্য ধরে দেখ, তাদের কী দশা হয়! তাদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি ভাগ করা হবে। প্রত্যেকেই যার যেদিন পালা সেদিন পান করবে। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের লোকটিকে ডাকলো। সে এ কাজের ভার নিল এবং উটনীকে মেরে ফেলল [দেখে নাও] আমার সাবধান বাণী ও আযাব কেমন ছিল। তাদের ওপর একটি মাত্র বিকট আওয়াজ পাঠালাম। ফলে তারা পিষে ফেলা ভূষির মতো হয়ে গেল।" -সূরা কামার : ২৭-৩১

কিন্তু মানুষের ধ্যান-ধারণা বড়ই বদ্ধমূল। তারা মনে করে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ অবশ্যই অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে থাকবেন। মানুষের ভালো-মন্দ, লাভ-লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষমতা আছে, অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে রাসূল [সা] নিজের ওপর আপতিত বিপদ থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন না।

www.bjilibrary.com

"[হে রাসূল!] তাদের বল, আমি আমার নিজের ভালো-মন্দের ক্ষমতাও রাখি না; আল্লাহ যা চান তাই হয়। আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে নিজের জন্য ভালো ভালো অনেক কিছুই হাসিল করতে পারতাম, কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।" -সূরা আল আরাফ : ১৮৮

"আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চান তবে তিনি ছাড়া তোমাকে রক্ষা করার আর কেউ নেই।" -সূরা আল আন'আম : ১৭

মুজিযা দেখানোর জন্য লোকেরা দাবি শুরু করলো।

"যারা [মুহাম্মদ [সা]-কে রাসূল হিসেবে মানতে] অস্বীকার করেছে তারা বলল, এ লোকটির ওপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাযিল হয় না? বলে দাও, আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করে দেন। তিনি তাঁর দিকে আসার পথ তাকেই দেখান, যে তাঁর দিকে ফিরে আসতে চায়।" -সূরা আর রাদ : ২৭

"তারা বলে, তুমি জমিন থেকে আমাদের জন্য একটি ঝরনাধারা প্রবাহিত না করা পর্যন্ত আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটা বাগান তৈরি হোক, যার মাঝে তুমি বহমান নদী জারি করে দেবে অথবা তোমার দাবী অনুযায়ী আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলে দাও। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আস অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের একটি ঘর তৈরি হোক অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর; অবশ্য তোমার আরোহণকেও আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মানবো না যতক্ষণ না সেখান থেকে এমন কোন লেখা পাঠাবে যা আমরা পড়তে পারি। [হে মুহাম্মদ!] তাদের বলে দাও, আমার রব [সকল প্রকার অক্ষমতা থেকে] পবিত্র। আমাকে আল্লাহর বাণীবাহক একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবো কি?" -সূরা বনী ইসরাঈল : ৯০-৯৩

মক্কার মানুষ মুহাম্মদ [সা]-এর নিকট মুজিযার জন্য এত বেশি দাবি জানাচ্ছিল যে, তিনি ভাবলেন কোন্ মুজিযা দেখানো গেলে হয়ত লোকেরা ঈমান আনবে। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানালেন, "তোমার আগেও বহু রাসূলকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মিথ্যা আরোপ করা এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধরেছে। আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করা হয় না। পূর্বের নবী-রাসূলদের খবর তো তোমার কাছে পৌঁছেছেই। তাদের [মক্কার কাফিরদের] মুখ ফিরিয়ে রাখা যদি তোমার সহ্য না হয় তাহলে সম্ভব হলে জমিনে সুড়ং খোঁজ অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের সামনে কোন নিদর্শন নিয়ে আসার চেষ্টা কর।" -সূরা আল আনআম : ৩৪-৩৫

এ আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোন অবস্থাতেই মুহাম্মদ [সা]-কে তাদের সামনে মুজিযা পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

"তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদের নিয়ে আস না কেন?

www.bjilibrary.com

আসলে আমি ফেরেশতাদের এমনি এমনিই নাযিল করি না। তারা যখন নাযিল হয়, সত্যসহই নাযিল হয়। তখন আর কাউকে কোন অবকাশ দেয়া হয় না।" -সূরা আল হিজর : ৭-৮

অর্থাৎ মুজিযাকে যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে, ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

"নিদর্শন পাঠাতে কেউ আমাকে নিষেধ করেনি। নিদর্শন পাঠাই না এ কারণে যে, আগের লোকেরা তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। সামূদ জাতিকে আমি দৃশ্যমান উটনী এনে দিলাম, অথচ তারা এর ওপর জুলম করলো।" -সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৯

"তারা বলে, এটা আজে বাজে স্বপ্ন, এটা তার মনগড়া, বরং সে কবি। তা না হলে সে কোন নিদর্শন আনুক, যেমন অতীতকালে রাসূল [নিদর্শনসহ] প্রেরিত হয়েছিল। এদের কেউই ঈমান আনেনি, এখন এরা কি [নিদর্শন দেখে] ঈমান আনবে?" -সূরা আল আম্বিয়া : ৫-৬

অর্থাৎ মুজিযা দেখার পরও এরা ঈমান আনবে না।

"তারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, যদি তাদের সামনে কোন নিদর্শন আসতো তাহলে তারা তার প্রতি ঈমান আনতো। বলে দাও, সকল নিদর্শন আল্লাহর ইখতিয়ারে। [হে মুমিনগণ!] তোমাদেরকে কি করে বোঝানো যাবে যে, নিদর্শন আসলেও তারা ঈমান আনবে না।" -সূরা আল আন'আম : ১০৯

৩.

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটিকে কেউ কেউ মুহাম্মদ [সা]-এর মুজিযা বলে প্রচার করে থাকেন। তাঁরা আনাস* [রা]-এর সেই হাসীদটিকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন, যে হাদীসে তিনি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাকে নবী [সা]-এর মুজিযা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে সকল সাহাবী ঘটনার সময় রাসূলুল্লাহর [সা] সঙ্গে ছিলেন তাঁরা কেউই এটিকে তাঁর মুজিযা বলেননি। একজন সাহাবীর কথা তো একাধিক সাহাবী ও কুরআনের বক্তব্যের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মতো এত বড় মুজিযা যদি মুহাম্মদ [সা] দেখাতেন তাহলে তিনি ঘোষণা দিয়েই তা দেখাতেন এবং আরবের সবাই তা প্রত্যক্ষ করতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে কোন এক চান্দ্র মাসের চতুর্দশ রাতে আল্লাহর রাসূল [সা] কিছু সংখ্যক সাহাবী সমেত মিনায় অবস্থান করছিলেন। চাঁদ উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তা ফেটে দুই ভাগ হয়ে যায়। দুই খণ্ডকে পাহাড়ের দুই প্রান্তে দেখা গেল। সাহাবীদের সঙ্গে তিনিও তা দেখলেন। অবশ্য অল্পক্ষণ পরেই উভয় অংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়।

"আবদুল্লাহ [রা] বলেন, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় আমিও নবী [সা]-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন আমাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক।" -সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং ৪৪৯৮

* টীকা : চাঁদ [দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় আনাস [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট উপস্থিত ছিলেন না।]

www.bjilibrary.com

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া সম্পর্কে আল কুরআনের বলা হয়েছে, “কিয়ামত অতি নিকটে, চাঁদ ফেটে গেছে।” -সূরা আল কামার : ১

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি কেন ঘটলো তা এ আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ কিয়ামত এতই নিকটে যে, অচিরেই পৃথিবীসহ গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। চাঁদ ফেটে যাওয়াটা তারই ইঙ্গিত, তারই সূচনা।

আসলে মুজিযা দেখালেও যে মক্কার কাফিররা ঈমান আনতো না, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা তারই প্রমাণ। যে সব কাফির দ্বিখণ্ডিত হওয়া চাঁদ নিজের চোখে দেখেছে তারা বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আমাদের ওপর যাদু করেছে, এটি আমাদের দৃষ্টিভ্রম। রাসূল [সা] মুজিযা দেখানানি বলে প্রাকৃতিক একটি ঘটনাকেই তাঁর যাদু বলে চালিয়ে দেয়ার কী হীন চেষ্টা! কয়েকজন বলল, মুহাম্মদ তো একই সঙ্গে গোটা আরব জাতির ওপর যাদু করতে পারে না! বাইরের লোকদের আসতে দাও, তাদের জিজ্ঞেস করে দেখি। অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছু লোক আসলে তারা বলল, তারাও এ দৃশ্য দেখেছে।

সত্য অস্বীকারকারী কাফিররা নবী-রাসূলদেরকে অপমানিত করার উদ্দেশেই অলৌকিক কিছু দাবী করতো। তারা এরকম ধারণা নিয়েই তা দাবী করতো যে, এই লোক আসলে কিছুই দেখাতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সত্যি সত্যিই মুজিযা দেখতে পারলে তাঁদরেকে যাদুকর বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো। সেজন্যই মুহাম্মদ [সা]-কে প্রকাশ্য মুজিযা দেখানোর অনুমতি দেয়া হয়নি। তাছাড়া মুজিযা প্রকাশিত হওয়ার পর ঈমান না আনলে আযাবের ফেরেশতা পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া আল্লাহর নিয়ম। আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন করা হয় না অর্থাৎ মুহাম্মদ [সা]-এর মুজিযা দেখার পর ঈমান না আনলে আরব জাতিকেও ধ্বংস করে দেয়া হতো। কিন্তু মুহাম্মদ [সা]-এর উম্মত নি:শেষ হয়ে যাক, এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। তাই কাফিররা প্রকাশ্য মুজিযার যত দাবিই করেছে, সব দাবি নাকচ করে তাদের জন্য সকল মুজিযার সেরা মুজিযা আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আল কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এমন এক কিতাব, যা অধ্যয়ন করলে অন্তরচক্ষু বিশ্বের সর্বত্র শুধু আল্লাহর নিদর্শনই দেখতে পায়।

“এটাই [আল কুরআন] রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট মুজিযা।” -সূরা আল আরাফ : ২০৩ ■

www.bjilibrary.com

রাসূল [সা ও মানবাধিকার

মুহাম্মাদ ইউছুফ

দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে মানবীয় মর্যাদাসহ বাঁচার জন্য মানুষের যেসব অধিকারের প্রয়োজন হয় সেগুলোই হলো মানবাধিকার। ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা, জীবিকার্জন, কর্মসংস্থান, সম্পত্তির অধিকার, জাতি, ধর্ম, গোত্রনির্বিশেষে সমান অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন, সবার জন্য সুবিচার ও আইনের শাসন, সৎকর্মের আহ্বান, মন্দ কাজে নিষেধ করা, পিতা-মাতা ও বড়দের সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের স্নেহ করা, দরিদ্র, বিধবা, ইয়াতিমদের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি মানবাধিকারের প্রয়োজনীয় উপাদান। আর উল্লিখিত অধিকারসমূহ যখন একজন মানুষ বা মানবগোষ্ঠী সঠিকভাবে পায় বা তাদেরকে এগুলো ইনসাফের সাথে প্রদান করা হয় তখনই মানবাধিকার থাকে সংরক্ষিত, অন্যথায় মানবাধিকার হয় ভূলুণ্ঠিত, মানবতা হয় বিপর্যস্ত।

যখনই কোন জাতি বা সম্প্রদায় মানুষের এসব অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে বা প্রহসন করেছে অথবা জোর করে নিজের অধিকার অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছে তখনই ঐ জাতির মধ্যে বা ঐ জনপদে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। আর তাই

www.bjilibrary.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করে মানুষের সকল মৌলিক অধিকারগুলো সবার জন্য সমানভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে।

সকল নবী-রাসূলই তাঁদের সমাজের সকল অনাচার, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, ব্যভিচার, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, অন্যের অধিকার হরণ, নারী নির্যাতনসহ সকল অপরাধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে আল্লাহর দেখানো পথে জীবন পরিচালনা করেছেন। মানবাধিকারের এই কাজটিও করেছিলেন আখেরী নবী, মানবতার বন্ধু ও মুক্তির দূত আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সা]। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সমাজে যারা পূর্ববর্তী নবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হিদায়াত থেকে দূরে সরে গিয়ে ডুবে ছিলো সকল প্রকার অনাচার, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, ব্যভিচার, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানির মধ্যে। কেউ কারো কথা মানতো না। ছোটরা বড়দের সম্মান করতো না। বড়রাও ছোটদের সাথে করতো বৈরী আচরণ। কথা বলার ছিলো না সবার সমান অধিকার যেখানে নারী অধিকার ছিল সবচেয়ে বেশি ভূলুণ্ঠিত।

সম্পদ আর জনশক্তি যার যতো বেশি ছিলো তার অধিকার ছিলো ততো বেশি সংরক্ষিত। বিচারের ক্ষেত্রে চলতো একচোখা নীতি। যার শক্তি-সামর্থ্য ছিলো বেশি বড় বড় অন্যায় করেও তার বিচারের সম্মুখীন হওয়া লাগতো না। আর সহায়-সম্পদহীন ব্যক্তি সামান্য অপরাধেও কঠিন বিচারের সম্মুখীন হতো। যেখানে অন্যের অধিকারের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করা হতো না, সেই সমাজেই দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ নানা ধরনের অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে যথাসাধ্য অন্যদের এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]।

অবশেষে আল্লাহপ্রদত্ত আল কুরআনের ভিত্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের মাধ্যমে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নিপীড়িত, শোষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের মানবাধিকার।

সামষ্টিক অধিকার সংরক্ষণে রাসূল [সা]

মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণের মাধ্যমে রাসূল [সা] মানুষের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন যেখানে মানুষের ভাত-কাপড়-বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপত্তার ছিল পূর্ণ নিশ্চয়তা। সবাই সবার কথা বলার সুযোগ পেতো। সুবিচার ও আইনের শাসন সবার জন্য ছিল সমান। বিনা বাধায় ধর্ম-কর্ম করতে পারতো সকল ধর্মের লোকেরা। কেউ অনেক সম্পদের মালিক হয়ে রাজার হালে জীবন যাপন করবে আর কেউ না খেয়ে থাকবে এটা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে কল্পনাও করা যেতো না। যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যমে তিনি সবার জন্য নিশ্চিত করেছিলেন অর্থনৈতিক অধিকার। কর্মসংস্থানে সবার ছিলো সমান অধিকার। রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাউকে দায়িত্ব প্রদান করার সময় তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতা বিচার করা হতো। নেওয়া হতো না কোন পক্ষাবলম্বন। সামষ্টিকভাবে সকল অধিকার সবার জন্যই ছিলো সমানভাবে সংরক্ষিত।

নারী অধিকার সংরক্ষণে রাসূল [সা]

তৎকালীন আরবের জাহেলী সমাজে নারীরাই ছিল সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত। অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিলো না। তাদের তো বেঁচে থাকার অধিকারই ছিলো একেবারে

www.bjilibrary.com

ক্ষীণ। ঐ সমাজে মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়াটা ছিলো বাবা-মায়ের জন্য সাংঘাতিকভাবে অপমানকর। তাই অনেক নিষ্ঠুর বাবা-মা মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে সাথে সাথেই তাকে মেরে ফেলতো বা জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতো। নারীরা ছিলো ঐ সমাজে সবচেয়ে অবহেলার পাত্র। তাদেরকে দাসী হিসেবেই জীবন যাপন করতে হতো বেশি। পুরুষরা যে যেভাবে পারতো নারীদের ওপর অত্যাচার চালাতো। পুরুষের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছিল নারীরা। সমাজ কিংবা পরিবারে তার কোন ভূমিকাই ছিলো না। ছিলো না কোন অধিকার। পিতা বা স্বামীর সম্পদে নারীর ছিলো না অংশ। রাসূল [সা] আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক পিতা ও স্বামীর সম্পদে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গেছেন। যেখানে একজন নারীর ইজ্জত-আব্রু দিনে দুপুরেও নিরাপদ ছিলো না সেখানে একজন নারী যদি গভীর রাতেও দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত করতো তাহলে তার মান-সম্মানে আঘাত করার মতো কেউ সাহস করতো না। ঘৃণ্য দাসপ্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে পরাধীন জীবন যাপন থেকে নারীসহ সকল মানুষকে মুক্ত করে গেছেন আল্লাহর রাসূল [সা]। তিনি দাস-দাসী মুক্তির জন্য সাহাবায়ে কিরামদের উৎসাহ দিয়েছেন। এটিকে তিনি সাওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি নিজেও ৬৩ জন দাসকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর এই কারণে শত শত বছর ধরে প্রচলিত দাসপ্রথা মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রীর অনুমোদন নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'একবার খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী নামক এক মহিলা রাসূলের [সা] কাছে অভিযোগ দিলেন, তার বাবা তার মতের বিপরীতে একজন পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। রাসূল [সা] ঐ বিয়ে বাতিল করে দেন।' [বুখারী ও মুসলিম] শিক্ষার ক্ষেত্রে রাসূল [সা] নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'শিক্ষা অর্জন করতে হলে প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশেও যেতে হবে, এখানে নারী কিংবা পুরুষের কথা উল্লেখ করেননি। এভাবেই রাসূল [সা] নারীর বহুবিধ অধিকার সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

প্রতিবেশির অধিকার সংরক্ষণে রাসূল [সা]

আধুনিক যুগে প্রতিবেশির প্রতি নজর দেয়া তো দূরের কথা, প্রতিবেশী কে বা কারা, তারও কোন খোঁজ-খবর রাখা হয় না। একই বাড়িতে কিংবা পাশাপাশি ফ্ল্যাট বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করলেও প্রতিবেশীর সাথে পরিচয়ই ঘটে না। একজন সচ্ছল ব্যক্তি খুব সুখ-সম্ভোগের মধ্যে জীবন যাপন করছে আর তার প্রতিবেশী খেয়ে আছে নাকি না খেয়ে আছে সে ব্যাপারে কোন খেয়ালই নেই, অথচ রাসূল [সা] প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করে না কিংবা তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে কবীরা গুনাহ করে।' অন্য হাদীসে এসেছে, জিবরীল [আ] রাসূলুল্লাহকে [সা] প্রতিবশীর ব্যাপারে অব্যাহত নসীহত করতে থাকেন। প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত তীব্র তাকিদের কারণে রাসূলুল্লাহ [সা] ধারণা করেছিলেন যে, প্রতিবেশীকে হয়তো ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হতে পারে! রাসূল [সা] অন্য আরেকটি হাদীসে বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট সেই সাথী সর্বোত্তম যে নিজ

www.bjilibrary.com

সাথীর কাছে সর্বোত্তম; আর আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম যে নিজ প্রতিবেশীর কাছে সর্বোত্তম।' [তিরমিযি] অতএব, রাসূলের এ কয়টি হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিবেশীর অধিকার প্রদান করার গুরুত্ব কত!

পিতা-মাতার অধিকারে সংরক্ষণে রাসূল [সা]

সকল মানুষই পিতা-মাতার মাধ্যমে দুনিয়াতে আসার সুযোগ পায়। পিতা-মাতা অনেক দু:খ-কষ্ট সহ্য করে সন্তান মানুষ করেন। সন্তান যখন বড় হয়ে ভুলে যায় পিতা-মাতাকে তখন বৃদ্ধ বয়সে তারা মানবেতর জীবন যাপন করেন। পিতা-মাতা বঞ্চিত হন তাদের মানবাধিকার থেকে। তাই রাসূল [সা] পিতা-মাতার অধিকারের ব্যাপারে বলেছেন, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।' রাসূলের এই একটি হাদীস দ্বারাই প্রতীয়মান হয় সন্তানের কাছে মায়ের অধিকার কতটুকু অর্থাৎ সন্তানকে ছোটবেলায় যেভাবে লালন-পালন করেছেন পিতা-মাতা, তারা যখন বৃদ্ধ হন তখন সন্তানকেও তাকিদ দেয়া হয়েছে তাদের সকল কিছুর ব্যবস্থা করার জন্য। পিতা-মাতার সাথে এমন আচরণ করা যাবে না যাতে তারা উহ্! শব্দটি পর্যন্ত করতে পারেন। পিতার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'সন্তান বাপের কোন ঋণ শোধ করতে পারে না। হ্যাঁ, কিছুটা পারে যদি নিজ বাপকে দাস হিসেবে দেখতে পায় এবং তাকে কিনে মুক্ত করে দেয়।" [মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ] একবার এক ব্যক্তি এসে রাসূলের [সা] কাছে জিহাদের যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূল [সা] বললেন, তোমার মা-বাপের মধ্যে কেউ কি জীবিত আছেন? তিনি জওয়াবে বলেন, আমার মা আছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তার আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কর। যদি তুমি তা কর, তাহলে তুমি হাজী, উমরাহ আদায়কারী ও মুজাহিদ। [আবু ইয়ালী, উত্তম সনদ সহকারে] পিতা-মাতার অধিকার তথা মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাসূলের [সা] এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত!

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণে রাসূল [সা]

আরবের জাহেলি সমাজে যেখানে স্ত্রীর কোনো অধিকারই ছিলো না, কোনো কাজেই যেখানে স্ত্রীকে মর্যাদা করা হতো না সেই সমাজেই রাসূল [সা] স্ত্রীদের সকল ধরনের অধিকার সংরক্ষণ করেছিলেন। একটি পরিবার গঠনে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেরই ভূমিকা থাকে। তাই কেউ যেন কারো প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন এই ব্যাপারেও রাসূল [সা] কথা ও কাজে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সঙ্গত কারণেই রাসূলের [সা] একাধিক স্ত্রী ছিলেন। তিনি কোন স্ত্রীর সাথেই পক্ষপাতমূলক আচরণ করেননি। তিনি সকল স্ত্রীকেই সমান অধিকার দিয়েছেন। সবার জন্য একই ধরনের পোশাক ও খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি পারিবারিক কাজে স্ত্রীদেরকে সহযোগিতা করেছেন। কখনো কোন স্ত্রীর সাথে অমানবিক আচরণ তো দূরের কথা, তাঁদের সামান্য অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমনটিও করেননি। তিনি সকল স্ত্রীর একান্ত প্রাপ্য মোহরানা আদায় করেছেন। রাসূল [সা] স্ত্রীদের সাথে সকলকে নরম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সা] বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।' রাসূল [সা] সকলকে তাকিদ

www.bjilibrary.com

দিয়েছেন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের অধিকার মোহারানা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দেয়। ইসলাম স্ত্রীর সকল খোরপোষের দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীর ওপর। রাসূল [সা] এ ব্যাপারে বলেছেন, "কোন ব্যক্তির গুনাহ্গার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাদেরকে পালন করে, তাদেরকে খোরপোষ দেয় না।" ঠিক একইভাবে আবার স্বামীর অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বামীকে প্রশান্তি দেয়া, তার সম্পদের হেফাজত করাসহ যাবতীয় অধিকারের কথা বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সা] বলেছেন, 'নারীর ওপর সর্বাধিক অধিকার কার? তিনি উত্তরে বলেন, তার স্বামীর। তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, পুরুষের ওপর সর্বাধিক অধিকার কার? তিনি উত্তর দিলেন, তার মায়ের।'

শিশু অধিকারে সংরক্ষণে রাসূল [সা]

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, একটি শিশু যে বয়সে লেখাপড়া করার কথা কিংবা খেলাধুলা করে বেড়ে ওঠার কথা ঠিক সে সময়ে তারা কঠোর পরিশ্রম করছে। আবার অনেকেই তাদের সাথে করছে অমানবিক আচরণ। তারা যে পরিমাণ কাজ করতে পারে না তার চেয়ে বেশি পরিমাণ কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। যেটা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই রাসূল [সা] বলেছেন, 'যারা ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, বড়দেরকে সম্মান করে না, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' [আবু দাউদ]

শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে রাসূল [সা]

বর্তমান যুগে শ্রমিকের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে মালিকশ্রেণীর দারুণ অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না এবং যথাসময়ে শ্রমিকের শ্রমের মূল্য পরিশোধ করা হয় না। এ ব্যাপারে রাসূল [সা] বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি আদায় করে দাও।' আবার কেউ কেউ শ্রমিককে তো মানুষই মনে করতে চায় না! তাদের সাধ্যের বেশি কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে তৈরি হয় ভেদাভেদ ও বৈষম্য। তাই রাসূল [সা] বলেছেন, 'শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকদের ওপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর।' [বুখারী ও মুসলিম] অপর আর একটি হাদীসে এসেছে, 'কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ না জানিয়ে কাউকে কাজে নিয়োগ করা ঠিক নয়।' তিনি আরো বলেছেন, 'শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানো হলে তার জন্য তাদেরকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে, এভাবে রাসূল [সা] শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে ভূমিকা রেখে গেছেন যা কিয়ামাত পর্যন্ত প্রতিটি জাতির জন্য অনুসরণীয়।

সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণে রাসূল [সা]

তৎকালীন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের সকল অধিকার ছিলো সংরক্ষিত। তারা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, জীবনের নিরাপত্তা ও সামাজিক অধিকার সবটাই পেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে রাসূল [সা] বলেছেন, 'অমুসলিমদের জীবন আমাদের জীবনের এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতোই।' জোর করে অমুসিলমদের ইসলামের

www.bjilibrary.com

দিকে ডাকতে তিনি নিষেধ করেছেন। রাসূল [সা] আরো বলেছেন, 'সতর্ক থাক, সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি অমুসলিমদের ওপর জুলুম করে অথবা তাদের হক নষ্ট করে অথবা তাদের সামর্থ্যের চাইতে বেশী কাজের বোঝা চাপাতে চেষ্টা করে অথবা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের থেকে কিছু জোরপূর্বক নেয়, আমি কিয়ামাতের দিন সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়বো।" [আবু দাউদ]

দাস-দাসী বা অধীনস্থদের অধিকার সংরক্ষণে রাসূল [সা]

দাস-দাসী বা অধীনস্থদের অধিকার সংরক্ষণে রাসূল [সা] ছিলেন খুবই সতর্ক। অধীনস্থরা যাতে মালিকের আচরণগত কারণে মনে কোন কষ্ট না পায় বা তারা যেন বৈষম্যের স্বীকার না হন এ ব্যাপারে রাসূল [সা] সতর্ক করে গেছেন। রাসূল [সা] বলেছেন, 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ যদি কাউকে কারো অধীন করেন, সে যেন নিজে যা খায় তাকেও তা খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে তাকেও তা পরায়, তাকে যেন সাধ্যের বাইরে কাজ না দেয়। যদি দেয় তাহলে ঐ কাজে যেন তাকে সাহায্য করে।' [বুখারী ও মুসলিম]

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও রাসূল [সা] সকল ক্ষেত্রেই মানবাধিকারের বিষয়টি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। এটা তিনি করতে পেরেছিলেন একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে। বর্তমানে যারা মানবাধিকারে কথা বলে মুখে ফেনা তুলছে তাদের বুঝতে হবে শুধু বিবৃতি আর হৈ চৈ করার মাধ্যমে এটি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। সকল মানুষের সকল অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য রাসূল [সা] যে পন্থাবলম্বন করেছিলেন, আজকের বিশ্বেও ঠিক সেই পন্থাবলম্বন করেই মানবাধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব। আর তা হচ্ছে কুরআন-হাদীসের আলোকে রাসূলের [সা] দেখানো ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে।■

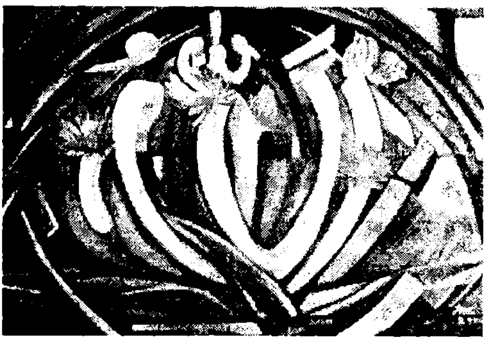

www.bjilibrary.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের

বার্ষিক প্রতিবেদন

[মে-২০০৮ - এপ্রিল ২০০৯]

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

সুস্থ ও মননশীল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার পথিকৃৎ সংগঠন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের ব্যতিক্রমী কর্মসূচিসমূহ ইতোমধ্যেই দেশে এবং বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। মিডিয়াব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও কবি আসাদ বিন হাফিজের নেতৃত্বে একদল গতিশীল সংগঠকদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এর সার্বিক কার্যক্রম। সুধী পাঠকদের জন্য সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম তুলে ধরা হল।

সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাত স্মারক ২০০৮

কবি মোশাররফ হোসেন খানের সম্পাদনায় সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ২০০৮ প্রকাশিত হয়। বিশাল কলেবরের এ স্মারক দেশের খ্যতিমান কবি, সাহিত্যিক, সংবাদিক ও বুদ্ধি জীবীদের লেখায় সমৃদ্ধ। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সীরাত স্মারক প্রতিবছরই প্রকাশিত হয়। সমকালীন বাংলা ভাষায় এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সীরাত স্মারক হিসাবে সুধী মহলে সমাদৃত। স্মারকটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় একশত পঞ্চাশ টাকা।

www.bjilibrary.com

জাতীয় কবির ১০৯তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন

২৫ মে, ২০০৮ জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১০৯তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আল মাহমুদ। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসরে বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি আল মুজাহিদী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী জনাব মো: আবেদুর রহমান। বক্তব্য রাখেন কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি হাসান আলীম, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, শিল্পী শরীফ বায়জীদ মাহমুদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবি আল মাহমুদ বলেন, কাজী নজরুল ইসলামের মত কেউ নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কথা বলেননি। নজরুলের কাজের জন্যই যুগ যুগ ধরে তাকে মনে রাখতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কবি আল মুজাহিদী বলেন, নজরুল ঘুম ভাঙানির গান শুনিয়েছেন। শেকল ভাঙার জন্য নিপীড়িত মানুষকে ডাক দিয়েছেন। দেশের এই দুঃসময়ে আসুন আমরা নজরুলের আহবানে জেগে উঠি। অনুষ্ঠানে জাতীয় কবিকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন এক ঝাঁক নবীন-প্রবীণ কবি।

মুসলিম ওয়ার্ল্ডলীগের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে যোগ দিতে কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুরের সৌদি আরব গমন

বিশিষ্ট মিডিয়াব্যক্তিত্ব, বেতার-টিভির সংবাদপাঠক, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ১লা জুন ২০০৮ সৌদি আরবে যান।

কনফারেন্স হলে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

www.bjilibrary.com

তিনি মুসলিম ওয়ার্ল্ডলীগের আমন্ত্রণে ৪, ৫ ও ৬ জুন ২০০৮ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্সে যোগ দেন। এতে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের তিনশতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন এই কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম সৌদী বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ।

কবি ফররুখ আহমদের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালন

১০জুন, ২০০৮ মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত কবি ফররুখ আহমদের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আল মাহমুদ। কেন্দ্রের

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ

সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ড. সদরুদ্দিন আহমদ ও কবি আল মুজাহিদী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী জনাব মো: আবেদুর রহমান। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, কবি সৈয়দ রফিক, কবি মাহবুবুল হক, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি হাসান আলীম, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবি আল মাহমুদ বলেন, কবি ফররুখ আহমদ সত্য ও সুন্দরের সাধক ছিলেন। কোন লোভ লালসা, ভয়ভীতি তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিত এক খাঁটি ঈমানদার কবি। তিনি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন মানবজাতির মুক্তির সনদ ইসলামী দর্শনের আলোকে।

www.bjilibrary.com

ফররুখ আহমদের গান পরিবেশন করেন শিল্পী আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী। উক্ত অনুষ্ঠানে ফররুখ আহমদকে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন একঝাঁক নবীন-প্রবীণ কবি। কবির লেখা শ্রুতি নাটিকা "চোরাইযাত্রায়" অংশ নেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, শাহজাহান কবির, নেছার উদ্দিন ও আহসান হাবীব খান।

১০ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৮

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বিগত ১৫জুন রবিবার, বিকাল সাড়ে তিনটায় শিল্পকলা একাডেমী গ্যালারীতে ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। দেশের ৩৬ জন নবীন-প্রবীণ শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি এতে প্রদর্শনীতে স্থান পায়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব ভুইয়া সফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশানের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. আব্দুস সাত্তার, বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও শিল্প সমালোচক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রদর্শনী কমিটির আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। অনুষ্ঠাটির উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

ক্যালিগ্রাফি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ

প্রদর্শনীতে যে সব নবীন-প্রবীণ শিল্পী অংশ নিয়েছেন তারা হলেন : শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী এনায়েত হোসেন, শিল্পী সবিহ-উল-আলম, শিল্পী মো: বশির উল্লাহ, শিল্পী অধ্যাপক মীর মো: রেজাউল করীম, শিল্পী রাশা, শিল্পী ফরেজ আলী, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী জাহাঙ্গীর হোসেন, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী খন্দকার মুনিরুজ্জামান, শিল্পী আমিরুল হক

www.bjilibrary.com

এমরুল, শিল্পী নাসির উদ্দীন আহমেদ খান, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী ফেরদৌস আরা আহমেদ, শিল্পী মুস্তাফা আল মারুফ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী ফেরদৌস বেগম, শিল্পী শর্মিলা কাদের , শিল্পী জামিল হামিদী, শিল্পী মোঃ আব্দুল্লাহ, শিল্পী মোরশেদুল আলম, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী কামাল আহমেদ, শিল্পী আজিজুর রহমান তালুকদার, শিল্পী হাসনাইন, শিল্পী আতাউর রহমান, শিল্পী তৌফিকুর রহমান, শিল্পী জুয়েল আহমেদ, শিল্পী মাহফুজার রহমান, শিল্পী বাচ্চু ধর পাল, শিল্পী আব্দুল্লাহ আল মামুন, শিল্পী মহিউদ্দিন আহমেদ ও শিল্পী নাহিদ রোকসানা।

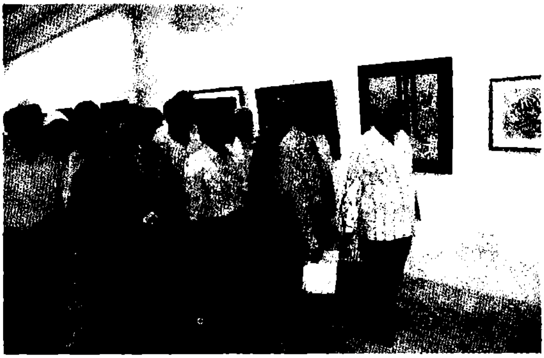

প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

মাদ্রিদের আন্তঃধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের স্পেন গমন

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর মুসলিম ওয়ার্ল্ডলীগের আমন্ত্রণে ১৬-১৮ জুলাই অনুষ্ঠেয় মাদ্রিদ আন্তঃধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। এই কনফারেন্সে ইসলাম, খ্রীষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট পন্ডিতগণ অংশ নেন, বিগত ৪, ৫ ও ৬ জুন ২০০৮ হয়ে যাওয়া মক্কা সম্মেলনের ফলোআপ প্রোগ্রাম হচ্ছে মাদ্রিদ সম্মেলন। সৌদী বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ এর উদ্বোধন করেন।

নাবিকের ঈদের কবিতা পাঠ

দীর্ঘ ত্রিশ দিন সিয়াম সাধনার পর আমাদের মাঝে ফিরে আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ আমাদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসে ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী ঐতিহ্যের অমলিন শিক্ষা। সৃজনশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগী সংগঠন নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ঈদ উৎসবকে আরো উজ্জল ও উচ্চকিত করার প্রয়াসে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ রাজধানীর রমনা থাই এন্ড চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আয়োজন করে ঈদের কবিতা পাঠ, গান ও ইফতার মাহফিলের।

www.bjilibrary.com

নাবিকের সভাপতি ইবরাহীম বাহারীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী নাজমুস

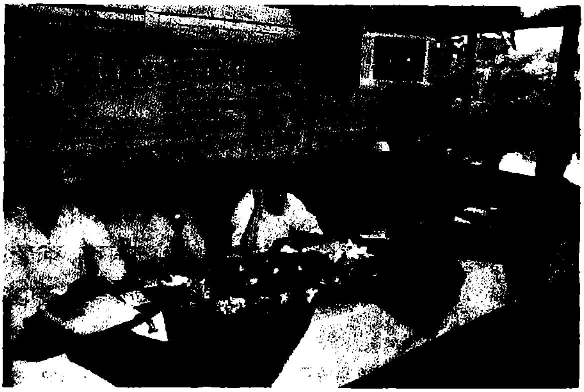

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সায়াদাতের পরিচালানায় জমজমাট এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন দেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। বিশেষ অতিথি কবি আল মুজাহিদী, কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি আসাদ বিন হাফিজ, সাংস্কৃতিক সংগঠক মো: আবেদুর রহমান, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, কবি হাসান আলীম, কবি মোশাররফ হোসেন খান প্রমুখ।

কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন কবি খালীদ শাহাদাৎ হোসেন, কবি আফসার নিজাম, কবি রেদওয়ানুল হক, কবি আবদুল কুদ্দস ফরিদী, কবি গোলাম নবী পান্না, আশরাফুল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী মশিউর রহমান লিটন।

অনুষ্ঠানে কবি আল মাহমুদ বলেন, রমজান মাস হচ্ছে সৃজনশীলতার মাস। এ মাসে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অনেক উল্লেখযোগ্য সৃজনশীল কাজ হয়েছে। অনেক কবি এ মাসে সৃজনশীল কবিতা ও গান সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরো বলেন, কবিতার একটি আদর্শ থাকতে হয়। আদর্শ না থাকলে যে কবিতা হয় না, তা আমি বলছি না। তবে কবিরা যদি আদর্শের একটি শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড়াতে পারেন তাহলে সেটা তাদের সৃজনশীলতার জন্য কল্যাণকর।

সহযোগী সংগঠন সাংস্কৃতিক ঐক্য ফ্রন্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠান

৩১ অক্টোবর ২০০৮ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টায় মগবাজার আল ফালাহ্‌ মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক ঐক্য ফ্রন্টের উগ্যোগে রাজনীতিতে সহিংসতা-সহনশীলতা শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ডকুমেন্টারী প্রদশনীর আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে

www.bjilibrary.com

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা জনাব মাহমুদুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক জালানী উপদেষ্টা জনাব মাহমুদুর রহমান

শওকত মাহমুদ। দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন কথাশিল্পী মাহবুবুল হক, ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক ঐক্য ফ্রন্টের আহবায়ক কবি আসাদ বিন হাফিজ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফ্রন্টের সদস্য সচিব জনাব মোঃ আবেদুর রহমান।

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিজয় দিবস পালিত

১৬ ডিসেম্বর ২০০৮ বিকাল ৪টায় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদ, বিশেষ অতিথি

বক্তব্য রাখছেন কবি আবদুল হাই শিকদার

www.bjilibrary.com

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, কলাশিল্পী মাহবুবুল হক, কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি হাসান আলীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কবি আসাদ বিন হাফিজ। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি ইব্রাহীম মন্ডল, কবি মনসুর আজিজ, ছড়াকার নুরুজ্জামান ফিরোজ, কবি মুর্শিদ- উল- আলম, কবি শেখ রোমা, কবি প্রহরী মনিরুজ্জামান, কবি নূর আল ইসলাম, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি আফসার নিজাম, কবি রেদওয়ানুল হক প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক ঐক্য ফ্রন্টের উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক

করিডোর, টাস্কফোর্স সবকিছুতেই ভারতের লক্ষ্য আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার। ভারত যে একটি আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র তা বলার

গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

অপেক্ষা রাখে না, ভারতের সাথে এসব চুক্তি করে খাল কেটে কুমির ডেকে আনা আমাদের ঠিক হবে না। যে দেশটি আমাদের পানি বন্ধ করে দেয় সে আমাদের বন্ধু হতে পারে না। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট আয়োজিত করিডোর, টাস্কফোর্স, টিফাচুক্তি ও জাতীয় ঐক্য: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকগণ

www.bjilibrary.com

এ কথা বলেন। সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা ও আমার দেশ পাবলিকেশন্স এর চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব, বিশিষ্ট রাষ্ট্রচিন্তাবিদ মোহাম্মদ আসফউদ্দোলাহ। গোলটেবিল বৈঠকের মডারেটররেরর দায়িত্বে ছিলেন সাংস্কৃতিক ঐক্য ফ্রন্টের আহবায়ক কবি আসাদ বিন হাফিজ।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. মাহবুব উল্লাহ, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট সাদেক খান, দৈনিক আমার দেশের সাবেক সম্পাদক, কলামিস্ট আমানুল্লাহ কবীর, দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ, ডেইলি নিউনেশনের সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, কবি আল মুজাহিদী, প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, নজরুল ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক কবি আবদুল হাই শিকদার, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট শাহ আহমদ রেজা, সেন্টার ফর ন্যাশনাল কালচারের পরিচালক মাহবুবুল হক প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সচিব রাষ্ট্র চিন্তাবিদ মোহাম্মদ আসফউদ্দৌলাহ বলেন, ভারতের সাথে এসব চুক্তি করে খাল কেটে কুমির আনা আমাদের ঠিক হবে না। যে দেশ আমার দেশের পানি বন্ধ করে দেয় সে দেশ আমার বন্ধু হতে হতে পারে না। দুর্বলদের স্থান আর বাংলাদেশে নেই, সবলভাবেই বেঁচে থাকতে হবে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. মাহবুবু উল্লাহ বলেন, ভারত যে একটি আধিপত্যবাদী রাষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। '৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে আমাদের পক্ষে আজকের বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব ছিল না, একটা জাতি যতই ক্ষুদ্র হোক সে জাতি যদি তাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে তাহলে সে জাতি কখনো পরাজিত হতে পারে না। সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান বলেন, যা জাতীয় ঐক্যকে আঘাত করে তা জাতির জন্য কলাণে আসতে পারে না। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট সাদেক খান বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলছে তা প্রতিহত করতে হবে। দৈনিক আমার দেশের সাবেক সম্পাদক আমানুল্লাহ কবির বলেন, জে মইন উ আহমদের বইয়ের লেখা পড়ে বুঝা যায় জাতিসংঘের এক কর্মকর্তার ফোনে ১/১১ ঘটানো হয়েছিল। এতে বুঝা যায়, আমাদের আর্মি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই।

www.bjilibrary.com

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ বলেন, আমাদের দেশে একশ্রেণীর পরগাছার জন্ম হয়েছে। এই পরগাছারাই দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ডেইলি নিউনেশনের সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার বলেন, আপনারা বাংলাদেশের সরকার। বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করুন। কবি আল মুজাহিদী বলেন, বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য আমাদেরকে শক্তির ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কবি আবদুল হাই শিকদার বলেন, অখন্ড ভারত ও বাংলাদেশ একে অপরের প্রতিপক্ষ। ১৯৭৩ সালের বুদ্ধিজীবীদের কথা মতো চললে বাংলাদেশের স্বাধীনতা থাকবে না।

আশির দশক: নির্বাচিত কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ

কবি হাসান আলীমের সম্পাদনায় আশির দশকের আটান্ন জন খ্যাতিমান কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাদের কবিতা নিয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ প্রকাশিত হয়েছে আশির দশকের নির্বাচিত কবিতা। শিল্পী মোমিনউদ্দিন খালেদের চমৎকার প্রচ্ছদে অলংকৃত এই গ্রন্থটির মূল্য রাখা হয়েছে পাঁচশত টাকা।

ভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভায় বাংলা ভাষার প্রধান কবি আল মাহমুদ বলেন, বাংলা ভাষা আমাদের ভাষা। এ ভাষার উৎকর্ষ সাধন করার দায়িত্ব আমাদের। আমরা যারা বাংলা ভাষাকে ভালবাসি তাদের দায়িত্ব, ভাষার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের কারিগর কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করা। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাহিত্য

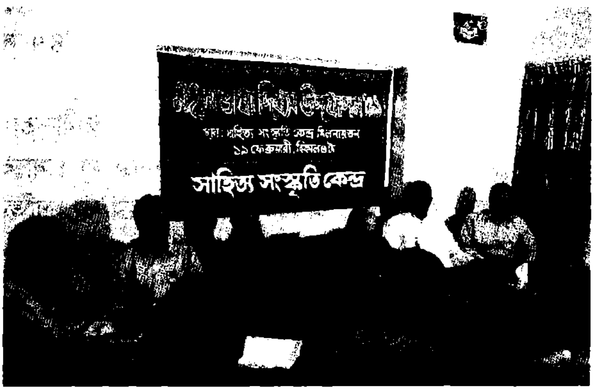

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

www.bjilibrary.com

সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, অধ্যাপক সিরাজ উদ্দীন, কবি হাসান আলীম, কবি নাসির হেলাল প্রমুখ।

চতুর্থ হামদ-নাত কবিতা সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

যে নবী মসজিদে নববীতে কবিতা পাঠের আসর জমাতেন তাঁর অনুসারীরাই হতে পারে শিল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। ১০ মার্চ ২০০৯ বিকাল চারটায় পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে হোটেল পূর্বাণীতে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের

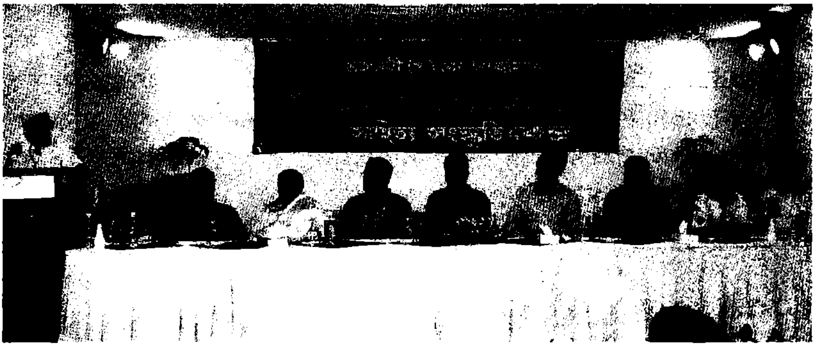

হোটেল পূর্বানীতে ৪র্থ হামদ, নাথ, কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ

উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চতুর্থ হামদ-নাত কবিতা সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণে বরেণ্য কবি আল মাহমুদ এ কথা বলেন। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মনোরম কবিতা সন্ধ্যায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি আসাদ চৌধুরী, কবি কে জি মুস্তফা ও কবি আল মুজাহিদী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চতুর্থ হামদ-নাত কবিতা সন্ধ্যা উদ্‌যাপন কমিটির আহবায়ক ও কেন্দ্রের সাহিত্য সম্পাদক কবি হাসান আলীম। কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের পরিচালনায় রাসূলকে (সা) নিবেদিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি কে জি মুস্তফা, কবি আল মুজাহিদী, কবি আসাদ চৌধুরী, কবি সৈয়দ মাহবুব, কবি এরশাদ মজুমদার, কবি মাহবুবুল হক, কবি জাহাঙ্গীর ফিরোজ, কবি পান্না চৌধুরী, কবি তাহমিদুল ইসলাম, ছড়াকার আবু সালেহ, ছড়াকার সাজজাদ হোসাইন খান, কবি মসউদ-উশ-শহীদ, কবি ফেরদৌস সালাম, কবি আশরাফ আল দীন, কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন, কবি মোশারফ হোসেন খান, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি নাসির

www.bjilibrary.com

হেলাল, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি ইব্রাহীম মন্ডল, কবি খালীদ শাহাদাৎ হোসেন, কবি শাহীন রেজা , ছড়াকার আহমেদ কায়সার, কবি আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, কবি মুজতাহিদ ফারুকী, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, কবি গোলাম নবী পান্না, কবি শফিকুর রহমান রঞ্জু, কবি আহমদ আখতার, কবি আবু তাহের বেলাল, কবি জামালউদ্দিন বারী, কবি নূর আল ইসলাম, কবি তৌফিক জহুর, ছড়াকার নূরুজ্জামান ফিরোজ, কবি বিপ্লব ফারুক, কবি আলফ্রেড যোশেফ, কবি মুর্শিদ উল আলম, কবি সৈয়দ সাইফুল্লাহ শিহাব, কবি রফিক মোহাম্মদ, কবি মতিউর রহমান মনির, কবি শহীদ সিরাজী, কবি সামুয়েল মল্লিক, কবি হারুন ইবনে শাহাদাত, কবি জামশেদ ওয়াজেদ, কবি ওমর বিশ্বাস, কবি নজরুল ইসলাম শান্ত, কবি রফিকুল ইসলাম ফারুকী, কবি হুসাইন আল জাওয়াদ, কবি নাজমুস সায়াদাত, কবি কামরুজ্জামান, কবি মজিবুর রহমান মঞ্জু, কবি আমিনুল ইসলাম, কবি মনসুর আজিজ, কবি মালেক মাহমুদ, কবি খালিদ সাইফ, কবি জানে আলম, কবি আল হাফিজ, কবি আহমদ বাসির, কবি রেদওয়ানুল হক, কবি মঈন মুরসালিন, কবি আফসার নিজাম, কবি আনোয়ারুল কাইয়ূম কাজল, কবি হারুন আল রাশিদ, কবি শরীফ শাহজালাল, কবি স ম শামসুল ইসলাম, কবি শাহ মোহাম্মদ মোশাহিদ প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে না'তে রাসূল পরিবেশন করছেন শিল্পী খালিদ হোসেন

অনুষ্ঠানে রাসূলকে (সা) নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, মোস্তাগিছুর রহমান ও আহসান হাবীব খান । সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী খালিদ হোসেন, ইয়াকুব আলী খান ও মহানগর এবং উত্তরা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের শিল্পীবৃন্দ ।

www.bjilibrary.com

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

২৬শে মার্চ, ২০০৯ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসরে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আল মাহমুদ।

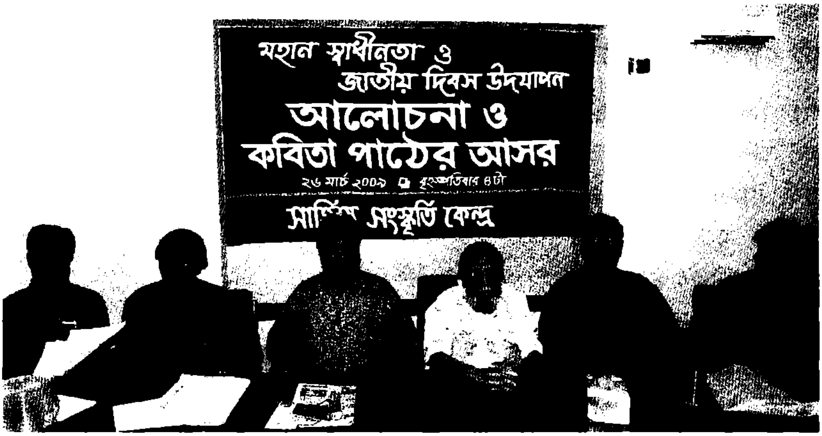

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কবি আল মুজাহিদী, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন কবি হাসান আলীম, জনাব নাসির হেলাল, জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন কবি আমিনুল ইসলাম, কবি হারুন ইবনে শাহাদাত, কবি ইব্রাহীম মন্ডল, কবি নাজমুস সায়াদাত, কবি গোলাম রব্বানী খান, কবি সোহরাব আসাদ ও আবদুল হাদীসহ প্রায় অর্ধশত কবি।

নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

২৯ মার্চ, ২০০৯ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগী প্রতিষ্ঠান নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র মিলনায়তনে সংসদের কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের প্রকাশিত নতুন বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের সভাপতি ইবরাহীম বাহারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কবি হাসান আলীম, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, কবি হারুন ইবনে শাহাদাত, কবি কামরুজ্জামান, কবি আল হাফিজ, মুহাম্মাদ রফিকুল

www.bjilibrary.com

ইসলাম প্রমুখ।

কবি আসাদ বিন হাফিজ বলেন, সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে নবীন সাহিত্যিকদের আরো বেশি এগিয়ে আসতে হবে। তাদের সৃষ্টিতে যতবেশি মেধা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর থাকবে আমাদের সাহিত্য ভান্ডারও ততবেশি সমৃদ্ধ হবে।

অনুষ্ঠানে আবু বকর সিদ্দিকী, কবি সোহরাব আসাদ ও কবি নাজমুস সায়াদাতের ৪টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের উদ্যোগে নানান আয়োজনে বর্ষবরণ

কবি আল মুজাহিদী বলেন, বাংলাদেশ আমাদের দেশ। এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে কেউ নষ্ট করতে পারবে না। এই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষায় প্রয়োজনে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে আমরা কুণ্ঠিত হবো না।

নববর্ষ ১৪১৬ বর্নাঢ্য র‍্যালীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাংস্কৃতিক ঐক্য ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ

তিনি ১৪ এপ্রিল ২০০৯ ১লা বৈশাখ রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট আয়োজিত বাংলানববর্ষ ১৪১৬ বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। ৩০টি সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত সাংস্কৃতিক ঐক্য ফ্রন্টের এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন ফ্রন্টের আহবায়ক কবি আসাদ বিন হাফিজ। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি আল মুজাহিদী। বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক সংগঠক অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, জনাব মোঃ আবেদুর রহমান, জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, জনাব শরীফ আবদুল গোফরান, সসাসের আহবায়ক জনাব সোহেল খান প্রমুখ। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে নববর্ষের গান, পথনাটক, কৌতুক, গম্ভীরা, আলোচনা সভা ও আবহমান বাংলার ঐতিহ্যকে ধারণ করে

www.bjilibrary.com

শোভাযাত্রা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখে সাইমুম শিল্পগোষ্ঠী, প্রবাহ, নিমন্ত্রণ, অনুপম, সন্দীপন, টুনটুনিদের আসরসহ ৩০টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ।

নববর্ষ ১৪১৬ উপলক্ষ্যে রমনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছে শিশুকিশোর শিল্পীরা

অর্থ সম্পাদক ও প্রচার সম্পাদকের নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম

বিগত ২৫ এপ্রিল সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে অর্থ ও প্রচার সম্পাদকদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের অর্থ সম্পাদক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এবং প্রচার সম্পাদক হারুন ইবনে শাহাদাতের উপস্থাপনায় এ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর কর্মশালায় বিভিন্ন শাখা সংগঠনের প্রায় ৩০ জন প্রচার ও অর্থ সম্পাদক এবং ইউনিট দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন জোন-১ এর সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, জোন-৩ এর সভাপতি কবি হাসান আলীম, জোন-৬ এর সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং জোন-২ এর সেক্রেটারী গীতিকার মোঃ আমিনুল ইসলাম।

শেষ কথা

এছাড়াও ক্যালিগ্রাফি ও কার্টুন প্রশিক্ষণ, ছোটদের গান শেখানোসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ, সাহিত্য সভা ও নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র।

www.bjilibrary.com

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

নয়া দিগন্ত

The Daily Naya Diganta, ঢাকা, সোমবার, ২৪ ভাদ্র ১৪১৫, ৭ রমজান ১৪২৯, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮

অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে জাতিসত্তা বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে

অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে জাতিসত্তা বিলীন

আমার দেশ

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের আলোচনা

সৎ সমাজ তৈরিতে সংস্কৃতিসেবীদের এগিয়ে আসতে হবে : নিজামী

www.bjilibrary.com

ঢাকা, শুক্রবার, ১১ আশ্বিন ১৪১৫, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮ নয়া দিগন্ত ৩

সম্প্রতি বনলা থাই অ্যান্ড চাইনিজ রেস্টুরেন্টে নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ঢাকা আয়োজিত ঈদের কবিতা পাঠ ও ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন কবি আল মাহমুদ — নয়া দিগন্ত

নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের ইফতার মাহফিল

নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ঢাকার উদ্যোগে সম্প্রতি বনলা থাই অ্যান্ড চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঈদের কবিতা পাঠ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংসদের সভাপতি ইবরাহীম বাহারির সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আল মাহমুদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি আল মুজাহিদী, কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি সোলায়মান আহসান, সাঈ হাসান আজীম, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি।

সোনার বাংলা

ঢাকা ॥ শুক্রবার ॥ ১১ আশ্বিন ১৪১৫ ॥ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮

আসাদ বিন হাফিজ

সুখ নগরের পথে

মনে করো, বিশ্বসমুদ্রে ভাসমান এক নৌযানের নাম বাংলাদেশ।
জন্মের পর থেকে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলেছে
সুখ নগরের পথে। স্বজনপ্রীতি স্বৈরাচার ও দুর্বৃত্তায়নের ঢেউ-
এর গতি বারবার রুদ্ধ করতে চাইলেও স্তব্ধ করতে পারেনি
অনিবার্য অগ্রযাত্রা। বরং গণতন্ত্রের মুক্ত হাওয়ায় তার সমৃদ্ধির
ডালপালা সগর্বে পাখা মেলেছে আকাশে। সম্পদের প্রবৃদ্ধি সাথে
আবিষ্কৃত হলো তেল, গ্যাস, কয়লা ও সোনার খনি।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির মত নব্য বণিকের চোখে চকচকে লোভ
সেই লোভের ঝড়ে একদিন টালমাটাল হলো বাংলাদেশ।
দূর নিয়ন্ত্রিত রিমোটের বোতামে কার যেন হাত
রাজনীতিবিদদের নাকের আগায় ঝুলছে মুলো
এভাবেই আত্মাবহ ষড়যন্ত্রকারীরা বন্দুকের নলের মুখে
মাঝিদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে তুলে নিল বাংলাদেশ।
বিপদের জল ঢুকলো জলযানে। মৃত্যুর হিম শীতল আতংক
গ্রাস করলো যাত্রীদের ডুবন্ত নায়ে রোল উঠলো কান্নার।

কিন্তু এই যাত্রীদের কে বলবে-বিপদে কান্না কোন সমাধান নয়?
কে বলবে- নৌযান ডুবে গেলে কারোরই বাঁচার সম্ভাবনা নেই?
কে বলবে-এ সময় জ্ঞান মানুষের মত নির্বাক দর্শক হলে
কেউ তাদের মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না। কে বলবে-একদল
আনাড়ি ডাকাতের হাতে এর নিয়ন্ত্রণভার থাকলে
যে কোন সময় সব যাত্রীসুদ্ধ নৌযানটি ডুবে যেতে পারে গভীর সমুদ্রে?

আফসোস। আমাদের রাজনীতিবিদদের অনেকে কেবল দুর্নীতিবাজ নয়
আহাম্মকও। এ সব ষড়যন্ত্রের কিছুই তারা টের পায় না।
সিগারেটের ধোঁয়ার মত অবলীলায় উড়ে যায় নিষ্ফলা বিপন্ন সময়।
আর জনগণ ভয় ও আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে-কই হে মাঝি ভাই
ওঠো জাগো। আবার নতুন করে হাল তুলে নাও হাতে।
বদর বদর বলে আবার উঠাও পাল। আবার নোঙর তোল।
আবার ছুটাও নাও সুখ নগরের পথে।

www.bjilibrary.com

গতকাল রোববার স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমযানের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন জামায়াতের আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী -সংগ্রাম

অপসংস্কৃতির আগ্রাসন মোকাবিলায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে --- মাওলানা নিজামী

৮-১০-০৫

স্টাফ রিপোর্টার জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের মাধ্যমে জাতিসত্তা বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। পারিবারিক ব্যবস্থা বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। নৈতিক অবক্ষয়ে গোটা জাতির মধ্যে বিপর্যয় নেমে আসছে। এক্ষেত্রে গোটা জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে কলম সৈনিকরাই। তিনি আকাশ সংস্কৃতি ও প্রতিবেশী দেশের আগ্রাসী সংস্কৃতির ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য সাহিত্য সংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। গতকাল রোববার রাজধানীর রমনা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমযানের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা প্রকৌশলী মাহমুদুর রহমান, এডভোকেট আহমদ আজম খান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত মাহমুদ, ইতিহাসবিদ (২-এর পাতায় ৪-এর কলাম)

চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্য

অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে

(১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ পর)

ও ব্যাংকার মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জু, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের সাবেক পরিচালক কজলে রাব্বী, সাপ্তাহিক সোনার বাংলার প্রতিষ্ঠাতা মহিউদ্দিন আহমদ, দৈনিক সংগ্রামের সহকারী সম্পাদক জয়নুল আবেদীন আজাদ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুবুল হক, কবি আবদুল হাই শিকদার, প্রফেসর সিরাজ উদ্দিন, শরীফ বায়জিদ মাহমুদ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আর এ গনি, নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুস শহীদ, সাধারণ সম্পাদক বাকের হোসাইন, কবি আল মুজাহিদী, কলামিস্ট ড. তারেক শামসুর রহমান, দিগন্ত টেলিভিশনের নির্বাহী পরিচালক একেএম হানিফ, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান পিআইবি'র সাবেক মহাপরিচালক ড. রেজওয়ান সিদ্দিকী, প্রবীণ সাংবাদিক মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, কবি নাসির হেলাল, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি হাসান আলীম, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, কবি শরীফ আবদুল গোফরান প্রমুখ।

মাওলানা নিজামী তার বক্তব্যে বলেন, কুরআনের ভাষায় মুসলমানরা মধ্যপন্থী জাতি। আল্লাহর নির্দেশে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার অনুসরণ যোগ্য জাতি গঠন করেছেন রাসূল (সা:)। তিনি বলেন, ইসলামী জীবনাদর্শের বুনিয়াদ ৫টি। তার সর্বপ্রধান বুনিয়াদ ঈমান। এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ। ঈমানের পর এই ৪টি মৌলিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদতকে ইসলামের বুনিয়াদ বলা হয়। তিনি বলেন, ইসলাম মানুষের সমাজকে পরিচ্ছন্ন সমাজে পরিণত করতে চায়। ইসলামী অনুশাসনের গোটা দিক মানুষকে কেন্দ্র করে। তিনি উল্লেখ করেন, কুরআনের জন্যই রমযান মাসকে মহিমান্বিত মাস বলেছে। তিনি বলেন, কুরআনের মূল বিষয়বস্তু মানুষ। গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের সমাজকে পূতঃপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার স্বার্থে যে ব্যবস্থা প্রয়োজন, নবী রসূলদের মাধ্যমে তা ... বিশ্বে শোষণমুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলাম দিতে পেরেছে। আমাদের দেশেও অনেক ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং ইসলামী উইন্ডো খুলছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে ইসলামী শক্তি ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে হলেও, ইসলামী শক্তি বিকল্প হতে পারে এ চিন্তার যাত্রা শুরু হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, এই দুই অঙ্গনে ইসলামী স্বকীয় শক্তি দাঁড়িয়ে যেতে পারলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আপোষ করতে হবে কেন? তিনি বলেন, যারা গোলাম বানাতে চায় তারাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। তিনি আকাশ সংস্কৃতি ও প্রতিবেশী দেশের আগ্রাসী সংস্কৃতির ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য সাহিত্য সংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মাহমুদুর রহমান বলেন, আজো আমাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চরিত্রের ভিত্তিতে ইউনিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। এতে বাইরের ষড়যন্ত্র যতটা না আছে, তার চেয়ে আমাদের ব্যর্থতাও কম নয়। তিনি বলেন, এক সময় বাংলার রাজধানী বলা হতো কোলকাতাকে। এখন সেখান থেকে বাংলা বিদায় নিচ্ছে। বাংলা আসলে টিকে থাকবে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশেই। বাংলার রাজধানী এখন কোলকাতা নয়, বাংলাদেশ। তিনি দেশ বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরে বলেন, আমাদের হীনমন্য জাতি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। যেন নিজেরা নিজেদের শাসন করতে অক্ষম হয়ে, এক সময়ে অন্য দেশের সাথে বিলীন হয়ে যেতে পারি। এ জন্যই উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তিনি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবিলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কান্দাহারে আত্মঘাতী হামলায় ৮ জন নিহত

কান্দাহার থেকে রিবিসি : আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় নগরী কান্দাহারের একটি পুলিশ স্টেশনে রোববার পরপর দুটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় ...

www.bjilibrary.com

যে কোন মূল্যে ১৮ ডিসেম্বরের নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র রুখতে হবে

মাহমুদুর রহমান

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র রুখতে হবে

আমার দেশ

মহানগর ও অন্যান্য ৩

'রাজনীতিতে সহিংসতা ও সহনশীলতা' শীর্ষক আলোচনাসভা

নির্বাচন কমিশন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে

১১

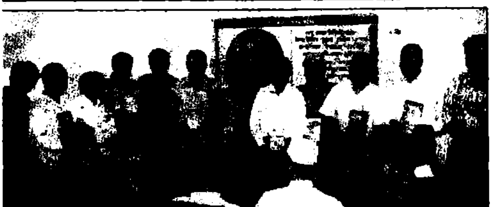

নাবিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

www.bjilibrary.com

নয়া দিগন্ত
ঢাকা, শনিবার ৯ ফাল্গুন ১৪১৫
২৪ সফর ১৪৩০
২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
The Daily Naya Diganta

সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা
ভারতকে ট্রানজিট দেয়া আর খাল কেটে কুমির আনা একই কথা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারতকে ট্রানজিট দিয়ে খাল কেটে কুমির না আনার পরামর্শ দিয়েছেন 'করিডর, টাস্কফোর্স, টিফা চুক্তি ও জাতীয় ঐক্য : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের বক্তারা। বক্তারা বলেছেন, যে ভারত বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারার জন্য ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করতে পারে, তারা আমাদের বন্ধু হতে পারে না। কোনো স্বাধীন দেশ ট্রানজিট দিতে পারে না। গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সচিব আসাফউদ্দৌলা। তিনি বলেন, ট্রানজিট কিছুতেই দেয়া যাবে না তবে ট্রানশিপমেন্ট হতে পারে। তিনি বলেন, আর নীরবে থাকা যায় না। এবার সময় এসেছে রুখে দাঁড়ানোর। এ সময়ে দেশবাসীর ঐক্য কামনা করে তিনি বলেন, 'এ ঐক্যে তরুণসমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে।' গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট কলামিস্ট ডা. জাহেদুল সাদেক খান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ, দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক আমানুল্লাহ কবির, নিউনেশন সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নাসির আল মুজাহিদী, সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান, সাংবাদিক ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, বিশিষ্ট ■ ১৭ পৃ: ৭-এর কলামে

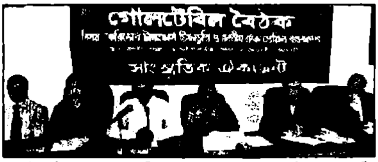

সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'করিডর, টাস্কফোর্স, টিফা চুক্তি ও জাতীয় ঐক্য : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ■ নয়া দিগন্ত

ইসিআর ব্যবহারে উৎসাহ নেই : দেড় মাসে ২৬ শতাংশ চালু

আশরাফুল ইসলাম

ইলেকট্রনিকস ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর) ব্যবহারে উৎসাহ নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) গত ১ জানুয়ারি থেকে রাজধানী ঢাকাসহ সব বিভাগীয় শহরে এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু এনবিআর'র এ নির্দেশনা মানতে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। গত দেড় মাসে সারাদেশে এনবিআর'র লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৬ শতাংশ ইসিআর ব্যবহার হয়েছে। এনবিআর কর্মকর্তারা এ বিষয়ে শিগগিরই অভিযানে নামবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

জানা গেছে, করফাঁকি বন্ধ ও মূল্যসংযোজন কর আদায়ে স্বচ্ছতা আনতে ইসিআর প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়। সাধারণত ভোক্তারা কেনাকাটা ও সেবা নেয়ার সময় নির্ধারিত হারে কর দিয়ে থাকেন। অভিযোগ রয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভোক্তাদের দেয়া এই সব কর সরকারের কোষাগারে জমা হয় না। এর একটি অংশ চলে যায় সংশ্লিষ্ট আদায়কারী ■ ১৭ পৃ: ৭-এর কলামে

ভারতকে ট্রানজিট দেয়া আর খাল

শেষ পৃষ্ঠার পর

কবি আব্দুল হাই শিকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কবি আসাদ বিন হাফিজ।

মাহমুদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বানাতে আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় একটি প্রচারণা চলছে জোরেশোরে যেন বাংলাদেশকে ভারতের সাথে মিশিয়ে দেয়া যায়। তিনি বলেন, সময় এসেছে মাঠে নেমে লড়াই করার। মাহমুদুর রহমান বিএনপি ও জামায়াতের সমালোচনা করে বলেন, বাংলাদেশের চার দিকে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া জরুরি বলে বিবিসি'র অপপ্রচার চললেও, তার প্রতিবাদে দল দুটো কোনো কথাই বলেনি। তিনি বলেন, বিবিসি'র প্রচারণার পুরোটাই ছিল বাংলাদেশবিরোধী। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ মানেই ইসলাম বলে বুশ ডকট্রিনে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ হাসিনা গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে দেশে ফেরার আগে রিচার্ড বাউচারের সাথে দীর্ঘ বৈঠক শেষে ঘোষণা দিয়ে এসেছেন তিনি (শেখ হাসিনা) বুশ ডকট্রিনের সাথে একমত। শাহ আব্দুল হান্নান বলেন, টিফা, ট্রানজিট, করিডর নিয়ে এত তাড়াহুড়া করা হচ্ছে কেন। আমি সরকারকে বলব— যা কিছুই করতে চান সংসদে আলোচনা করে করুন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মন্ত্রীরা অপরিপক্ব। ছেলেমানুষি কথা বলছেন বেশি।

সাদেক খান বলেন, স্বাধীনতা বাংলাদেশ হয়ে ভারতে যাচ্ছে— এই বলে অপপ্রচার চালিয়ে ভারত বাংলাদেশকে পদানত করে রাখতে চায়। টিকে থাকার জন্যই ভারত এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। ড. মাহবুব উল্লাহ বলেন, প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত সহযোগিতা করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা বাংলাদেশকে ভারতের সাথে এক করে ফেলতে চায়। এ জন্যই ট্রানজিট ইস্যু তোলা হয়েছে। তিনি বলেন, আদর্শগতভাবে ভিন্ন মতকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভারত এ দেশে পয়সা ঢালছে এবং পরগাছা শ্রেণী তৈরি করছে। তিনি বলেন, আদর্শিক ও শক্তিশালী মনোবলের রাজনীতি গড়ে তুলতে পারলেই টিফা-ট্রানজিট প্রতিহত করতে পারব।

আবুল আসাদ বলেন, '৭২ সালের চুক্তিতে ট্রানজিটের কথা ছিল কিন্তু বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ভারতকে ট্রানজিট দেননি। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ট্রানজিট দেবেন না। আমানুল্লাহ কবির বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশের চেয়ে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ। কিন্তু এ শান্তিপূর্ণ দেশকেই পরিকল্পিত উপায়ে সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। মোস্তফা কামাল বলেন, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের ভাষায় কথা বলেন। তিনি বলেন, এরপর আমরা কী করব।

নাসির আল মুজাহিদী বলেন, যে সরকার ক্ষমতায় থেকে মুজিব হত্যার বিচার করতে পারেনি তারা যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে চায়। তিনি বলেন, আমি বঙ্গবন্ধুর প্রায় এক শ' বক্তৃতার ড্রাফট করে দিয়েছি। তিনি যা বলেছেন তা করেছেন। কিন্তু তার কন্যার মধ্যে তা নেই। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই একটি সিভিল ওয়্যারের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলেছে।

www.bjilibrary.com

আমার দেশ

সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮

গতকাল রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁয় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী —আমার দেশ

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের আলোচনা

সৎ সমাজ তৈরিতে সংস্কৃতিসেবীদের এগিয়ে আসতে হবে : নিজামী

স্টাফ রিপোর্টার

জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বিশ্বে রাজনৈতিক ক্ষমতার অঙ্গন থেকে ইসলাম আজ বহু দূরে। তবে ইসলাম যে বিদ্যমান ক্ষমতাকেন্দ্রের বিকল্প হতে পারে, ত নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাও সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে। এ দুটি ক্ষেত্রে যদি ইসলাম দাঁড়িয়ে যেতে পারে, তাহলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমরা আপস করব কেন?

তিনি গতকাল সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত 'সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে মাহে রমজান' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারি আসাদ বিন হাফিজ। বক্তব্য রাখেন সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান, বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবী এডভোকেট আহমদ আযম খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ফজলে রাব্বী, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা'র প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমদ, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত মাহমুদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জয়নুল আবেদীন আজাদ প্রমুখ।

মতিউর রহমান নিজামী একটি সুস্থ ও সৎ সমাজ বিনির্মাণে লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের অবদান অনেক বলে মন্তব্য করেন। কোনো জাতিকে পর্যুদস্ত করতে হলে প্রথমেই তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হবে। কোরআন বলছে, মুসলিম হিসেবে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। কোরআনের নির্দেশনায় এ জাতি গঠন করেছেন মুহাম্মদ (স.)।

তিনি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও সৎ সমাজ তৈরি করতে সংস্কৃতিসেবীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মাহমুদুর রহমান বলেন, গত রমজানেও আমরা একত্রিত হয়েছিলাম। তখন যে কথা বলেছিলাম, তা আজো সমানভাবে বিদ্যমান; এখন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি বেড়েছে। তিনি বলেন, আমরা বাইরের আগ্রাসন নিয়ে কথা বলি। আসলে ভেতরের আগ্রাসনও কম নয়। বাইরের চেয়ে ভেতরের ষড়যন্ত্র অনেক বেশি ক্ষতিকর। বর্তমানে টিভি ও অন্যান্য মিডিয়ায় যে প্রচারণা চলছে তা ইসলামবিরোধী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। এটা মোকাবিলা করার চেষ্টা হয়নি। আমরা নিজস্ব সংস্কৃতি ভালোভাবে চর্চা করতে পারলে অভ্যন্তরে যে ষড়যন্ত্র চলছে তা মোকাবিলা করতে পারতাম।

শওকত মাহমুদ বলেন, বংশ পরম্পরায় যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। সাহিত্য সংস্কৃতি আমাদের এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নেবে বলে আমি আশা করি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, ১৯৪৭ সালে এই অঞ্চলে যে ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, তার ওপর ভর করেই আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। এর আগে ঢাকায় কিছুই ছিল না। ঢাকা বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে পিছিয়ে ছিল; এখন আমাদের বাংলা একাডেমী আছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন আছে।

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আরএ গনি, ড. তারেক শামসুর রেহমান, কবি আল মুজাহিদী, জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ, সাংবাদিক নেতা আবদুস শহিদ, মোহাম্মদ বাকের হোসাইন, জাহেদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

আমার দেশ শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

গোলটেবিলে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের অভিমত

করিডোর-টিফা চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে গিলে খাওয়ার চক্রান্ত করছে ভারত

২ নয়াদিগন্ত

আমার দেশ শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

ভাষার উৎকর্ষ সাধনে কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা চাই

আল মাহমুদ

বাংলা ভাষার উৎকর্ষের দায়িত্ব আমাদের

---------কবি আল মাহমুদ

www.bjilibrary.com

পবিত্র মাহে রমজান ও ঈদ উপলক্ষে আমাদের নতুন প্রযোজনা

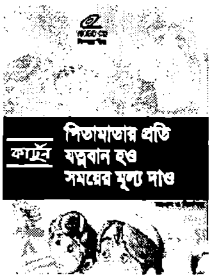

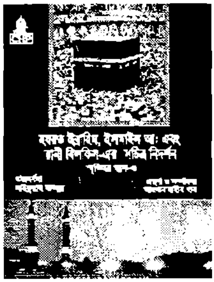

গ্রামীন ফোনে ২২০০ ডায়াল করুন।
প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত তরজমা, হাদীস রমজানের শিক্ষা মাসলা-মাসায়েল ও ইসলামী গান শুনুন।

চার্জ, ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য

স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার

CHP®

প্রধান কার্যালয় : ফোন - ৯৩৪২২১৫, ০১৭১১৮২৭৯৫৩, ০১৭১১১১৮৫৪৩, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৩৬২৩৫০
Website: www. chp-spondon.com, e-mail : spondon@bangla.net

- ঢাকা শো-রুম-১ ফোন : ৯৩৬০৭৭১
- ঢাকা শো-রুম-২ ফোন : ০১৭১৪৩৬১৬১৬
- ঢাকা শো-রুম-৩ ফোন : ০১৭৩৭২৮৮৭৬৫
- চট্টগ্রাম শো-রুম ফোন : ০১৭১১৩৮১৯৬০
- সিলেট শো-রুম ফোন : ০১৭২৬৫৪৩৯১১
- যশোর শো-রুম ফোন : ০১৭২৬৯৩২৯০০
- রাজশাহী শো-রুম ফোন : ০১৭১১৯০৪৩০১
- চাঁপাইনাবাবগঞ্জ শো-রুম ফোন : ০১৭৪১১২৬৯৪২
- সাতক্ষীরা শো-রুম ফোন : ০১৭১০৯৫৮২৪৮
- কুমিল্লা শো-রুম ফোন : ০১৭২৫৬১১৩৩৬
- ফেনী শো-রুম ফোন : ০১৭২৬৪৯৫৯৮৫
- বগুড়া শো-রুম ফোন : ০১৮১৯০৪২০১০

ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি ও ডিভিডি ক্রয়ের সময় সিএইচপি'র মনোগ্রাম দেখে কিনুন

কেন্দ্রের অন্যান্য প্রকাশনা

১. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ১৯৯৬ ◆ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
২. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ১৯৯৭ ◆ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
৩. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ১৯৯৯ ◆ সম্পাদনা: খন্দকার আব্দুল মোমেন
৪. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০০ ◆ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৫. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০১ ◆ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৬. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০২ ◆ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৭. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০৩ ◆ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
৮. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০৪ ◆ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
৯. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০৫ ◆ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১০. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০৬ ◆ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১১. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০৭ ◆ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১২. সাহিত্য সংস্কৃতি– সীরাত সংখ্যা ২০০৮ ◆ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১৩. নাবিক–১৯৯৭ ◆ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৪. পিকনিকে শালনায়–১৯৯৯ ◆ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৫. চড়ুইভাতির এই মেলায়–২০০১ ◆ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৬. এলো বৈশাখ–২০০২ ◆ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৭. ১ম হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক-২০০২ ◆ সম্পাদনা গোলাম মোহাম্মদ
১৮. গাঙচিল মন নৌ-ভ্রমণ স্মারক–২০০২ ◆ সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
১৯. ঐ নূতনের কেতন ওড়ে–২০০৩ ◆ সম্পাদনা: শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
২০. হিজল বনের পাখি– ২০০৩ ◆ সম্পাদনা: শরীফ আবদুল গোফরান
২১. হিজল বনের পাখি– ২০০৩ ◆ সম্পাদনা: শরীফ আবদুল গোফরান
২২. ২য় হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক–২০০৪ সম্পাদনা: হাসান আলীম
২৩. সীরাত গ্রন্থ প্রদর্শনী স্মারক–২০০৪ ◆ সম্পাদনা: নাসির হেলাল
২৪. ৩য় হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক–২০০৬ ◆ সম্পাদনা: হাসান আলীম
২৫. সমুদ্রের ঘ্রাণ–২০০৭ ◆ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
২৬. লেখক সম্বর্ধনা স্মারক–২০০৮ ◆ সম্পাদনা: মো: আবেদুর রহমান
২৭. ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি স্মারক ◆ সম্পাদনা: মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
২৮. লেখক অভিধান ◆ সম্পাদনা: নাসির হেলাল
২৯. আশির দশক : নির্বাচিত কবিতা ◆ সম্পাদনা: হাসান আলীম

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ [সাঃ] বলেছেন ঃ

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি কাজ ব্যতীত তার আমলের সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তা হচ্ছে ছাদাক্বাহ জারিয়াহ্, এমন জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।

- মুসলিম, তিরমিযী

আপনি কি চান?

- মৃত্যুর পরেও আপনার কৃত ছাদাক্বাহ্ জারিয়াহ্ অব্যাহত থাকুক ?
- সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন ?

এর জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে এককালীন বা কিস্তির ভিত্তিতে একটি ক্যাশ ওয়াক্বফ্ তহবিল গঠন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আপনার এ সদিচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চালু করেছে

মুদারাবা ওয়াক্বফ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট

আপনি ক্যাশ ওয়াক্বফ একাউন্টে ওয়াক্বফকৃত সমুদয় অর্থ এককালীন জমা করতে পারেন অথবা ক্যাশ ওয়াক্বফ-এর মোট পরিমাণ ঘোষণাপূর্বক প্রারম্ভিক অবস্থায় ন্যূনতম ৳ ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) মাত্র জমা করে পরবর্তী সময়ে হাজার টাকা বা তার গুণিতক অংকে বাকী অর্থ কিস্তিতে জমা করতে পারেন।

এ হিসাব থেকে অর্জিত মুনাফা ওয়াক্বিফের ইচ্ছা ও শরী'আহ্‌র বিধান অনুযায়ী দ্বীনি উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

www.islamibankbd.com